[বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

আধুনিক পৃথিবী

(১৮৯০—১৯৪৫)

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী, এম. এ., এল.-এল. বি., ডি. ফিল্
কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের ইতিহাস বিভাগের
প্রধান অধ্যাপক

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ : আগস্ট, ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড়বাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ 'আধুনিক পৃথিবী' (১৮৯০-১৯৪৫) প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে স্নাতক পরীক্ষার প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্যাদি ও সেগুলির সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে ঐতিহাসিক তথ্যাদির আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ মতামতে উপনীত হইতে পারে সেই অবকাশও পুস্তকে আছে।

যাহাদের জন্য এই পুস্তকখানি রচনার প্রয়াস পাইয়াছি তাহাদের উপকারে আসিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

এই পুস্তকের উৎকর্ষ সাধনে আমার সম-কর্মী অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত পরামর্শ কৃতজ্ঞতাসহকারে গৃহীত হইবে। ইতি—

কলিকাতা
৭ই আগস্ট, ১৯৬০

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

[বর্ধমান বিশ্ববিত্তালয় ত্রৈবার্ষিক স্নাতক সংস্করণ]

আধুনিক পৃথিবী

সূচনা

(Introduction)

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপ (Europe in 1890) : ইওরোপের ইতিহাসে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ একটি যুগান্তরের সূচক হিসাবে বিবেচ্য। উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতিক ও দূরদর্শী নেতা বিস্‌মার্কের পদচ্যুতি (১৮৯০) বিস্‌মার্ক রচিত মৈত্রী-ব্যবস্থার (system of alliances) অবসানের সূচনা করিয়া এক নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্‌মার্কের মৈত্রী-ব্যবস্থা কেবলমাত্র জার্মানিকেই নিরাপত্তা দান করিয়াছিল এমন নহে, জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ যে কোন ইওরোপীয় দেশের বিরুদ্ধে অপর কোন দেশ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহসী ছিল না। অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইতালি, রুমানিয়া, এমন কি পরোক্ষভাবে ইংলণ্ডও জার্মানির সহিত সহযোগিতা করিতেছিল। এমতাবস্থায় ফ্রান্স ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণে সাহসী হয় নাই। ইংলণ্ডের নীতি ছিল কোন দেশের সহিত সরাসরি সামরিক চুক্তি স্থাপন না করিয়া ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিবার মত এক মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া থাকা। ইহা ভিন্ন ইংলণ্ডের সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবার মত শক্তি বা ইচ্ছা তখন কোন দেশের ছিল না। এই কারণেই ইংলণ্ড কতকটা স্বতন্ত্র থাকিবার নীতি অনুসরণ করিতে সচেষ্ট ছিল।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ ইওরোপীয় ইতিহাসের যুগান্তরের সূচক

বিস্‌মার্কের মৈত্রী-ব্যবস্থার সাফল্য (১৮৭১-১৮৯০)

ইংলণ্ডের স্বাতন্ত্র্য

কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির চ্যান্সেলর বিস্মার্কের পদচ্যুতি * ইওরোপীয় রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটাইয়া এক নূতন মৈত্রী-ব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করিল। বিস্মার্কীয় মৈত্রী-ব্যবস্থার স্থলে নূতন মৈত্রী-ব্যবস্থা স্থাপন এবং জার্মানির সম্রাট উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন পন্থা অনুসরণের ফলে ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে, এমন কি পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে, এমন এক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল যে, ক্রমে সমগ্র পৃথিবী এক আত্মঘাতী মহাযুদ্ধে (১৯১৪) অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইল।

বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কয়েক শতক ধরিয়া ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-নীতির মূল-কথা ছিল কোন জটিল মিত্রতাবন্ধনে যোগদান না করিয়া ইওরোপের রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিবার জন্য মধ্যস্থতা করা এবং ইংলণ্ডের মতামতকে ইওরোপীয় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অপরিহার্য করিয়া তোলা। † ইংলণ্ডের সামুদ্রিক, ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ অথবা ইংলিশ চ্যানেলের উপর আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা ঘটিলেই ইংলণ্ড এই স্বাতন্ত্র্য-নীতি কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির এক মৌলিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের বিশ্বরাজনীতি (Welt Politik) ক্ষেত্রে প্রাধান্য স্থাপনের সংকল্প, জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তার ও সামুদ্রিক প্রাধান্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ইংলণ্ডের পক্ষে স্বাতন্ত্র্য-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবার পথে বাধার সৃষ্টি করিল। জার্মানি ও ফ্রান্স অথবা

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

* জার্মান সম্রাট (কাইজার) দ্বিতীয় উইলিয়াম ও চ্যান্সেলর বিস্মার্কের মতানৈক্য চরমে পৌঁছিলে (মার্চ, ১৮৯০) বিস্মার্ককে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

"The crisis came in March 1890. The Emperor began to talk of commands, a word which Bismarck had not heard on the lips of his old master. He insisted that his will should be carried out, if not, by Bismarck, then by another. 'Then I understand, your Majesty' said Bismarck, speaking in English, 'that I am in your way.' 'Yes' was the answer." Ketelbey, *A History of Modern Times*, pp. 355-56.

এইরূপ পরিস্থিতিতে পদত্যাগ ভিন্ন বিস্মার্কের আর গত্যন্তর রহিল না। বস্তুত, ইহা তাঁহার পদচ্যুতিরই সামিল ছিল। বিস্মার্কের পদচ্যুতি সমসাময়িক এক ব্যঙ্গচিত্রে 'Dropping the Pilot' নামে বর্ণিত হইয়াছিল।

† "England's traditional policy, generally speaking :had for centuries eend onof splendid isolation." Fay, *The Origins of the World War*, p. 124.

জার্মানি ও রাশিয়া যদি যুগ্মভাবে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে ব্রিটিশ সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক প্রাধান্য এবং ঔপনিবেশিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার সমূহ আশঙ্কা আছে বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ড স্বাতন্ত্র্য-নীতি পরিত্যাগ করিয়া নূতন এক মৈত্রী-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে অগ্রসর হইল। ইংলণ্ডের সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়া চলিবার যে নীতি বিস্‌মার্ক অনুসরণ করিতেছিলেন কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের আমলে উহার আমূল পরিবর্তন ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছিল।

রুশ-জার্মান সৌহার্দ্য নাশ

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন কংগ্রেসে রাশিয়ার সহিত মিত্রতাবদ্ধ জার্মানির চ্যান্সেলর রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেন নাই এই কারণে রাশিয়া জার্মানির সহিত মিত্রতা চুক্তি ত্যাগ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। কিন্তু বিস্‌মার্কের কূটকৌশল এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও প্রাধান্য এড়াইয়া চলা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বিস্‌মার্কের পদচ্যুতি রাশিয়ার জার্মানি-বিদ্বেষ প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। রুশ-জার্মান মৈত্রী নাশ হইবার প্রমাণ হিসাবেই ইহা উল্লেখযোগ্য।

এইভাবে ইওরোপীয় ইতিহাসে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ, তথা বিস্‌মার্কের পদচ্যুতি এক যুগান্তকারী ঘটনার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করা অযৌক্তিক হইবে না।

পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চল

ইওরোপের পূর্বাঞ্চলে তখন বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, আর্মেনিয়া, গ্রীস, তুরস্ক সর্বত্র রাজনৈতিক অসন্তোষ-জনিত আন্দোলন, বিদ্রোহ, যুদ্ধ প্রভৃতির ফলে এক অতিশয় জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিতেছিল। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রসার-নীতি এই জটিলতা আরও বৃদ্ধি করিয়া এই অঞ্চলকে ক্রমেই এক রাজনৈতিক ঝটিকা-কেন্দ্রে পরিণত করিতেছিল। সুদূর প্রাচ্যে তখন নবজাগ্রত জাপান আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতেছিল তাহার ফলেই ক্রমে ইতিহাসের সর্ব-প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা, লোক ও সম্পত্তি ক্ষয় সাময়িকভাবে পৃথিবীর রাজনীতিকগণকে শান্তিকামী করিয়া তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই

বর্তমান জগৎ

যুদ্ধের স্মৃতি সামান্য অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেই পৃথিবী পুনরায় রণমদে মত্ত হইয়া উঠিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হইল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই যুদ্ধের ফলে বর্তমান পৃথিবী গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্ব-

যুদ্ধের পূর্বকালের মানচিত্রের সহিত বর্তমান পৃথিবীর মানচিত্রের যেমন সামঞ্জস্য নাই তেমনি বর্তমান জগতের সমস্যাসমূহও সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং বহুলাংশে জটিলতর। বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যাই হইল সাম্যবাদী রাশিয়া ও রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন দেশসমূহ এবং ইঙ্গ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষের অবসান ঘটান।

প্রথম অধ্যায়

জার্মানি, ১৮৯০—১৯১৪

(Germany, 1890—1914)

পূর্ব-কথা (Retrospect)ঃ জার্মানির ইতিহাসে প্রথম উইলিয়ামের রাজত্বকাল এক গৌরবময় স্মরণীয় যুগ। তাঁহার রাজত্বকালেই বিসমার্ক প্রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। ঐক্যবদ্ধ জার্মানি তদানীন্তন ইওরোপের নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় ফ্রেডারিক সম্রাট হইলেন। কিন্তু সিংহাসন আরোহণের তিন মাসের মধ্যেই ক্যানসার রোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ফলে পরবর্তী সম্রাট হইলেন তাঁহার উনত্রিশ বৎসরের পুত্র কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম।

প্রথম উইলিয়াম (১৮৬১-১৮৮৮)

তৃতীয় ফ্রেডারিক (৯ই মার্চ-১৫ই জুন, ১৮৮৮)

কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম, ১৮৮৮-১৯১৮ (Kaiser William II, 1888—1918)ঃ প্রাশিয়ার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগে দ্বিতীয় উইলিয়ামের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। স্যাডোয়া (১৮৬৬) ও সেডানের (১৮৭০) যুদ্ধে প্রাশিয়ার জয়লাভ, বিসমার্কের পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি, প্রাশিয়ার আন্তর্জাতিক সম্মান প্রভৃতির ফলে সেই সময়ে জার্মান জাতীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব দেশাত্মবোধ, আত্মচেতনা ও আত্মশ্লাঘা জাগিয়াছিল। বালক উইলিয়ামের মনে এবং চরিত্রে এগুলি এক অতি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফলে,

দ্বিতীয় উইলিয়ামের সম্রাট পদলাভ (জুন ১৫, ১৮৮৮)

তিনি দৃঢ়চেতা, কর্মদক্ষ, দুঃসাহসিক ও স্বমত-পোষক ব্যক্তি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ভাবপ্রবণতা, অনমনীয়তা ও অস্থির মতিত্বের এক অদ্ভুত সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। রাজক্ষমতায় তাঁহার অতি উচ্চ বিশ্বাস ছিল; রাজার ক্ষমতা ভগবান-প্রদত্ত এই মতবাদে তিনি ছিলেন দৃঢ়বিশ্বাসী।

চরিত্র

বন্ (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ইতিহাসের অধ্যাপক মোরেন-ব্রেকার (Maurenbrecher) বিস্‌মার্কের রাজনীতি সম্পর্কে দ্বিতীয় উইলিয়ামের মনে এক গভীর শ্রদ্ধা জাগাইয়াছিলেন। বিস্‌মার্কের প্রতি উইলিয়ামের কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহা বিস্‌মার্কের নিকট তাঁহারই লিখিত পত্র (২১শে ডিসেম্বর, ১৮৮৭) হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি এই পত্রে লিখিয়াছিলেন: "আপনার প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি ও গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে এইটুকু বলিতে পারি যে, আপনার অসুবিধার সৃষ্টি করা অথবা আপনার যাহা মনঃপূত নহে সেরূপ কিছুই করা অপেক্ষা আমি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না।"* কিন্তু এইরূপ পত্রালাপের মধ্যেও উইলিয়ামের চরিত্রের দৃঢ়তা নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার শিক্ষা: বিস্‌মার্কের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা

সম্রাটপদ লাভ করিবার অনতিকাল পরেই দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং বিস্‌মার্কের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। দ্বিতীয় উইলিয়াম দেখিলেন যে, মন্ত্রিগণের উপর বিস্‌মার্কের প্রভাব ও প্রতিপত্তি তাঁহার নিজ প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপেক্ষা বহুগুণ বেশী। উইলিয়াম তাঁহার পিতামহ প্রথম উইলিয়ামের ন্যায় রাজপদ অলঙ্কৃত করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নিজেই প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকে অটুট আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে

বিস্‌মার্কের সহিত মতানৈক্য

* "The great and affectionate respect and heart-felt attachment which I cherish for your Highness—and for you I would let my limbs be hewn piecemeal, one after another, rather than undertake anything that would be disagreeable to you or cause you difficulties....." Prince William in a letter to Bismarck, Dec. 21, 1887. Vide Hazen, p. 299.

জনসাধারণকে শান্তি, সুশাসন, ন্যায্য-বিচার প্রভৃতির প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়াছিলেন। এই সব হইতেই দ্বিতীয় উইলিয়ামের স্বমত-পোষণের এবং নিজ প্রাধান্য স্থাপনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিস্‌মার্ক স্বয়ংও যে তাহা না বুঝিয়াছিলেন এমন নহে। "উইলিয়াম নিজেই নিজের চ্যান্সেলর হইবেন" এই ভবিষ্যৎবাণী বহুপূর্বে বিস্‌মার্ক স্বয়ংই করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তিনি বৃদ্ধ সম্রাট প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পদত্যাগ না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন।

উইলিয়ামের ব্যক্তিগত প্রাধান্য-স্পৃহা

দ্বিতীয় উইলিয়ামের (১) নিজ অধিকার সম্পর্কে ধারণা এবং তাহা কার্যকরী করিবার মনোবৃত্তি, (২) বার্লিন রাজসভায় স্বার্থ-জনিত রেষারেষি এবং বিস্‌মার্কের প্রাধান্য-বিরোধী প্ররোচনা তাঁহাকে ক্রমেই বিস্‌মার্কের স্বৈরাচারী একক প্রাধান্যের প্রতি বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। (৩) কিন্তু সম্রাট (কাইজার) দ্বিতীয় উইলিয়াম যখন দেখিলেন যে, শাসন-সংক্রান্ত এবং পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত অনেক কিছুই তাঁহার নিকট গোপন রাখা হইতেছে তখন তিনি বিস্‌মার্কের প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার কাজের বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বিস্‌মার্ক এবং উইলিয়াম উভয়েই ছিলেন স্বৈরপ্রকৃতির লোক। স্বভাবতই দুইয়ের মতানৈক্য তীব্র আকার ধারণ করিল। তাঁহাদের বয়সের ব্যবধানও ছিল তাঁহাদের মতানৈক্যের তীব্রতার অন্যতম কারণ।

বিস্‌মার্কের সহিত প্রকাশ্য বিরোধিতার কারণ: (১) নিজ অধিকার সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা, (২) রাজসভায় বিস্‌মার্কের প্রাধান্যের বিরোধিতা

(৩) শাসন ও পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্‌মার্কের গোপনতা: উইলিয়ামের সন্দেহ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে উভয়ের মতানৈক্য চরমে পৌঁছিল। উইলিয়াম বিস্‌মার্ককে স্পষ্টই বলিলেন যে, রাজার 'আদেশ' (command) তাঁহাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। বিস্‌মার্ক উত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কি আপনার নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলিবার বাধা সৃষ্টি করিতেছি?" উইলিয়াম বলিলেন: "হ্যাঁ"।* বিস্‌মার্কের পদত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর রহিল না, বস্তুতপক্ষে ইহা ছিল তাঁহার পদচ্যুতিরই সামিল। এইভাবে জার্মান রাষ্ট্রের পরিচালকের পদচ্যুতি সমসাময়িক এক ব্যঙ্গচিত্রে "Dropping the Pilot" নামে বর্ণিত হইয়াছিল।

বিস্‌মার্কের পদচ্যুতি ('Dropping the Pilot')

* vide, Ketelbey, pp. 355-56.

দ্বিতীয় কাইজার উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy of Kaiser William II)ঃ কাইজার উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল তিনটিঃ (১) সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতি ক্ষেত্রে জার্মানির প্রাধান্য স্থাপন (*Welt Politik i. e.,* World Politics), (২) জার্মানির সাম্রাজ্য বিস্তৃতি, (৩) সামুদ্রিক প্রাধান্য অর্জন। বিসমার্কের পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক গোলযোগ এড়াইয়া চলা, শত্রুপক্ষ ফ্রান্সকে দুর্বল করিয়া রাখা এবং ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখা। এই কারণে তিনি জার্মানিকে 'পরিতৃপ্ত দেশ' (Satiated country) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু উইলিয়ামের বিস্তার-নীতি বিসমার্কের সাবধানী পররাষ্ট্র-নীতির পথ ত্যাগ করাইয়া জার্মানিকে শক্তির দ্বন্দ্বে আগাইয়া লইয়া চলিল। তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনার অক্ষমতা বিসমার্কের চেষ্টায় স্থাপিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত মিত্রতার দ্রুত অবসান ঘটাইল। বিসমার্কের অপসারণের অব্যবহিত পরেই রাশিয়ার সহিত "রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি" (Re-insurance Treaty) পরিত্যক্ত হইল। ক্রমে রাশিয়া ফ্রান্সের দিকে আকৃষ্ট হইল এবং এই দুই দেশের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের সহিতও জার্মানির দ্বন্দ্ব শুরু হইতে বেশী সময় লাগিল না। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর উইলিয়াম ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন এবং সেইজন্য জাঞ্জিবার ও উইটু (Witu) নামক দুইটি উপনিবেশের পরিবর্তে ইংলণ্ড হইতে হ্যালগোল্যাণ্ড (Helgoland) পাইয়াছিলেন (১৮৯০)। জার্মানির সামুদ্রিক প্রাধান্যের জন্য হ্যালগোল্যাণ্ড দখল করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। ইহার অল্পকাল পরে (১৮৯৩) ইংলণ্ড আফ্রিকায় ফরাসী প্রাধান্য প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে মধ্য-আফ্রিকা জার্মান প্রাধান্যাধীন বলিয়া স্বীকার করে। ফ্রান্স ইহার তীব্র প্রতিবাদ করে, কারণ ইহার ফলে আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলে ফরাসী প্রাধান্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কাইজার উইলিয়াম মধ্য-আফ্রিকায় প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাহার বিনিময়ে ফ্রান্স হইতে কোনপ্রকার

কাইজার উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য
(১) Welt Politik,
(২) সাম্রাজ্য বিস্তার,
(৩) সামুদ্রিক প্রাধান্য অর্জন

বিসমার্কের পররাষ্ট্র-নীতি পরিত্যক্ত

রাশিয়ার সহিত 'রি-ইনসিওরেন্স চুক্তি' পরিত্যক্ত

ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাবের ফলে হ্যালগোল্যাণ্ড লাভ

ইংলণ্ড কর্তৃক মধ্য-আফ্রিকায় জার্মানির অধিকার স্বীকৃত
বুওয়র যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক ইংলণ্ডের বিরোধিতা,
চীনদেশে জার্মানি ও রাশিয়ার অধিকার-বিস্তৃতিতে ইংলণ্ডের অসন্তুষ্টি,

সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন তিনি বুঝিলেন না। কিন্তু ক্রমেই ইঙ্গ-জার্মান সম্প্রীতি নষ্ট হইতে লাগিল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ব্রিটিশ নীতির ফলে বুওয়র যুদ্ধ (Boer War) শুরু হয়। এই যুদ্ধে জার্মানি গোপনে বুওয়রগণকে উৎসাহিত করায় ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রী বিনষ্ট হয়। চীনদেশে জার্মানি কিয়া-ও-চাও (Kia-o-chau) এবং রাশিয়া পোর্ট আর্থার (Port Arthur) দখল করিলে জার্মানি ও রাশিয়ার প্রতি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধভাব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এই সুযোগে কাইজার জার্মানি, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী এক অতি শক্তিশালী মিত্রসঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে পারিতেন, কিন্তু সেই সুযোগও তিনি গ্রহণ করেন নাই।

কাইজার কর্তৃক জার্মানি, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের সুযোগ ত্যাগ

বুওয়র যুদ্ধে ইংলণ্ডের মিত্রহীনতার অভিজ্ঞতা ব্রিটিশ সরকারকে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত মৈত্রীবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করাইল। সুতরাং জার্মানির এবং আমেরিকার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ইংলণ্ড সচেষ্ট হইল। ফ্রান্স বা রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপনের প্রশ্ন ছিল না, কারণ এই দুই দেশের সহিত ইংলণ্ডের বিরোধ ছিল অধিক। ১৮৯৯-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হওয়ার আন্তরিক চেষ্টা করে, কিন্তু কাইজার উইলিয়াম সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ইংলণ্ডের সহিত সদ্ভাব রক্ষার সুযোগ হারাইলেন। ইহার অব্যবহিত পরে ইংলণ্ড জাপানের সহিত মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৯০২)। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা দূর করিতে সমর্থ হন।

জার্মানি ও আমেরিকার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য ইংলণ্ডের চেষ্টা: কাইজার কর্তৃক সুযোগ ত্যাগ

ইংলণ্ড ও জাপানের চুক্তি (১৯০২)

এদিকে বাগদাদে রেলপথ স্থাপিত হইলে জার্মানি বার্লিনের সহিত বাগদাদের রেলপথের যোগাযোগ স্থাপন করিয়া পারস্য উপসাগরে নৌঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে। এই সূত্রে ইংলণ্ডে ভীতির সৃষ্টি হয়, কারণ ইহার ফলে পারস্য উপসাগরে জার্মান প্রাধান্য স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ইংলণ্ডের বিরোধিতায় জার্মানি শেষ পর্যন্ত এই রেলপথে সংযোগ স্থাপনে কৃতকার্য হইল না। এ বিষয় লইয়াও ইঙ্গ-জার্মান বিরোধ বৃদ্ধি পাইল।

বার্লিন-বাগদাদ রেল-পথের পরিকল্পনা

জার্মানির সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সামুদ্রিক প্রাধান্য স্থাপন নীতির ফলে

একদিক দিয়া যেমন ইঙ্গ-জার্মান বিরোধ দিন দিনই বাড়িয়া চলিল, অপর দিকে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের তীব্রতা কমিয়া আসিল। ইংলণ্ড দেখিল যে, সামুদ্রিক প্রাধান্যের ব্যাপারে ফ্রান্স বা রাশিয়া অপেক্ষা জার্মানিই অধিকতর শক্তিশালী শত্রু। এই কারণে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বেকার বিরোধ ভুলিয়া গিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে এক মৈত্রী-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি নৌবাহিনী ও যুদ্ধজাহাজের সংখ্যাবৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইহার অল্পকালের মধ্যেই রাশিয়া, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে 'ট্রিপ্‌ল আঁতাঁত বা 'ত্রয়ী শক্তি চুক্তি' (Triple Entente) গঠিত হইল। জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালির মধ্যে বিসমার্ক-স্থাপিত "ত্রি-শক্তি চুক্তি"র (Triple Alliance) প্রত্যুত্তর হিসাবে "ট্রিপ্‌ল আঁতাঁত" স্থাপিত হইল। এইভাবে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পররাষ্ট্র-নীতির ফলে বিসমার্কের বৈদেশিক চুক্তির দ্বারা জার্মানির নিরাপত্তার ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইওরোপ প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য দ্রুত প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে Triple Entente স্থাপন

বিসমার্ক-স্থাপিত Triple Alliance-এর প্রত্যুত্তর

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাশিয়া, ১৮৯০-১৯১৪

Russia, (1890-1914)

পূর্ব-কথা (Retrospect) : উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের রুশ ইতিহাসে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের (Czar or Tsar Alexander II) রাজত্বকাল আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও পররাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যাদির সবকিছু সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ না করিলেও

জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার -'মুক্তিদাতা জার'

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কর্তৃক সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর ভূমিদাসদের (Serfs) মুক্তিদান, রাশিয়ার ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন, বিচার ও শাসনব্যবস্থার সংস্কার তাঁহার রাজত্বকালকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। 'সার্ফ' বা ভূমিদাস শ্রেণীকে মুক্তিদান করিয়া সমাজের অপরাপর সকলের সমপর্যায়ে স্থাপন তাঁহার স্থায়ী কীর্তির অন্যতম। এজন্য ইতিহাসে তিনি 'মুক্তিদাতা জার' (Tsar Liberator) নামে খ্যাত।

তাঁহার উদার সংস্কার-নীতি

ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু এশিয়া মহাদেশে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে রুশ সীমা আফগানিস্তানের সীমা এবং দক্ষিণে ককেশাস পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। চীনের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া তিনি ভ্লাডিভস্টক বন্দরটি দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু রাশিয়ার 'নিহিলিস্ট' আন্দোলন (Nihilist Movement) নামে জারতন্ত্র-বিরোধী এক আন্দোলন, পোলদের বিদ্রোহ প্রভৃতি শুরু হইলে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের উদারনৈতিক মতবাদ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া উঠিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যু রাশিয়ার শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর প্রতিক্রিয়াপন্থী করিয়া তুলিল।

প্রতিক্রিয়ার পুনঃ প্রবর্তন

জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার, ১৮৮১-১৮৯৪ (Czar Alexander III) : দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালের শেষদিকে সংস্কার-কার্য রুদ্ধ হইয়া প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার এইভাবে মৃত্যু প্রতিক্রিয়াশীলতার মাত্রা চরমে পৌছাইল। পরবর্তী জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার প্রথম হইতেই উদারনীতি ও সংস্কারের বিরোধিতা শুরু করিলেন। তিনি প্রথম নিকোলাসের আমলের দমননীতির পুনঃ প্রবর্তন করিলেন।

চরম প্রতিক্রিয়ার পুনঃ প্রবর্তনা

তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ভগবান-প্রদত্ত রাজক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, জনকল্যাণের জন্য ভগবান স্বৈরাচারী শাসকদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন।* ফলে, রাশিয়ার জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের স্বৈরাচারী একক প্রাধান্যের কঠোরতা অনুভূত হইতে লাগিল। পোবিডোনোস্টেভ্ (Pobedo-nostev) নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীর প্রভাবে প্রভাবিত তৃতীয় আলেকজাণ্ডার সর্বপ্রকার উদারনৈতিক ভাবধারার এক নির্দয় শত্রুতে পরিণত হইলেন। পোবিডোনোস্টেভ্ গণতন্ত্রকে সর্বাপেক্ষা জটিল এবং পীড়াদায়ক শাসনব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করিতেন। স্বভাবতই তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলিয়া কিছু রহিল না। সংবাদপত্রগুলি নানা অজুহাতে প্রকাশ বন্ধ করিতে বাধ্য করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রথম নিকোলাসের আমলে নিয়ন্ত্রণ পুনরায় স্থাপন করা হইল। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির উপরও অনুরূপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। জেম্স্ট্ভো নামক স্থানীয় প্রতিনিধি সভাগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইল। বিচারালয়গুলির স্বাধীনতা হরণ করা হইল। আলেকজাণ্ডারের সংস্কারের সুফলগুলি এইভাবে নাশ করিয়া তৃতীয় আলেক-জাণ্ডার এক ভয়াবহ স্বৈরতন্ত্রের স্থাপন করিলেন।

পোবিডোনোস্টেভ্-এর প্রভাব

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ

শিক্ষায়তনের নিয়ন্ত্রণ

* "The Voice of God orders us to stand firm at the helm of govt. ...with faith in the autocratic power, which we are called to strengthen and preserve, for the good of the people, from every kind of encroachment." Vide, Lipson, p. 107.

গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় 'মুক্তির ঘোষণা' (Edict of Emancipation) দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডার তাহাদিগকে জমিদার শ্রেণীর অধীনে পুনরায় স্থাপন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

স্বাধীন কৃষক শ্রেণীকে জমিদারদের অধীনে স্থাপন

তাহাদের উপর জমিদার শ্রেণীকে পুলিশের কাজ করিবার ভার দেওয়া হইল। শ্রমিকের পক্ষে চুক্তিভঙ্গ করা ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। Justices of Peace পূর্বে নির্বাচিত হইতেন। কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এই সকল পদ জমিদারশ্রেণী হইতে মনোনীত 'ল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন্' (Land Captains) নামে একশ্রেণীর কর্মচারীকে দিলেন। তিনি দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের শাসন এবং বিচারকার্যের পৃথকীকরণ নীতি ত্যাগ করিয়া এই উভয় প্রকার কাজই একশ্রেণীর কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করিলেন। বিচারের নামে অবিচার চালাইবার কোন অসুবিধা আর রহিল না।

ল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন

জেম্স্ট্‌ভো নামক স্থানীয় প্রতিনিধি সভাগুলি সামাজিক এবং জনকল্যাণকর কার্যের দ্বারা রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডার এই সকল প্রতিনিধি সভার কার্যাদি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং নিজ মনোনীত ব্যক্তিগণ যাহাতে এই সকল সভায় স্থান পায় সেই ব্যবস্থা করিলেন।

জেম্স্ট্‌ভো-এর স্বাধীনতা হ্রাস

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে এইভাবে প্রতিক্রিয়াশীল অত্যাচার চলিতে লাগিল। জনসাধারণের সহিত সরকারের খাদ্যখাদক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, নিরপেক্ষ বিচার প্রভৃতি সভ্য শাসনব্যবস্থার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য রাশিয়া হইতে লোপ পাইল।

ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিরপেক্ষ বিচার, আইনের চক্ষে সমতা বিলুপ্ত

একদিকে অবশ্য রাশিয়ার জাতীয় জীবনে ঐ সময়ে এক যুগান্তকারী ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছিল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকাল পর্যন্ত রাশিয়া ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। শিল্প বলিতে প্রধানত কুটির-শিল্পই তখন ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে যে শিল্পোন্নতির উৎসাহ দান

শুরু হইয়াছিল, তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলেও তাহা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। কতকগুলি আধুনিক ধরণের শিল্প তাঁহার আমলে রাশিয়ায় গড়িয়া উঠে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সার্জিয়াস্-ডি-উইটি (Sergius de Witte) বাণিজ্য ও অর্থ-সচিব নিযুক্ত হইলে রাশিয়ায় এক শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়। রাশিয়ার বিশাল জনসংখ্যাকে কাজে খাটাইয়া রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদকে তৈয়ারী সামগ্রীতে পরিণত করিতে পারিলে কৃষির উপর নির্ভরশীলতা যেমন হ্রাস পাইবে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও তেমনি উন্নত হইবে। ইহা ভিন্ন তাহাদের করদানের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া উইটি এক ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। বিদেশী শিল্পপতিগণকে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া তিনি তাঁহা-দিগকে রাশিয়ায় নানাপ্রকার শিল্প গড়িয়া তুলিতে আমন্ত্রণ করিলেন। ফলে, প্রভূত পরিমাণ বিদেশী মূলধন রাশিয়ার শিল্পগঠনে নিয়োজিত হইল। বিদেশী মূলধনের অধিকাংশই আসিল ফ্রান্স হইতে। এই সূত্রে তৃতীয় আলেকজাণ্ডার প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের সহিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মিত্রতা চুক্তি (Dual Alliance) সম্পাদনে বাধ্য হইয়াছিলেন। শিল্পোন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিবহন-ব্যবস্থারও উন্নতিসাধন করা হইল। প্রতি বৎসর প্রায় ১৪০০ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণ করা হইতে লাগিল।

রাশিয়ার শিল্পোন্নতি

শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। ইহাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ উদারনৈতিক বিপ্লবের বীজ সহজেই ছড়ান সম্ভব হইল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শ্রমিক শ্রেণীর মাধ্যমে ভবিষ্যতে রুশ রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সূত্রপাতের কথা বিবেচনা করিলে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালকে রাশিয়ার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া অভিহিত করা অনুচিত হইবে না।

ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নতির সূত্রপাত

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের সংকীর্ণ স্বৈরাচারী ধারণা, ধর্ম, ভাষা বা কৃষ্টিকেও বাদ দেয় নাই। রাশিয়ায় বসবাসকারী ভিন্ন জাতির লোকদিগকে তিনি রুশ ভাষা, সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য গ্রহণে বাধ্য করিতে চাহিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র রাশিয়ায় এক শাসন, এক ধর্ম, এক ভাষা ও সংস্কৃতি স্থাপন করা। এই কারণে ইহুদি, পোল, ফিন্ প্রভৃতি জাতির লোকের উপর রুশ বৈশিষ্ট্য (Russification) চাপাইবার সর্বপ্রকার চেষ্টা শুরু হইল।

ইহুদিদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হইল। স্থানে স্থানে ইহুদিদের সহিত মারামারি চলিল। ইহুদিদের উপর সরকারী সহায়তায় আক্রমণ চালান হইল। এই সকল আক্রমণ 'প্রোগ্রাম' (Progrom) নামে পরিচিত ছিল। বহুসংখ্যক ইহুদি ঐ সময়ে প্রাণ হারাইল এবং অনেক ইহুদি রাশিয়া ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। দক্ষিণ-রাশিয়ার প্রোটেস্টান্ট্ ধর্মাবলম্বীদেব উপরও অনুরূপ অত্যাচার শুরু হইয়াছিল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্য স্থাপনের নীতির ফলে দেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভবিষ্যতে এই নীতির কুফল নানাভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের 'Russification' নীতি

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস জার পদ লাভ করিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাশিয়া দ্রুত বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাঁহার মৃত্যু (১৮৯৪)

জার দ্বিতীয় নিকোলাস ১৮৯৪-১৯১৭ (Czar Nicholas II : দ্বিতীয় নিকোলাসের সিংহাসন আরোহণের ফলে রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোনপ্রকার পরিবর্তন ঘটিল না। রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজ দ্বিতীয় নিকোলাসের জার পদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের আশা করিয়াছিলেন। আইন-প্রণয়ন এবং শাসন-ব্যাপারে জাতির প্রতিনিধিগণও অংশ লাভ করুক ইহাই ছিল রাশিয়ার শিক্ষিত সমাজের ইচ্ছা। কিন্তু নিকোলাস জনসাধারণের শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের আশা 'অলীক কল্পনা মাত্র' বলিয়া অভিহিত করিলে দেশের সর্বত্র বিশেষত শিক্ষিত সমাজে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি হইল। দ্বিতীয় নিকোলাস অবশ্য স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা অপরিবর্তিত রাখিয়া জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন এই ঘোষণা করিলেন।*

দ্বিতীয় নিকোলাসের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি

*"He created intense disappointment, among the educated classes by characterising as 'senseless dreams' the ardent desire of the nation to be admitted to a share in legislation." Lipson, p. 111.

"Devoting all my efforts to the prosperity of the nations, I will preserve the principles of Autocracy as firmly and unswervingly as my late father." Nicholas II, vide, Lipson, pp. 111-'12.

কিন্তু নিয়তির পরিহাসে তাঁহার রাজত্বকালেই রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় নিকোলাস স্বৈরাচারী শাসনে বিশ্বাসী ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বৈরাচারী শাসন পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যক্তিত্ব তাঁহার ছিল না। তিনি তাঁহার রাণীর প্রভাবাধীন ছিলেন। রাণী স্বয়ং ছিলেন রাস্‌পুটিন (Rasputin) নামে একজন নীচপ্রকৃতির সাধুর প্রভাবাধীন। রাস্‌পুটিনের ইঙ্গিতেই রাণী চলিতেন, স্বভাবতই নিকোলাসের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তির সহিত রাণী ও রাস্‌পুটিনের খেয়ালখুশির সংমিশ্রণে রাশিয়ায় এক ভয়াবহ কঠোর শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতে লাগিল। পোবিডোনোস্টেভ্ (Pobedonostev) এবং প্লেহ্‌বি (Plehve) নামক দুইজন প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রী শাসনের নামে অত্যাচার চালাইলেন। ইহুদিদের উপর 'প্রোগ্রাম' (Progrom), অর্থাৎ পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ করা হইতে লাগিল।

তাঁহার অকর্মণ্যতা : রাণী ও রাসপুটিন, পোবিডোনোস্টেভ্ ও প্লেহ্‌বি-র প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ

পুলিশের অত্যাচার, উদারনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী সন্দেহে শিক্ষিত সমাজের উপর অকথ্য অত্যাচার, রাশিয়ায় বসবাসকারী ভিন্ন জাতির লোকদের উপর রুশ ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি বলপূর্বক চাপান প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল পন্থা তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে অনুসৃত হইল। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষায়তন হইতে উদার-নৈতিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগকে পদচ্যুত করা এবং তাঁহাদিগকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা, গুপ্তচরগণের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা এবং শাস্তিদান প্রভৃতি ব্যাপকভাবে চলিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার একজন স্বনামধন্য অধ্যাপক ভিনোগ্রাডোফ্ (Professor Vinogradoff) ইংলণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন : "তল্লাসী, গ্রেপ্তার অথবা নির্বাসন দণ্ড হইতে কেহ-ই রেহাই পাইবেন এমন অবস্থা নাই। ব্যক্তিগত জীবনও সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত নহে। রাশিয়াতে আমরা এইরূপ আইন-কানুনের অধীনে আছি।"* অধ্যাপক

প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ

*"Nobody is secure against search, arrest, imprisonment and relegation to the remotest part of the Empire From political supervision the solicitude of the authorities has spread into interference with all kinds of private affairs....Such is the legal protection we are now enjoying in Russia". Prof. Vinogradoff, Vide, Hazen, p. 606.

মিলিউকভ্ (Professor Miliukov) একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁহার মতামত সরকারের মনঃপূত ছিল না বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল। সরকারী ইচ্ছানুযায়ী যে-সকল সংবাদপত্র চলিতে রাজী হইল না সেগুলির প্রকাশ বন্ধ করা হইল। গ্রীণ-এর 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (Green's *History of England*) এবং ব্রাইস-এর 'আমেরিকান কমন্ওয়েল্থ্' (Bryce's *American Commonwealth*) পাঠ করা নিষিদ্ধ হইল। ছাত্রসমাজের পশ্চাতে বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করা হইল। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ছাত্র সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হইল অথবা দেশত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিল।

বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র প্রভৃতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিন্ল্যাণ্ড রাশিয়ার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময় হইতে ফিন্ল্যাণ্ড স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিয়া আসিতেছিল। রাশিয়ার জার-এর অধীনতা স্বীকার করিয়া ফিন্গণ নিজ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করিতেছিল এবং ফিন্ল্যাণ্ডের নিজস্ব সেনাবাহিনী, মুদ্রানীতি ও ডাক বিভাগ ছিল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমল হইতেই ফিন্ল্যাণ্ডের এই স্বাতন্ত্র্য-নাশের চেষ্টা চলিতেছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় নিকোলাস ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এক ঘোষণা দ্বারা ফিন্ল্যাণ্ডের শাসন-তান্ত্রিক ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হ্রাস করিলেন। পূর্বে ফিন্ল্যাণ্ড-সংক্রান্ত যাবতীয় আইন-কানুন ফিন্দের ডায়েট (Diet)-এ পাস করা হইত। কিন্তু দ্বিতীয় নিকোলাস কেবলমাত্র স্থানীয় বিষয়-সংক্রান্ত আইন-কানুন পাস করা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষমতা ডায়েটের হস্ত হইতে নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। ফলে, ফিন্ল্যাণ্ড রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসনাধীনে স্থাপিত হইল। ফিন্ল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী রুশ সেনবাহিনীর সহিত সংযুক্ত করা হইল। পূর্বে যে-সকল সরকারী পদে কেবলমাত্র ফিন্গণই নিযুক্ত হইত সে-সকল পদে এখন রুশগণকে নিযুক্ত করা হইতে লাগিল। এইভাবে ফিন্গণের জাতীয়তা-বোধ ও স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে নাশ করিবার চেষ্টা চলিল।

ফিন্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার বিলুপ্ত

একমাত্র অর্থনৈতিকক্ষেত্রে যে পুনরুজ্জীবন তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমল হইতে শুরু হইয়াছিল তাহা পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছিল। কাউণ্ট উইটির চেষ্টায় রাশিয়ার শিল্পোন্নতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হইতেছিল। শিল্পোন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে শ্রমিকগণ ক্রমেই

অর্থনৈতিক উন্নতি

নিজ শক্তি সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিল। দলবদ্ধভাবে বুঝিয়া মালিক শ্রেণীর নিকট হইতে সুযোগ-সুবিধা আদায় করা অনেক সহজ, এই কথা তাহারা উপলব্ধি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিল। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন শিল্পপতিগণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগান্তকারী পরিবর্তন রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রকটিত হইল। জমিদার শ্রেণীর নিকট হইতে ক্রমে রাজনৈতিক প্রাধান্য শিল্পপতি ও বণিক শ্রেণীর হস্তে চলিয়া যাইতে লাগিল। এই পরিস্থিতিতে শিল্প-শ্রমিকদের মধ্য হইতে কতকগুলি নূতন রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি হইল। এই সকল দলের মধ্যে 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রবাদী' (Social Democrats) দলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা

এই রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব সাধন করা। স্বৈরাচারী শাসনের কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রীদল ধর্মঘট দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সকল ধর্মঘটের দ্বারা কেবলমাত্র শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করাই উদ্দেশ্য ছিল এমন নহে, এগুলির মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনা-বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের চেষ্টাও চলিতেছিল। এই ধর্মঘট যাহাতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক অভাব-অভিযোগ দূর করিবার উদ্দেশ্যেই সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত থাকে এবং রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইতে না পারে সেজন্য সরকার গুপ্তচরদের সাহায্যে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য শুরু করাইলেন। প্রয়োজনবোধে গোপনে অর্থ সাহায্য দান করিয়া শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু এই চেষ্টার ফল হইল বিপরীত। আর্থিক সাহায্যপুষ্ট শ্রমিক ইউনিয়নগুলি অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবেই ক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিল।

সরকার কর্তৃক ইউনিয়নগুলিকে রাজনীতি হইতে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা

১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে এক যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র দেশ জাপানের নিকট বিশাল দেশ রাশিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জনসাধারণ অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিল। রাজকর্মচারীদের দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতার দরুণই এই শোচনীয়

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-৫)

পরাজয় ঘটিয়াছে এই ধারণা সকলের মনে বদ্ধমূল হইল। জাপানের সহিত যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন মন্ত্রী প্লেহ্‌বি (Plehve)-কে গোপনে হত্যা করা হইয়াছিল। এই সূত্রে রুশ-সরকার প্রায় পাঁচ হাজার ব্যক্তিকে বিনা বিচারে নির্বাসিত বা বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরবর্তী মন্ত্রী প্রিন্স্ মির্‌স্কি (Prince Mirsky) ছিলেন উদারচেতা ব্যক্তি। তিনি রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের অভিযোগ এবং দাবি সরকারের নিকট পেশ করিতে আদেশ দিলেন। দেশের বিভিন্ন অংশের জেম্‌স্ট্‌ভোগুলি যুক্তভাবে ১১ দফা দাবি উত্থাপন করিল। ব্যক্তিস্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগদখলের স্বাধীনতা, স্বমত প্রকাশের এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসনাধিকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি, নির্বাচনমূলক প্রতিনিধি সভা গঠন এবং শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য সংবিধান-সভা স্থাপন ছিল তাহাদের প্রধান প্রধান দাবি।

প্রিন্স মির্‌স্কির উদারতা

১১ দফা সংস্কার দাবি

সংস্কার দাবি লইয়া দেশের সর্বত্র এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি এক ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হইল। এই সূত্রে ২২শে জানুয়ারি ফাদার গ্যাপন (Father Gapon) নামে একজন ধর্মযাজকের নেতৃত্বে পেট্রোগ্রাদে ধর্মঘটী শ্রমিকদের এক শোভাযাত্রা বাহির হইল। এই শোভাযাত্রা জার নিকোলাসের নিকট তাহাদের দাবি পেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে তাহাদের উপর সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করিলে বহুসংখ্যক শ্রমিক হতাহত হইল। এই দিনের রক্তস্নানে রাশিয়ার বিপ্লবী আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ২২শে জানুয়ারি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে "রক্তমাখা রবিবার" (Red Sunday) নামে পরিচিত। এই দিনের ঘটনার ফলে রাশিয়ার সর্বত্র বিপ্লবাত্মক কার্যাদি শুরু হইল। গ্রামাঞ্চলে কৃষকগণ জমিদার শ্রেণীর সম্পত্তি, ঘরবাড়ী ধূলিসাৎ করিল। শহর অঞ্চলে পুলিস কর্মচারী, গুপ্তচর প্রভৃতিকে হত্যা করা হইতে লাগিল। জার নিকোলাসের প্রতিক্রিয়াপন্থী খুল্লতাত ডিউক সার্জিয়াসকেও (.Duke Sergius) হত্যা করা হইল। এইভাবে জার-তন্ত্রের ভিত্তি অবধি প্রকম্পিত হইয়া উঠিলে নিকোলাস জাতীয় সভা আহ্বানের দাবি মানিয়া লইলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে নিকোলাস জাতীয় সভা (National Assembly or Duma) আহ্বান করিবার ইচ্ছা ঘোষণা

'রক্তমাখা রবিবার' (২২শে জানুয়ারি, ১৯০৫)

করিলেন। দুই মাস পরে তিনি 'বুলিঘিন্ শাসনতন্ত্র' (Bulyghin Constitution) নামে একটি শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিলেন। এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় সভার পরিবর্তে একটি 'ইম্পিরিয়াল ডুমা' (Imperial Duma) স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল। এই সভাকে কেবলমাত্র পরামর্শ দানের ক্ষমতা দেওয়া হইল। ইম্পিরিয়াল ডুমার নির্বাচনে গ্রাম্য ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্প শ্রমিকগণ এবং সম্পত্তিহীন গ্রামবাসীকে ভোটাধিকার দেওয়া হইল না। দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা স্থাপনের নীতিও গ্রহণ করা হইল না। এই শাসনতন্ত্র কাহারও সন্তুষ্টি বিধান না করায় সমগ্র রাশিয়ায় এক ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু হইল। রাশিয়ার সমাজ-জীবন একেবারে অচল হইয়া পড়িলে ৩০শে অক্টোবর (১৯০৫ খ্রীঃ) একটি ঘোষণা (October Manifesto) দ্বারা নিকোলাস ডুমাকে আইন-প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দান করিলেন। রুশবাসীর নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হইল এবং সেইভাবে ভোটদানের ক্ষমতার প্রসারের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইল। শ্রমিকগণও ভোটাধিকার লাভ করিল। ২৪শে ডিসেম্বর (১৯০৫ খ্রীঃ) এক সরকারী আদেশ দ্বারা এই সকল সংস্কার কার্যকরী করা হইল।

বুলিঘিন্ শাসনতন্ত্র

অক্টোবর ঘোষণা (৩০শে অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রীঃ)

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে জাতীয় সভা ডুমার প্রথম অধিবেশন শুরু হইল। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কয়েকটি প্রধান দলে বিভক্ত ছিলেন। উদারনীতিতে বিশ্বাসী দল 'কনস্টিটিউশন্যাল ডিমোক্র্যাট' (Constitutional Democrats) নামে পরিচিত ছিলেন। সাধারণ্যে তাঁহারা 'ক্যাডেট' (Cadets) নামে অভিহিত হইতেন। রক্ষণশীল দল (Conservatives) নিকোলাস-প্রদত্ত অক্টোবর ঘোষণার উপর আস্থাবান্ ছিলেন। এইজন্য তাঁহারা অক্টোবরিস্ট (Octoborists) নামেও অভিহিত হইতেন। শ্রমিক দল হইতে মোট ১০৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন 'স্বায়ত্ত-শাসন' দল (Autonomists) নামে পোল ও অপরাপর সংখ্যালঘু জাতির প্রতিনিধিবর্গও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা নিজ নিজ এলাকায় স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। "ক্যাডেট"গণ ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অনুকরণে দায়িত্বমূলক মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নিকোলাস কয়েকটি ঘোষণা জারি করিয়া

প্রথম ডুমা (মে ২০ হইতে জুলাই ২১, ১৯০৬)

ডুমার ক্ষমতা হ্রাস

ডুমার পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা অথবা সামরিক বাহিনী, নৌ-বাহিনী প্রভৃতি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করিবার অধিকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন দেশের মৌলিক আইন-কানুন পরিবর্তনের অধিকারও ডুমাকে দেওয়া হইল না। দুই মাস ধরিয়া জার এবং ডুমার মধ্যে বিবাদ চলিল। অবশেষে ২১শে জুলাই নিকোলাস (১৯০৬ খ্রীঃ) ডুমা ভাঙ্গিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় ডুমা (মার্চ ৫ হইতে জুন ১৬, ১৯০৭)

নূতন নির্বাচনের সময়ে সরকারী পক্ষ হইতে অক্টোবরিস্ট্ এবং প্রতিক্রিয়াশীল দলের প্রতিনিধিগণকে সাহায্য দান করা হইল। উদারনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া অথবা অন্যান্য অবৈধ কৌশলে নির্বাচন হইতে দূরে রাখা হইল অথবা নানাপ্রকার দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া নির্বাচনে তাঁহাদিগকে পরাজিত করা হইল। ক্যাডেট দল মাত্র ৫০ হইতে ৬০টি আসন পাইল। দ্বিতীয় ডুমারও বেশিদিন অধিবেশনে থাকা সম্ভব হইল না। নিকোলাস তাঁহার প্রতি ক্যাডেট দলের আনুগত্যহীনতার অজুহাতে ক্যাডেট প্রতিনিধিগণকে ডুমা হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিলে শেষ পর্যন্ত ডুমা ভাঙ্গিয়া দিতে হইল।

তৃতীয় ডুমা (১৯০৭-১৯১২)

তৃতীয় ডুমা অবশ্য ১৯০৭ হইতে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অধিবেশনে রহিল। এই ডুমার একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল কৃষকদিগকে নিজ নিজ ভূসম্পত্তির মালিকানা দান। পূর্বে গ্রামের সকল জমি কৃষকদিগকে সমষ্টিগতভাবে ভোগ-দখল করিতে হইত। এখন এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা লাভ করিল।

চতুর্থ ডুমা (১৯১২-'১৭)

চতুর্থ ডুমা নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল দলের সদস্য সংখ্যা হইল সর্বাধিক (১৫৫ জন)। ক্যাডেট প্রতিনিধিগণের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫২ ; অক্টোবরিস্ট্‌গণ অবশ্য এই সময় হইতে ক্যাডেটদের সহিত মিলিতভাবে সরকারের বিরোধিতা করিতে শুরু করিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের ঘোষণা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র স্থাপিত হয় নাই। এই কারণে তাহারা সরকারের পক্ষ ত্যাগ করিয়া বিরোধী পক্ষে যোগদান করিলে ক্রমেই শাসনতন্ত্র-সংক্রান্ত বিবাদ বাড়িয়া চলিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রোগ্রেসিভ্ ব্লক' (Progressive Block) নামে এক নূতন দলের সৃষ্টি হইলে

রুশবিপ্লব (১৯১৭)

সংস্কার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। জার নিকোলাসের অদূরদর্শিতার ফলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশবিপ্লবে জার-তন্ত্রের অবসান ঘটিল। (রুশবিপ্লবের বিশদ আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।)

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্বাঞ্চল বা নিকট প্রাচ্যের সমস্যা

(Eastern or Near-Eastern Question)

পূর্ব-কথা (Retrospect) : ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন চুক্তি দ্বারা নিকট-প্রাচ্যের বা পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। বলকান অঞ্চলের দেশসমূহের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া বার্লিন-কংগ্রেসে সমবেত রাজনীতিকগণ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বুলগেরিয়াকে দুই অংশে ভাগ করাও অদূরদর্শিতার কাজ হইয়াছিল। ফলে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার জটিলতা হ্রাস-প্রাপ্ত না হইয়া বৃদ্ধিই পাইয়াছিল।

বার্লিন কংগ্রেসের পরবর্তী কালে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার স্বরূপ ১৮৭৮—১৯১৪ (Nature of the Eastern Question, 1878—1914)

বলকান সমস্যার জটিলতা

বার্লিন চুক্তিতে পূর্বাঞ্চলের সমস্যার সমাধান হয় নাই, উপরন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থপর নীতির ফলে বলকান অঞ্চল ইওরোপের তথা সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ঝটিকা কেন্দ্রে পরিণত হইল। বার্লিন কংগ্রেসের অকৃতকার্যতার ফলে বলকান অঞ্চলে নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব হইতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বহু বৎসর অবধিও এই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় নাই। ফলে, তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনে সেই সমস্যাগুলির শেষ পরিণতি ঘটে। উপরন্তু নিম্নলিখিত কারণে বলকান তথা পূর্বাঞ্চলের সমস্যার জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কারণ : (১) বার্লিন চুক্তিতে বলকান জাতীয়তার উপেক্ষা

(১) বার্লিন চুক্তি বলকান জাতিগুলির জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়াছিল। যে-সকল বলকান রাজ্য স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিল সেগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে পুনর্গঠন না করায় স্বভাবতই সেই সব রাজ্যের অধিবাসিগণ নিজ নিজ দেশের সীমা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের মধ্যে যাহারা তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহাদিগকে নিজেদের সহিত ঐক্যবদ্ধ করিতে

সচেষ্ট হইল। (২) ইহা ভিন্ন যে-সকল বলকান জাতি তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের শাসনাধীনে স্থাপিত হইয়াছিল সেগুলিও স্বাধীনতা দাবি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে "তরুণ তুর্কী" (Young Turk) বিদ্রোহ দেখা দিলে বলকান দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনের বা রাজ্যবিস্তারের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। (৩) মন্টিনিগ্রো ও হারজেগোভিনাকে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে স্থাপন করিবার ফলে বলকান অঞ্চলে জটিলতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জার্মানির সাহায্যপুষ্ট অস্ট্রিয়ার বলকান অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার-নীতির ফলেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইযাছিল। (৪) বার্লিন চুক্তিতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থপরতার পরিচয় পাইয়া তুর্কী সুলতান জার্মানির সহিত মিত্রতাবদ্ধ হন। এই সুযোগে জার্মানি নিজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বার্লিন হইতে বাগদাদ পর্যন্ত একটি রেলপথ প্রস্তুতের জন্য সচেষ্ট হইল। (৫) এইসকল কারণ ভিন্ন বলকান দেশগুলির পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থের সংঘাতে পূর্বাঞ্চলের সমস্যা এক অতিশয় জটিল সমস্যায় পরিণত হইল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালের বুলগেরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, আর্মেনিয়া প্রভৃতি স্থানের ইতিহাসে এই সমস্যার জটিলতা পরিলক্ষিত হয়।

(২) তুর্কী সাম্রাজ্যভুক্ত বলকান জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহা

(৩) মন্টিনিগ্রো ও হারজেগোভিনার উপর অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য

(৪) তুর্কী-জার্মান মিত্রতা

(৫) বলকান দেশগুলির পরস্পর স্বার্থ-দ্বন্দ্ব

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পর বুলগেরিয়াঃ বুলগার জাতির জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া বার্লিন কংগ্রেস বৃহৎ বুলগেরিয়াকে পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়ায় বিভক্ত করিয়াছিল। কিন্তু এই কৃত্রিম বিভাগ ইতিহাসের ধারা ও ইঙ্গিতের বিরোধী ছিল বলিয়াই উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। রুশ প্রাধান্যাধীন বৃহৎ বুলগেরিয়া গঠনের ভীতির ফলেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গ এই অদূরদর্শী নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। কিন্তু জাতীয়-চেতনায় উদ্বুদ্ধ বুলগার জাতি বার্লিন চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিল। ব্যাটেনবার্গের প্রিন্স্ আলেকজাণ্ডার এই ঐক্যবদ্ধ বুলগেরিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ইনি রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেক-

বার্লিন কংগ্রেস কর্তৃক বুলগেরিয়ার কৃত্রিম বিভাগ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া ও পূর্ব-রুমেলিয়ার ঐক্যসাধন

জাণ্ডারের নিকট-আত্মীয় ছিলেন। পূর্ব-রুমেলিয়া এবং বুলগেরিয়ার ঐক্যসাধনে স্টিফেন স্ট্যাম্বোলোভ্ (Stephen Stambolov) নামে একজন বুলগার নেতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সার্বিয়া কর্তৃক যুদ্ধ-ঘোষণা

রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় বলকান অঞ্চলের শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বিনষ্ট হইয়াছে এই অজুহাতে সার্বিয়া বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। অবশ্য ইহার মূল কারণ ছিল বুলগেরিয়ার রাজ্যবৃদ্ধিতে সার্বিয়ার ঈর্ষা।

সার্বিয়ার পরাজয়: বুকারেস্ট্-এর সন্ধি

কিন্তু বুলগেরিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া সার্বিয়ান সৈন্য শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল, এমন কি বুলগেরিয়ার সৈন্য সার্বিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। এই সময়ে অস্ট্রিয়ার চাপে বুলগেরিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয় এবং বুকারেস্ট্ (Bucharest)-এর সন্ধিদ্বারা যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে উভয় দেশ স্বীকার করে।

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বুলগেরিয়া নীতির পরিবর্তন

স্যান স্টিফানোর সন্ধিদ্বারা যে বৃহৎ বুলগেরিয়া রাজ্য গঠন করা হইয়াছিল, উহা বিভক্ত করিয়া রুমেলিয়া ও বুলগেরিয়া দুইটি রাজ্য গঠনের জন্য বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত সদস্যদের মধ্যে ডিজ্‌রেলীই ছিলেন প্রধানত দায়ী। ডিজ্‌রেলী বৃহৎ বুলগেরিয়ার উপর রুশ প্রাধান্য স্থাপিত হইবে মনে করিয়া বুলগেরিয়ার আকার যথাসম্ভব ক্ষুদ্র হউক এই ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু বুলগেরিয়া রাশিয়ার তাঁবেদার রাজ্য হিসাবে থাকিতে রাজী নহে এই প্রমাণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া ও রুমেলিয়ার ঐক্যবদ্ধ হওয়া সমর্থন করে।* অপরদিকে রাশিয়া বুলগেরিয়ার বিরোধিতা শুরু করিল। স্যান স্টিফানোর সন্ধির পর হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিশেষত, ইংলণ্ড, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার

* "A Bulgaria friendly to the Porte and jealous of foreign influence, would be a far surer bulwark against foreign aggression than two Bulgarias severed in administration..." Lord Salisbury. Vide, Ketelbey. p. 315.

বলকান নীতির পরিবর্তন ঘটিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ও ইওরোপের শক্তিবর্গ বুলগেরিয়া ও রুমেলিয়ার ঐক্য অনুমোদন করিলে রাশিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। ঐ বৎসরই রাশিয়া এক ষড়যন্ত্রের দ্বারা আলেকজাণ্ডারকে বুলগেরিয়ার শাসনভার ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। পরবর্তী শাসক ফার্ডিনাণ্ড সেক্সিকোবার্গ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া তুর্কী সুলতানের অধীনতা সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন। ফলে, তুর্কী সুলতান বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু রাশিয়ার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া বুলগেরিয়া তুর্কী সুলতানকে ক্ষতিপূরণ দান করিলে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের পার্লামেণ্ট বুলগেরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে।

তুরস্ক ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক বুলগেরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার (১৮৮৬)

আর্মেনিয়ান সমস্যা : উনবিংশ শতাব্দীতে তুরস্ক সরকারের দমন-নীতির ফলে আর্মেনিয়াবাসীর কষ্টের সীমা ছিল না। ইংলণ্ড ছিল আর্মেনিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। বার্লিনের চুক্তি এবং সাইপ্রাসের চুক্তি (Cyprus Convention) ইংলণ্ড আর্মেনিয়ানদের জন্য তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছিল; তুর্কী সুলতান আর্মেনিয়ায় উদার-নৈতিক সংস্কারসাধনেও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত তিনি এই সকল প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। আর্মেনিয়ানগণ তুর্কী সরকার হইতে সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন সুরু করিলে তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদ দেখিলেন যে, আর্মেনিয়ায় বুলগেরিয়ার মত আরও একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আর্মেনিয়ান আন্দোলনকারিগণ তুর্কী সরকারের বিরোধিতা করিলে সমগ্র আর্মেনিয়াবাসীদের উপর অত্যাচার শুরু হইল। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মোট পঞ্চাশ হাজার আর্মে-নিয়ান তুর্কীদের অত্যাচারে প্রাণ হারাইল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলস্থ আর্মেনিয়ানগণ তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে একদিনে ছয় হাজার আর্মেনিয়ানকে হত্যা করা হইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বার্থপরতা তাহাদিগকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপে বিরত রাখিল। আর্মেনিয়ানগণও অবশেষে বুলগারদের ন্যায়

আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা-আন্দোলন : তুর্কী দমন-নীতি

আর্মেনিয়ার হত্যাকাণ্ড (১৮৯৪, ১৮৯৫ খ্রীঃ)

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ছয় হাজার আর্মেনিয়ান হত্যা

অকৃতজ্ঞ হইতে পারে এই আশঙ্কায় রাশিয়া সাহায্যদানে অগ্রসর হইল না। ইহা ভিন্ন আর্মেনিয়ানগণ রুশদের ন্যায় গ্রীক খ্রীষ্টান (Orthodox or Greek Christians) ছিল না, এইজন্য ধর্মের দিক দিয়াও রাশিয়া কোন দায়িত্ব বোধ করিল না। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া তখন নিজ নিজ স্বার্থের খাতিরে তুর্কী সুলতানের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলিতেছিল। কেলমাত্র ইংলণ্ড ছিল আর্মেনিয়ানদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। কিন্তু ইংলণ্ডের প্রতিবাদ তুর্কী সুলতান মোটেই গ্রাহ্য করিলেন না। ইংলণ্ড কর্তৃক তুরস্ক সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ নীতির পরিণাম উপলব্ধি করিয়া লর্ড সল্‌সবেরি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন যে, তুরস্ককে এতদিন সাহায্য করিয়া ইংলণ্ড ভুল করিয়াছে।*

ইওরোপীয়-শক্তিবর্গের নিষ্ক্রিয়তা : ইংলণ্ডের প্রতিবাদ

গ্রীস ও তুরস্কের যুদ্ধ: বার্লিন কংগ্রেসে সমবেত রাজনীতিকদের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রীসকে ইপাইরাস (Epirus) ও থেস্তালির (Thessaly) একাংশ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজ্যাংশ পাইয়া গ্রীসের জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল আইওনিয়ার গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ডের শাসনাধীন ছিল। লর্ড পামারস্টোন যখন প্রধান মন্ত্রী তখন তিনি এই কয়টি দ্বীপ গ্রীসকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীক দ্বীপ ক্রীট্ তখনও তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তুর্কী শাসনাধীনে ক্রীট্‌বাসীরা বলকানদের ন্যায়-ই অত্যাচারিত হইতেছিল। ১৮৩০ হইতে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা মোট চৌদ্দবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। তুর্কী-অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া গ্রীসের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে ক্রীটানগণের বিদ্রোহে গ্রীকগণ স্বভাবতই সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে তাহারা সংস্কারের মৌখিক প্রতিশ্রুতি ভিন্ন কিছুই আদায় করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীটানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং স্বেচ্ছায় গ্রীসের সহিত সংযুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করে। গ্রীস ক্রীটানদের

ক্রীটানদের অপরিতৃপ্ত জাতীয়তা-স্পৃহা

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ক্রীটান বিদ্রোহ

* "Lord Salisbury, together with most of his countrymen came to a significant conclusion, that in supporting Turkey hitherto England put her money on the wrong horse." Vide, Ketelbey, p. 318.

সাহায্যের জন্য এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত থেস্তালির অংশ আক্রমণ করে। এই সূত্রে গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৯৭)। জার্মানির সাহায্যপুষ্ট তুর্কী সুলতান সহজেই গ্রীসকে পরাজিত করিয়া কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি এবং প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রীসের নিকট হইতে আদায় করিলেন। আর্মেনিয়ান সমস্যার ক্ষেত্রে যেরূপ স্বার্থপরতা ও পরস্পর-বিরোধিতার ফলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নাই, এক্ষেত্রে সেইরূপ না হইলেও এই সমস্যার সমাধানে অযথা বিলম্ব ঘটিযাছিল। অস্ট্রিয়া ও জার্মানি ছিল তুরস্কের পক্ষে। তাহারা তুর্কী সুলতানের স্বার্থ-বিরোধী কোন প্রস্তাব গ্রহণেই স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও রাশিয়ার চাপে তুর্কী সুলতান ক্রীটে স্বাযত্তশাসন স্থাপনে বাধ্য হইলেন। এই চারি দেশের এক যুগ্ম সমিতির হস্তে ক্রীটের শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। গ্রীসের রাজা জর্জের পুত্র যুবরাজ জর্জ ক্রীটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীটানগণ তুরস্ক সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এইবারও গ্রীস সাহায্য প্রেরণ করিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের চেষ্টায় গ্রীস সৈন্য অপসারণে বাধ্য হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের বলকান যুদ্ধের পর অবশ্য ক্রীট্ গ্রীসের সহিত ঐক্যবদ্ধ হয়।

গ্রীস-তুর্কী যুদ্ধ (১৮৯৭)

ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সনির্বন্ধতায় ক্রীটে স্বাযত্তশাসন প্রবর্তন

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের সহিত ক্রীটের সংযুক্তি

তুরস্কে বিপ্লবী আন্দোলন (Revolution in Turkey): ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বাঞ্চলের সমস্যায় এক নূতন জটিলতা দেখা দেয়। ঐ বৎসর জুলাই মাসে তুরস্কে এক বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন "তরুণ তুর্কী আন্দোলন" (Young Turk Movement) নামে পরিচিত। তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদের অত্যাচারে দেশত্যাগী একদল তুরস্কবাসী এই বিপ্লবী দল গঠন করিয়াছিল। দেশ ত্যাগ করে নাই এমন বহু সংখ্যক তুর্কী যুবকও এই দলে যোগদান করিয়াছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবসমাজ লইযা গঠিত 'তরুণ তুর্কী' দল তুর্কী সুলতানের অত্যাচারী শাসনের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা-স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিল। তাহারা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা, উদার

'তরুণ তুর্কী' আন্দোলন

শাসনতন্ত্র-স্থাপন, প্রতিনিধিমূলক পার্লামেণ্ট এবং ধর্মপালনের স্বাধীনতা দাবী করিল। তাহাদের আন্দোলন দ্রুত সমগ্র তুর্কীজাতির মধ্যে এক নব-চেতনার সৃষ্টি করিল। এমন কি, তুর্কীসৈন্যের মধ্যেও এই চেতনা জাগিল। সুলতান দ্বিতীয় হামিদ প্রমাদ গণিলেন। পরিস্থিতির চাপে তিনি 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনকারীদের দাবি মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আব্দুল হামিদ এই সকল উদারনৈতিক সংস্কার নাকচ করিয়া স্বৈরাচারী হইয়া উঠিলে 'তরুণ তুর্কী' দল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা পঞ্চম মোহম্মদকে সুলতানপদে স্থাপন করিল (১৯০৯)।

দ্বিতীয় হামিদের পদ-চ্যুতি : পঞ্চম মোহম্মদকে সুলতানপদে স্থাপন

এই বিপ্লবের গুরুত্ব সমগ্র বলকান অঞ্চলে পরিলক্ষিত হইল। এই সুযোগে বুলগেরিয়া তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া গেল। বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা নামক স্থান দুইটি অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া লইল। ঐ সময়ে ইতালিও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী ছিল। তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ইতালি আফ্রিকাস্থ তুরস্ক সাম্রাজ্যাংশ ট্রিপোলি (Tripoli) দখল করিয়া লইল।

'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের ফলাফল

অস্ট্রিয়া কর্তৃক বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা অধিকৃত হওয়ায় সার্বিয়া অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিল, কারণ এই দুই স্থানের অধিবাসিগণ সার্বিয়ানদের ন্যায় স্লাভ্‌জাতির লোক ছিল। ইহা ভিন্ন বলকান অঞ্চলে জার্মানির প্রাধান্য-বিস্তৃতি এবং বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার রাজ্যবিস্তারে রাশিয়ার অসন্তুষ্টি ক্রমেই বলকান রাজনীতিক্ষেত্রে এক জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জটিলতার ফলেই ১৯১২, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বলকান যুদ্ধ এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বলকান অঞ্চলের জটিলতা

প্রথম বলকান যুদ্ধ, ১৯১২ (The First Balkan War): 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের সাফল্যের পরও তুর্কী সরকার তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন জাতিকে স্বায়ত্তশাসন দানের কোন চেষ্টা করিলেন না। উপরন্তু তুর্কী সরকার অত্যাচারের দ্বারা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে গ্রীসদেশের মন্ত্রী ভেনিজেলোস্ (Venizelos) গ্রীস, সার্বিয়া, মণ্টিনিগ্রো ও বুলগেরিয়া এই কয়টি খ্রীষ্টান দেশ

লইয়া 'বলকান লীগ' (Balkan League) নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন।

বলকান লীগ

এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী সরকারের অত্যাচার রোধ করা। অপরদিকে তুর্কী সরকার ম্যাসিডনিয়াকে দমন-নীতির দ্বারা তুর্কী সরকারের আনুগত্যপূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলকান লীগ অত্যাচারিত ম্যাসিডনিয়াবাসীকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে তুর্কী সুলতানকে ম্যাসিডনিয়ায় প্রতিশ্রুত সংস্কার সাধনের জন্য চাপ দিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ বলকান লীগকে তুরস্কের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তুরস্ক ম্যাসিডনিয়ায় কোনপ্রকার সংস্কার প্রবর্তন করিতে অস্বীকৃত হইলে বলকান লীগ ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিষেধ না মানিয়া চতুর্দিক হইতে তুরস্ক সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধ প্রথম বলকান যুদ্ধ নামে পরিচিত।

তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

সর্বত্র পরাজিত হইয়া তুর্কী সরকার লণ্ডনের চুক্তি (Treaty of London) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল (১৯১৩)। এই চুক্তির শর্তানুসারে কেবলমাত্র কন্‌স্টান্টিনোপল এবং থ্রেসের ক্ষুদ্র একাংশ বাদে সমগ্র বলকান-অঞ্চল—অর্থাৎ তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত ইওরোপীয় অঞ্চল স্বাধীন হইয়া গেল। ইহা ভিন্ন গ্রীসকে ক্রীট্‌ দ্বীপটিও দান করিতে হইল।

লণ্ডন চুক্তি (১৯১৩)

দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ, ১৯১৩ (The Second Balkan War): প্রথম বলকান যুদ্ধের পর ম্যাসিডনিয়া দখল লইয়া বলকান দেশগুলির মধ্যে এক নীচ স্বার্থপরতা শুরু হইল। বুলগেরিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে এই বিষয় লইয়া শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বাধিল। গ্রীস ও রুমানিয়া সার্বিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিলে শেষ পর্যন্ত বুলগেরিয়া পরাজিত হয় এবং বুকারেস্ট্‌-এর সন্ধি দ্বারা (১৯১৩) ম্যাসিডনিয়ার উপর দাবি ত্যাগ করে। ইহা ভিন্ন রুমানিয়াকে বুলগেরিয়ার একাংশ দান করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের সুযোগে তুরস্ক আড্রিয়ানোপল এবং থ্রেস-এর একাংশ পুনর্দখল করিয়াছিল। বুকারেস্ট্‌-এর সন্ধি দ্বারা এই শর্তও অনুমোদিত হয়।

বুকারেস্ট-এর সন্ধি (১৯১৩)

প্রথম এবং দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের গুরুত্ব: (১) ১৯১২ এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বলকান যুদ্ধের ফলে ইওরোপ মহাদেশে তুরস্ক সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন ঘটে। কেবলমাত্র কন্‌স্টান্টিনোপল এবং থ্রেস-এর অতি ক্ষুদ্র একাংশ ভিন্ন অপরাপর সকল স্থানই তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন হইয়া পড়ে।

তুরস্কের ইওরোপীয় সাম্রাজ্যাংশের পতন

(২) তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বলকান অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইলেও বলকান রাজ্যগুলির মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য স্থাপিত হইল না, উপরন্তু সেগুলির পরস্পর-ঈর্ষা বৃদ্ধি পাইল। (৩) বলকান যুদ্ধের ফলে সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়ার শত্রুতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য-বিস্তারের প্রধান বিরোধী ছিল সার্বিয়া। স্লাভ্‌জাতি অধ্যুষিত সার্বিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌহার্দ্য ছিল তাহা রুশ-অস্ট্রিয়ার পরস্পর বিদ্বেষের ফলে অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার আক্রমণ হইতে স্লাভ্‌জাতিকে রক্ষা করা সার্বিয়া এবং রাশিয়া উভয় দেশেরই প্রধান দায়িত্বে পরিণত হইয়াছিল। অপরদিকে জার্মানির সাহায্যপ্রাপ্ত অস্ট্রিয়াও যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ফলে, এই পরস্পর-বিরোধী মনোভাব ক্রমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করে।

বলকান অঞ্চলে পরস্পর বিদ্বেষ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুতি

চতুর্থ অধ্যায়

ফ্রান্স (France)

বুলাঞ্জিস্ট্‌ আন্দোলন (Boulangist Movement) : জেনারেল বুলাঞ্জার (Boulanger) ছিলেন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ সামরিক কর্মচারিবর্গের অন্যতম। তিনি যেমন ছিলেন সুদর্শন, জনপ্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেমনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও নীতিজ্ঞানহীন। তিনি তাঁহার অধীন সৈনিকদের নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে নিজের সমর্থক দলে পরিণত করেন। তারপর তিনি জার্মানির নিকট হইতে আলসেস্‌-লোরেন্‌ পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সে এক ব্যাপক প্রচারকার্য শুরু করেন। তিনি ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সংস্কার দাবি করেন। তাঁহার কর্মপন্থা অবশ্য তেমন সুস্পষ্ট ছিল না। যাহা হউক, দেশের

জেনারেল বুলাঞ্জার

রাজতান্ত্রিক, যাজক সম্প্রদায় তথা যে-কোন অকৃতকার্য, হতাশ ব্যক্তিমাত্রেই বুলাঙ্গারের পক্ষে যোগদান করিলে দেশে 'বুলাঙ্গিস্ট্' আন্দোলন শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত সরকার তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু জনসাধারণ তাঁহাকে প্রতিনিধি সভায় সদস্য হিসাবে নির্বাচন করিল। ইতিমধ্যে বুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিবার অভিযোগের বিচার করিবার ভার সিনেটের উপর অর্পণ করা হইল। বুলাঙ্গার দেশ হইতে পলাইয়া গেলেন। ইহার দুই বৎসর পর তিনি ব্রাসেলস্-এ আত্মহত্যা করেন। তাঁহার পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে বুলাঙ্গিস্ট্ আন্দোলনেরও অবসান ঘটে এবং তাঁহার দলেরও পতন হয়।

বুলাঙ্গিস্ট' আন্দোলন

আন্দোলনের অসাফল্য

ড্রেফুস ঘটনা (Dreyfus Affair): ক্যাপ্টেন আল্‌ফ্রেড্ ড্রেফুস (Alfred Dreyfus) ছিলেন জনৈক আল্‌সিশিয়ান ইহুদি। এস্টারহেজি (Esterhazy) নামক অপর একজন সামরিক কর্মচারী ড্রেফুসের বিরুদ্ধে সামরিক গোপন তথ্যাদি প্রকাশের এক মিথ্যা অভিযোগ আনিলে সামরিক স্কুলের প্রাঙ্গণে ড্রেফুসের পোশাক হইতে সামরিক কর্মচারীর প্রতীক চিহ্ন (Badge of rank) ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইল এবং ডেভিলস্ দ্বীপ (Devil's Island)-এ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ড্রেফুসের বক্তব্য কেহ শুনিল না। কিন্তু কিছুকাল পরে কর্ণেল পিকার্ট (Colonel Picquart) সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলে তিনি ড্রেফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা সেই তথ্য সংগ্রহ করিলেন। কর্ণেল পিকার্ট ড্রেফুসের পুনর্বিচার দাবি করিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি অকৃতকার্য হইলেন এবং শেষ পর্যন্ত পদচ্যুত হইলেন। এই ব্যাপার লইয়া দেশে দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল। এমিল জোলা ড্রেফুসের বিচারের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল এবং এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। তিনি কারাগার হইতে পলাইয়া গিয়া বিদেশে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এইভাবে ড্রেফুসের পুনর্বিচার সম্ভব হইল না। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল হেনরী স্বীকারোক্তি করিলেন যে, তিনি ড্রেফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ-সংক্রান্ত কাগজপত্র জাল করিয়াছিলেন। এই স্বীকারোক্তির পর তিনি আত্মহত্যা করিলেন। এস্টারহেজিও অনুরূপ স্বীকারোক্তি

ড্রেফুসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

এমিল জোলা

ড্রেফুসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের সত্যপ্রকাশ

করিয়া দেশ হইতে পলাইয়া গেলেন। এই ঘটনার পর ড্রেফুসকে নির্বাসন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া পুনরায় বিচারে যাবজ্জীবন কারাবাসের পরিবর্তে দশ বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হইল। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট এই দণ্ডাদেশ মকুব করিয়া দিলেন। ইহাতে ড্রেফুস-বিরোধী দলের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। অপরপক্ষে ড্রেফুসের সমর্থকগণ ড্রেফুস নির্দোষ সেই কথা বিচারে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন করিতে লাগিল। অবশেষে ড্রেফুসের পুনরায় বিচার হইল (১৯০৬)। এবার তাহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষী বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং তাঁহার পদোন্নতি ঘটিল। পিকার্টকেও অনুরূপ পুনর্নিয়োগ করা হইল এবং তাঁহারও পদোন্নতি ঘটিল। ড্রেফুসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ জাল করিবার ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-বর্গের পদচ্যুতি ও শাস্তি হইল। ড্রেফুস-বিচারে শেষ পর্যন্ত ন্যায় ও সততার জয় ঘটিলে তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইল।

ড্রেফুসের পুনর্বিচার

ড্রেফুসের তৃতীয়বার বিচার—নির্দোষ সাব্যস্ত

চার্চ ও সমাজতন্ত্রবাদ-সংক্রান্ত সমস্যা (Problem of the Church & Socialism) ঃ ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভ হইতেই ফরাসী চার্চ রাষ্ট্রের অধীন একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ফরাসী চার্চ ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উপর আস্থাবান ছিল না। তৃতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি ফরাসী চার্চের বিরোধিতা বুলাঞ্জিস্ট্ আন্দোলন ও ড্রেফুস বিচার-সংক্রান্ত আন্দোলনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বহু ধর্মযাজক এই দুই আন্দোলনের কালে তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিপক্ষে যোগদান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন চার্চ ও ধর্মযাজক-গণ বিরাট পরিমাণ সম্পত্তি ও অর্থ সঞ্চয় করিয়া নিজ নিজ শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই সময়ে শিক্ষায়তনগুলির অধিকাংশ-ই ছিল চার্চের পরি-চালনাধীন। সেই সূত্রে যাজকসম্প্রদায় রক্ষণশীলতা ও প্রজাতান্ত্রিকতার বিরোধিতা প্রচারের সুযোগ পাইত। এমতাবস্থায় ফরাসী যাজকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এক তীব্র জনমতের সৃষ্টি হইল। ওয়ালডেক্-রুশো (Waldeck-Rousseau) মন্ত্রিসভা ও প্রজাতান্ত্রিক সরকারের নিরা-পত্তার জন্য চার্চের ক্ষমতা হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজন বোধ করিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন (Law of Associations) পাস করিয়া নূতন কোন ধর্মসংঘ বা রাজনৈতিক সংঘ গঠন

চার্চ ও যাজকসম্প্রদায় কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরোধিতা

ওয়ালডেক্-রুশো মন্ত্রিসভায় আইন

করিতে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইল সরকারের অননুমোদিত যাবতীয় ধর্মসংঘ ও রাজনৈতিক সংঘ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার আদেশও জারী করা হইল। ইহার পর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মযাজকগণ কর্তৃক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। চার্চের অধীন বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিতে বা রাষ্ট্রের নিকট ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেওয়া হইল। পর বৎসর রাষ্ট্র ও চার্চের পৃথকীকরণ আইন (Law of Separation) পাস করিয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন পোপের সহিত যে চুক্তি (Concordat) স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাহা বাতিল করিয়া দিয়া চার্চকে রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়া তৃতীয় প্রজাতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করা হইল। চার্চের জমি দখল করিবার সর্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ

রাষ্ট্র হইতে চার্চ কোনপ্রকার অর্থ সাহায্য পাইবে না, চার্চের অধীন ধর্মাধিষ্ঠানে সকলে সমভাবে প্রবেশাধিকার পাইবে—এই সকল শর্ত প্রবর্তিত হইল। এইভাবে ফরাসী তৃতীয় প্রজাতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের ধর্ম-নিরপেক্ষতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইওরোপে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। ফ্রান্সেও সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ফরাসীগণ শোষণহীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। তাহাদের আন্দোলনের ফলে কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক আইন-কানুন প্রবর্তিত হয়। এগুলির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দান (১৮৮৪), শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দানের আইন (১৮৯৮), শ্রমিকদের কর্মকাল দশ ঘণ্টায় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার আইন (১৯০৬) ও বৃদ্ধাবস্থায় পেনশন্ বা ভাতা দানের আইন (১৯১০) প্রভৃতি আইন পাস করা হয়। এই সকল উন্নয়নমূলক আইন পাস হইলে স্বভাবতই পূর্বেকার ধর্মঘট ও অন্যান্য প্রকার গোলযোগের কতকটা অবসান ঘটে। কিন্তু ইহার পরও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য আন্দোলন চলিতে থাকে।

ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদের প্রসার

শ্রমিক-উন্নয়ন আইন

ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতি (Foreign Policy of France): সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পর আলসেস্-লোরেন্ হারাইয়া ফ্রান্স তথা ফরাসী জনসাধারণ

এক দারুণ হতাশা ও অপমানে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৯৯ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফরাসী প্রজাতান্ত্রিক সরকারকে দক্ষিণপন্থীদের এবং যাজকদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স এত বেশি ব্যস্ত ছিল যে তখন আলসেস্-লোরেন পুনরুদ্ধারের প্রশ্ন ফরাসী জাতির মনে মোটেই উদয় হয় নাই।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডেলাক্যাসি (১৮৯৮-১৯০৫)

থিওফাইল্ ডেলাক্যাসি ছিলেন ১৮৯৮ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তিনি রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সকে মিত্রতাবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং ইতালি ও ব্রিটেনের সহিতও মিত্রতাচুক্তি স্বাক্ষর করিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের শক্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মরক্কোর উপর ফরাসী আধিপত্য স্থাপন করিতে গিয়া তিনি ফরাসী-জার্মান সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সূত্রে পরিস্থিতি এমন সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছিল যে, জার্মানি ডেলাক্যাসির পদচ্যুতি, মরক্কোর উপর জার্মানির আধিপত্য স্বীকার দাবি করিল। এই দাবি স্বীকৃত না হইলে জার্মানি ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে ইহাও স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়া হইল। ডেলাকাসি ব্যক্তিগতভাবে জার্মানির দাবি স্বীকার না করিয়া প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বামপন্থী সহকর্মিবৃন্দ তাঁহাকে পদত্যাগে বাধ্য করিয়া জার্মানির সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিলেন।

মরক্কো সংকট—ডেলা-ক্যাসির পদচ্যুতি

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মরক্কো সংকটের পর হইতে ফরাসী সরকারের অভ্যন্তরে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিল। সমাজতান্ত্রিক ও উগ্রবামপন্থীদের নিকট জার্মানির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ইওরোপে শান্তিরক্ষা করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইল। এই ফরাসী-জার্মান মৈত্রী কার্যকরী করিতে পারিলে ফ্রান্সের সামরিক ব্যয়ভারও লাঘব হইবে—তাহাও যুক্তি হিসাবে দেখান হইল। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদী ও রক্ষণশীল দলভুক্ত অনেকের মতে জার্মানির আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি ফ্রান্সের নিরাপত্তার বিরোধী ছিল। সেজন্য ফ্রান্সের নিরাপত্তা রক্ষার উপায় হিসাবে ফ্রান্সকে সামরিক প্রস্তুতির পথ গ্রহণ করিতে হইবে। ক্লিমেনশো ও তাঁহার অনুগত বামপন্থিগণও এই মতেরই সমর্থক ছিলেন। এইভাবে ফরাসী সরকার

ফরাসী-জার্মান মৈত্রী-নীতি বনাম সামরিক প্রস্তুতি নীতি

যখন পরস্পর বিরোধী নীতির কোন্‌টি অনুসরণ করিবেন স্থির করিতে পারিতে-ছিলেন না, সেই সময়ে (১৯১১) মরক্কো লইয়া পুনরায় ফরাসী-জার্মান সম্পর্কে তিক্ততা দেখা দিল। ঐ বৎসর ফ্রান্স মরক্কো দখল করিবার উদ্দেশ্যে মরক্কোর আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া ফরাসী সেনাবাহিনী প্রেরণ করিল। কিন্তু জার্মানি মরক্কো হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণের জন্য জানাইলে ফ্রান্স তাহাতে অস্বীকৃত হয়। এমতাবস্থায় আফ্রিকায় জার্মান স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে জার্মানি মরক্কো প্রদেশের আগাদির (Agadir) নামক বন্দরে একটি রণপোত প্রেরণ করে। ফ্রান্সকে মরক্কো অধিকারে বাধা দান করাই ছিল আগাদির বন্দরে জার্মান সৈন্য প্রেরণের উদ্দেশ্য। পরিস্থিতি যখন এরূপ জটিলতা ধারণ করিয়াছে তখন ব্রিটেন ফ্রান্সের পক্ষ অবলম্বন করিলে জার্মানি মরক্কো ব্যাপার লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইল না। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত জার্মানি ফরাসী প্রধান এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী কেইলো (Caillaux)-কে আপোষ-মীমাংসায় রাজী হইতে বাধ্য করিল। এই আপোষ-মীমাংসার শর্তানুসারে মরক্কোর উপর আধিপত্য ফ্রান্সকে দেওয়া হইল, কিন্তু বিনিময়ে ফ্রান্সকে ফরাসী কঙ্গো—অর্থাৎ ইকুইটোরিয়াল আফ্রিকার এক বিরাট অংশ জার্মানিকে ছাড়িয়া দিতে হইল। পরবৎসর অবশ্য ফ্রান্স মরক্কো সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া লইল। আগাদীর সংকট বা মরক্কোর দ্বিতীয় সংকট যেমন জার্মানির কূটনৈতিক পরাজয়ের সামিল হইল তেমনি উহা ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী দৃঢ়তর করিল।

আগাদির সংকট (Agadir Crisis) বা মরক্কোর দ্বিতীয় সংকট

কেইলো-র জার্মান-তোষণ-নীতি অর্থাৎ জার্মানির সহিত আপোষ-মীমাংসা করিতে গিয়া ফরাসী কঙ্গো জার্মানিকে দান করিবার ফলে সমগ্র ফ্রান্সে কেইলো-র বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইলে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। জার্মানির বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতি নীতিও সঙ্গে সঙ্গে অনুসৃত হইতে লাগিল। জার্মানির সহিত মিত্রতা নীতির সমর্থকগণও সামরিক প্রস্তুতির-নীতির সমর্থকে পরিণত হইল। এইভাবে ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ও আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করিল।

কেইলো-র তোষণ-নীতি ও তাঁহার পতন

ফ্রান্স কর্তৃক সামরিক প্রস্তুতি-নীতি গ্রহণ

তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি (Colonial Expansion under the Third Republic)ঃ ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি

(১৭১৩) ও সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর প্যারিসের সন্ধির (১৭৬৩) ফলে ফ্রান্স ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল উহার অধিকাংশই ইংলণ্ডের নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগে ফরাসী উপনিবেশ ওয়েস্ট্ ইণ্ডিজ, আফ্রিকায় সেনিগাল, ভারতবর্ষ ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের নিকটে কয়েকটি স্থানে বিদ্যমান ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের উপনিবেশ হস্তচ্যুত

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী ঔপনিবেশিক বিস্তার নীতি

কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ফ্রান্স ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের দিকে মনোনিবেশ করে। প্রথমেই ফ্রান্স আফ্রিকা-উপকূলে আল্‌জেরিয়া অধিকার করে। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফ্রান্স কোচিন-চীন, কম্বোজ বা ক্যাম্বোডিয়া অধিকার করে। ইহার কিছুকাল পর আফ্রিকায় টিউনিস্, গিনি, ড্যাহোমে, আইভরি কোস্ট, নাইজেরিয়া অঞ্চল, কঙ্গোর উত্তরাংশ প্রভৃতি অধিকার করে। এশিয়ায় আনাম, টন্‌কিং, মাদাগাস্কার ফরাসী অধিকৃত হয়। ইহা ভিন্ন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসীদেশ মরক্কো অধিকার করিতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবেশ

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রেট ব্রিটেন (১৮৯০-১৯১৪)।

(Great Britain, 1890-1914)

ব্রিটেনে সমাজতন্ত্রের প্রসার (Spread of Socialism in England) : উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসরে ইংলণ্ডে সমাজতান্ত্রিক প্রভাব অত্যধিক মাত্রায় বিস্তারলাভ করে।

'সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন' (Social Democratic Federation)

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মার্কস্‌বাদী সমাজতন্ত্র ইংরেজদের মধ্যে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে 'সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন' (Social Democratic Federation) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে। উইলিয়াম মরিস, হেন্‌রী হিণ্ড্‌ম্যান-এর ন্যায় মনীষীরাও এই দলভুক্ত ছিলেন। দুই বৎসর পর

'ফ্যাবিয়ান সোসাইটি' (Fabian Society)

'ফ্যাবিয়ান সোসাইটি' (Fabian Society) নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান মার্কস্‌-এর মতবাদের উপর বিশেষ নির্ভর না করিয়া সরকার, ভূসম্পত্তি ও শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয়করণ নীতি প্রয়োগের জন্য সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচারকার্য শুরু করে। জর্জ বার্ণার্ড শো, সিড্‌নী ওয়েব্‌ প্রভৃতি এই দলভুক্ত ছিলেন।

'ইণ্ডিপেণ্ডেট্‌ লেবার পার্টি' (Independent Labour Party)

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কেয়ার হার্ডি নামে জনৈক স্কটল্যাণ্ডবাসী 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্‌ লেবার পার্টি' (Independent Labour Party) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে 'উদারপন্থী' (Liberal) ও 'রক্ষণশীল' (Conservative) দলের বিরোধিতা করেন।

ট্রেড্‌ ইউনিয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি

এদিকে ব্রিটেনের ট্রেড্‌ ইউনিয়নের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সকল ট্রেড্‌ ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ও আয়বৃদ্ধির ফলে ট্রেড্‌ ইউনিয়নগুলির ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, এগুলি ব্রিটেনের রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইয়া উঠে। এমন সময় (১৯০১) ব্রিটেনের সর্বোচ্চ বিচারালয়

প্রিভিকাউন্সিল অর্থাৎ হাউস-অব্ লর্ডস্ ট্রেড্ ইউনিয়নের ধর্মঘট সম্পর্কে এক বিচারে রায় দিলেন যে, ট্রেড্ ইউনিয়ন ধর্মঘট করিলে শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি ক্ষতি-গ্রস্ত হয় তাহা হইলে সেই ক্ষতিপূরণ ট্রেড্ ইউনিয়ন আইনত দিতে বাধ্য ইহার ফলে ট্রেড ইউনিয়নের ধর্মঘট করিবার ক্ষমতা স্বভাবতই নাকচ হইয়া গেল। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের টেড্ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ ফ্যাবিয়ান সোসাইটি, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি, সোশিয়্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন—এই সব কয়টি প্রতিষ্ঠানের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া 'ব্রিটেনের লেবার পার্টি' (Labour Party) গঠন করিল। ট্রেড্ ইউনিয়ন ও সমাজতন্ত্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া লেবার পার্টি গড়িয়া উঠিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে মোট ২৯ জন শ্রমিক লেবার পার্টির মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হইল। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ইতিহাসে ইহা এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ যুগান্তকারী ঘটনা, ইহা বলা বাহুল্য।

ব্রিটেনের লেবার পার্টির উৎপত্তি

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির সাফল্য

আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির এরূপ পরিবর্তনে ব্রিটেনের উদারনৈতিক দল (Liberal Party) সামাজিক ও ভূমি-সংক্রান্ত সংস্কার কার্যকরী করিতে উৎসাহী হইয়া উঠিল। রক্ষণশীল দল ব্রিটিশ জনসাধারণের সমর্থন স্বভাবতই হারাইল। ১৯০৫ হইতে ১৯১৫ পর্যন্ত উদারনৈতিক দল তাহাদের প্রগতিশীল নীতি অনুসরণের ফলে ব্রিটিশ জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিল। ট্রেড্ ইউনিয়নের ধর্মঘট স্বীকার করিয়া Trade Disputes Act নামে এক আইন পাস করা হইল (১৯০৬)। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেড্ ইউনিয়নের সঞ্চিত অর্থ রাজনৈতিক নির্বাচনের কাজে ব্যয়িত হইতে পারে বলিয়া স্বীকৃত হইল। ট্রেড্ ইউনিয়নের সদস্যগণ যাহাতে পার্লামেণ্টের সভ্য হইতে পারে সেজন্য পার্লামেণ্টের সভ্যদের ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। Workingmen's Compensation Act, Trade Boards Act, Labour Exchange Act, Minimum Wage Act প্রভৃতি বিভিন্ন আইন পাস করিয়া উদারনৈতিক দল শ্রমিক সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন করিল এবং লেবার পার্টির পূর্ণ সমর্থন লাভ করিয়া দীর্ঘ-কাল ক্ষমতায় আসীন রহিল। কিন্তু তথাপি উদারনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সমালোচনার অভাব হইল না। লেবার পার্টি হইতে আরও শ্রমিক কল্যাণ

উদারনৈতিক সরকারের শ্রমিক কল্যাণ ও ভূসম্পত্তি সংস্কার আইন প্রবর্তন

সমাজকল্যাণমূলক আইন

আইন দাবি করা হইল, উদারনৈতিক দলের অনেকে সরকারের অত্যধিক প্রগতিশীলতার বিরোধিতা করিলেন।

যাহা হউক ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই যে সকল সমাজকল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল এবং সেই কারণে, যে অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন ছিল তাহা মিটাইবার উদ্দেশ্যে এবং সামরিক ও নৌবিভাগের প্রসারের জন্য বর্ধিত ব্যয় সংকুলানের জন্য লয়েড্ জর্জ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিত্তশালী ব্যক্তিদের উপর অধিক মাত্রায় করভার স্থাপন করিলেন। আয়কর, অধিক আয়-জনিত সুপার ট্যাক্স, উত্তরাধিকার কর, অনুপার্জিত সম্পত্তির উপর কর, মোটর গাড়ীর উপর কর—প্রভৃতি নানাবিধ কর স্থাপন করিয়া বাজেট পাস করিলেন। হাউস অব্ লর্ডস্ উহা প্রত্যাখ্যান করিলে লয়েড্ জর্জ পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নির্বাচনে জয়ী হইয়া প্রমাণ করিলেন যে, তাঁহার পশ্চাতে ব্রিটেনের জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।

লয়েড্ জর্জ বাজেট : হাউস অব্ কমন্স ও হাউস অব্ লর্ডস্-এর বিরোধিতা

ইহার পর লয়েড্ জর্জ পার্লামেণ্ট সংস্কার আইন (১৯১০) পাস করিয়া ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডস্-এর ক্ষমতা খর্ব করিলেন। এই আইনের বলে হাউস অব্ কমন্স কর্তৃক গৃহীত অর্থবিল বা বাজেট এক মাসের মধ্যে অর্থাৎ ৩১শে মার্চের মধ্যে হাউস অব্ লর্ডস্ অনুমোদন না করিতে সরাসরি রাজা বা রাণীর স্বাক্ষর লাভ করিয়া আইনত বলবৎ হইবে। অপরাপর আইনের ক্ষেত্রেও লর্ড সভার ক্ষমতা হ্রাস করা হইল। কোন আইন লর্ড সভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার পর ক্রমান্বয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনে যদি উহা কমন্স সভা কর্তৃক গৃহীত হয় তবে হাউস অব্ লর্ডস্-এর উহা অনুমোদন করিতেই হইবে। ফলে অর্থ বিল ভিন্ন অপরাপর বিল হাউস অব্ লর্ডস্ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারিবে মাত্র, তাহা নষ্ট করিতে পারিবে না।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট সংস্কার আইন

হাউস অব লর্ডস্-এর ক্ষমতা হ্রাস

উদারনৈতিক দল এখন লেবার পার্টির সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া কোন এক ব্যক্তির একাধিক ভোট থাকিবে না এই আইন উত্থাপন করিলেন। বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের দেশের যে যে অংশে সম্পত্তি থাকিত সেই সেই স্থানে ভোট দানের অধিকারও তাহাদের দেওয়া হইত। এইরূপ একাধিক ভোটদানের নীতি এখন পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে এক আইন প্রস্তুত করা হইল। ওয়েলস্-এ এ্যাংলিকান চার্চ উঠাইবার জন্য

আইনের প্রস্তাব এবং আয়র্লণ্ডে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের জন্য নূতন Home Rule বিল নামে আরও দুইটি বিলও প্রস্তুত হইল। এগুলি কমন্স সভায় দুইবার গৃহীত হইবার পর দুইবারই লর্ড সভা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইল। আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্তশাসন-সংক্রান্ত বিল সাধারণত আয়র্লণ্ডবাসীর নিকট গ্রহণযোগ্য হইলেও আলস্টার নামক স্থানে এই বিলের তীব্র বিরোধিতা শুরু হইল। জনসাধারণ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অবিচ্ছিন্ন রাখিবার পক্ষপাতী। আয়র্লণ্ডে স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্থাপিত হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দুর্বল ও বিভক্ত হইয়া পড়িবে ইহা তাহাদের মনঃপূত ছিল না। এই সূত্রে আলস্টারে এক বিদ্রোহের উপক্রম হইল। উদারনৈতিক সরকার এই ব্যাপার লইয়া এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। কমন্স সভায় পুনরায় উপরি-উক্ত তিনটি বিল পাস হইলেই লর্ড সভার সেগুলি রোধ করিবার আর কোন ক্ষমতা থাকিত না বটে, কিন্তু পরিস্থিতির আকস্মিক পরিবর্তনে ফলে উদারনৈতিক সরকার তাহা করিতে সাহসী হইলেন না। ঠিক এমন সময় (১৯১৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে উপরি-উক্ত তিনটি বিল লইয়া যে বিরোধিতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা চাপা পড়িয়া গেল।

উদারনৈতিক দল কর্তৃক তিনটি বিল উত্থাপন

আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্তশাসন-সংক্রান্ত বিলের বিরোধিতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতি (British Foreign Policy): ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ এবং বিশ শতাব্দীর সূচনাকালে ব্রিটেন পৃথিবীর যাবতীয় রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই বিচ্ছিন্ন নীতি Splendid Isolation নামে খ্যাত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসরে ইওরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল এবং আপাত শান্তির অন্তরালে যে সামরিক প্রস্তুতি ও প্রতিযোগিতা চলিতেছিল তাহার ফলে ব্রিটেন উহার বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এই কারণে ব্রিটেন এশিয়ার উদীয়মান শক্তি জাপানের সহিত এক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই Splendid Isolation পরিত্যাগ করিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সহিত ব্রিটেন এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। এইভাবে তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজের এবং নিজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য যে-টুকু সামরিক শক্তিবৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল তাহা ব্রিটেন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন

ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী (১৯০২)

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী (১৯০৪)

১৯০৫ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উদারনৈতিক সরকারের আমলে এডোয়ার্ড গ্রে ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী। এই সময়কার পররাষ্ট্রনীতি রক্ষণশীল পররাষ্ট্রনীতি অপেক্ষা কোন দিক্ দিয়াই ভিন্ন ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, নৌবল ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি নীতির দিক্ দিয়া তুলনা করিলে ডিজ্‌রেইলি, সল্‌স্‌বেরির পররাষ্ট্রনীতি এবং এডোয়ার্ড গ্রে তথা উদারনৈতিক মন্ত্রিসভার নীতির মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এডোয়ার্ড গ্রে ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া চলিলেন, তদুপরি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সহিত এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এদিকে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে পূর্বেই এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ফলে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইবার ফলে এই তিন দেশ 'ট্রিপ্‌ল্ আঁতাঁত' (Triple Entente) নামে এক মিত্রতাচুক্তিতে আবদ্ধ হইল। জার্মানি কর্তৃক সংগঠিত 'ট্রিপ্‌ল-এলায়েন্স' (Triple Alliance)-এর ইহা ছিল প্রত্যুত্তর। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রিচার্ড হেলডেন-এর সামরিক সংস্কার ও নৌ ও সেনাবাহিনীর প্রসার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এডোয়ার্ড গ্রে'র কার্যকলাপ সহজতর করিয়াছিল। জার্মানি কর্তৃক নৌশক্তি বৃদ্ধির পাল্টা জবাব হিসাবে ব্রিটেন নিজ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে নৌবল বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইল। ফলে ইঙ্গ-জার্মান নৌবল বৃদ্ধির এক প্রতিযোগিতা শুরু হইল। এইভাবে প্রস্তুত হইয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল।

উদারনৈতিক দলের পররাষ্ট্রনীতি রক্ষণশীল দলের পররাষ্ট্রনীতির অনুসৃতি মাত্র

ইঙ্গ-রুশ মৈত্রী (১৯০৭)

ট্রিপ্‌ল্ আঁতাঁত

ব্রিটিশ নৌবল বৃদ্ধি

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য (১৮৭১-১৯১৪)

(Characteristics of the Age preceding World War I)

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগকে (১৮৭১-১৯১৪) "শান্তির অন্তরালে সামরিক প্রস্তুতির যুগ" (Age of Armed Peace) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বিবেচনা করিলে এই দীর্ঘকালের মধ্যে পশ্চিম-ইওরোপে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। পূর্ব-ইওরোপে বার্লিনের চুক্তির পর হইতে প্রথম বলকান যুদ্ধের (১৯১২) পূর্ব পর্যন্ত কোন ব্যাপক যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপানী যুদ্ধে এক পক্ষে রাশিয়া থাকিলেও এই যুদ্ধকে ইওরোপীয় যুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হয় নাই। ১৮৭১-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘকাল ইওরোপের প্রস্তুতির যুগ ছিল। সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া এই যুগে এক অভূতপূর্ব প্রস্তুতি শুরু হইয়াছিল। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল: (১) শিল্পোন্নতি, (২) শ্রমিক আন্দোলন, (৩) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ।

শান্তির অন্তরালে সামরিক প্রস্তুতির যুগ

১৮৭১-১৯১৪ পর্যন্ত যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য

(১) শিল্পোন্নতি (Industrialism): বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ইওরোপীয় দেশগুলির উৎপাদন-প্রণালীর এক আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। পোল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশেও ক্রমে শিল্প-বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। প্রত্যেক দেশেই মানুষের শ্রমের পরিবর্তে বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হইতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাষ্পের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা কলকারখানা চালান আরম্ভ হইয়াছিল। কয়লার পরিবর্তে খনিজ তেলের ব্যবহারে যন্ত্রপাতি চালাইবার পদ্ধতি শুরু হইয়াছিল। টেলিগ্রামের পরিবর্তে বেতার, ঘোড়ার পরিবর্তে মোটরগাড়ী, বাইসাইকেল প্রভৃতির ব্যবহার শুরু হইয়াছিল। চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতিরও অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছিল।

বিজ্ঞানের উন্নতি

শিল্পক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রম-বিভাজন নীতি (Division of Labour) প্রভৃতির প্রয়োগে অল্প সময়ে বেশী এবং উন্নত ধরণের সামগ্রী প্রস্তুত হইতে লাগিল। বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটিরশিল্প স্বভাবতই টিকিতে পারিল না।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শিল্পোন্নতি

শিল্পোন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে পরিবহন-ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ অর্থনৈতিক দিক দিয়া একে অপরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। বাণিজ্য নিজ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিণত হইল।

পরিবহন-ব্যবস্থার উন্নতি : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রমে তাহারাও নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য মালিকপক্ষের সহিত যুঝিতে শুরু করিল। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে হইলে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা তাহারা উপলব্ধি করিল এবং সেজন্য আন্দোলন শুরু করিল। কারখানায় স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের সমপর্যায়ে কাজ করিয়া ক্রমে পুরুষদের সহিত সমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই সমতা লাভের জন্য স্ত্রীলোকদের আন্দোলন শুরু হইয়াছিল এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বেই স্ত্রীজাতিকে নানাপ্রকার বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শিক্ষা, চাকরি, সম্পত্তি-ভোগ প্রভৃতি নানা কিছু সুবিধা তাহারা লাভ করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের অল্পকালের মধ্যেই নারীজাতির আইনগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল।

স্ত্রীজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি

(২) শ্রমিক আন্দোলন (Working Class Movement) :

১৮৭১—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪৩ বৎসরের মধ্যে শ্রমিক সম্প্রদায়ের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। শিল্পোন্নতির ফলে ধনী, দরিদ্র বা মূলধনী ও শ্রমজীবী এই নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। মূলধনী সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। কিন্তু যে শ্রমিকদের কাজে খাটাইয়া

শিল্প-বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত মালিক এবং শ্রমিক শ্রেণী

তাহারা এই সকল সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিল তাহাদের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রমিকগণ মূলধন ও সংগঠনশক্তি ও উদ্যম-উৎসাহের অভাবহেতু মালিক শ্রেণীর নিকট সামান্য অর্থের বিনিময়ে কাজ করিত। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিয়া স্বভাবতই তাহাদের কিছু ছিল না। শিল্পোন্নতির ফলে শিল্প-কেন্দ্রিক শহর গড়িয়া উঠিল। ঐ সকল শহরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশযুক্ত ঘিঞ্জি বস্তি এলাকায় বসবাস করিবার ফলে শ্রমিক শ্রেণী স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র উভয়ই হারাইল। অধিক শ্রম, বেকারত্বের ভয় এবং আর্থিক অনটনের মধ্যে থাকিয়া ক্রমেই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য তাহারা আন্দোলন শুরু করিল। এই শ্রমিক আন্দোলনের তিনটি ভিন্ন পর্যায় ছিল : (ক) ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, (খ) শ্রমিক হিতৈষী আন্দোলন ও (গ) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন।

শ্রমিকদের আর্থিক, দৈহিক ও নৈতিক অবনতি

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য শ্রমিকদের আন্দোলন

(ক) ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন : মালিক শ্রেণী হইতে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে হইলে ব্যক্তিগত দাবি অপেক্ষা সমষ্টিগতভাবে দাবি উত্থাপন করা বহু বেশী কার্যকরী হইবে এই বিবেচনা করিয়া শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড্ ইউনিয়ন নামক শ্রমিক-সংঘ স্থাপন করিতে শুরু করিল। মালিক শ্রেণীর সহিত দ্বন্দ্বে নিজেদের স্বার্থরক্ষার একমাত্র স্বাভাবিক পন্থা হিসাবেই সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধ হইতে লাগিল। একই প্রকার কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সহজেই উপলব্ধ হইল। শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু মালিক শ্রেণীর শ্রমিক-সংঘ-বিরোধিতা এবং সংঘবদ্ধ শ্রমিকদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য ইংলণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্ব অবধি ট্রেড্ ইউনিয়ন বে-আইনী ছিল। কিন্তু ক্রমে ইংলণ্ড এবং অপরাপর দেশে ট্রেড্ ইউনিয়ন আইনতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে শ্রমিকদের ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠন করা আইনসম্মত বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই সকল সংঘের একমাত্র অস্ত্র হইল

শ্রমিকগণ কর্তৃক সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা উপলব্ধ

মালিক শ্রেণী ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা

ধর্মঘট। ধর্মঘট দ্বারা কলকারখানার কাজ অচল করিয়া মালিক শ্রেণী হইতে সুযোগ-সুবিধা এবং শ্রমিক হিতৈষী ব্যবস্থা আদায় করিয়া লওয়া, ধর্মঘটের সময়ে শ্রমিকদিগকে ট্রেড্ ইউনিয়ন তহবিল হইতে সাহায্য দান করা এবং শোষণ, ছাটাই বা অন্যায়ভাবে পদচ্যুতি হইতে শ্রমিকদের রক্ষা করা হইল ট্রেড্ ইউনিয়নের প্রধান উদ্দেশ্য।

ট্রেড্ ইউনিয়ন ক্রমে আইনত স্বীকৃত

(খ) শ্রমিক হিতৈষী আন্দোলন : শ্রমিকদের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন দেশের মালিক শ্রেণী, রাষ্ট্র, পৌর-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি যাহারা শ্রমিক কাজে খাটায় তাহারা স্বেচ্ছায় কতক কতক শ্রমিক হিতৈষী কায করিয়াছিল। বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক ফ্যাক্টরী আইন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, ইন্সিওরেন্স্ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ প্রভৃতির উন্নয়নমূলক আইন পাস করিয়া শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল। স্বৈরাচারে বিশ্বাসী জার্মানির চ্যান্সেলর বিস্মার্কও শ্রমিকদের উপকারার্থে কতকগুলি আইন পাস করিয়াছিলেন। প্রজাহিতৈষী আন্দোলন স্বপ্রণোদিত ছিল বলিয়া ইহা Humanitarianism নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার ফলে শ্রমিক আন্দোলন অধিকতর উৎসাহ লাভ করিয়াছিল।

রাষ্ট্র, মালিক শ্রেণী ও পৌর-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রমিক হিতৈষী ব্যবস্থা অবলম্বন

(গ) সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন : ট্রেড্ ইউনিয়ন, প্রজাহিতৈষী আন্দোলন প্রভৃতি শিল্প-বিপ্লব-প্রসূত ফ্যাক্টরী-প্রথার অপগুণ দূর করিতে সমর্থ হইল না। সেই কারণে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য সমাজতন্ত্র-বাদের উদ্ভব হইল। প্রধানতঃ তিনটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিল : প্রথমতঃ, মূলধনী ও মূলধন (Capitalists and Capitalism) উভয়ের বিলোপসাধন করিয়া অর্থবলের সাহায্যে শ্রমিকদের শোষণের সুযোগ বন্ধ করা; দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের উপাদান জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন প্রভৃতি রাষ্ট্রের হস্তে স্থাপন করিয়া মালিক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকের শ্রমের ফল হরণ করা নিবারণ; এবং তৃতীয়তঃ, সর্বপ্রকার শোষণ হইতে শ্রমিকদিগকে মুক্ত করা। (সমাজতন্ত্রবাদের বিশদ আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য)

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা

সমাজতন্ত্রের মূল নীতি

(৩) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ (Militant Nationalism): আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান কিংবা আন্তর্জাতিক সমবায় এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার দিক দিয়া বিচার করিলে ১৮৭১—১৯১৪ পর্যন্ত যুগকে আন্তর্জাতিকতার যুগ বলা যাইতে পারে। অর্থনৈতিকক্ষেত্রে এই আন্তর্জাতিকতা ছিল সর্বাধিক। সমাজতন্ত্রের প্রভাব বিস্তারের দিক দিয়াও সর্বত্র এইরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কৃষ্টিমূলক আদান-প্রদানের মাত্রাও ঐ সময়ে ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। রাজনীতিক্ষেত্রে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পরস্পর নির্ভরশীলতা এই যুগে পূর্বকাল অপেক্ষা অধিক ছিল, তাহার প্রমাণ পূর্বাঞ্চলের সমস্যা-সমাধানে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যুগ্ম চেষ্টা, মরক্কো সমস্যা এবং কঙ্গো স্বাধীন রাজ্যস্থাপন প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

১৮৭১—১৯১৪ পর্যন্ত আন্তর্জাতিকতার যুগ

কিন্তু এই আন্তর্জাতিকতার অন্তরালে জাতীয়তাবোধের উগ্রতা ক্রমেই এমনভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল যে, উহার স্বার্থপরতার আঘাতে ইওরোপীয় আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি ধসিয়া গিয়াছিল। বলকান জাতিগুলির জাতীয়তাবোধ, পোল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের জাতীয়তাবোধ ক্রমেই উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া সংগ্রামশীল রূপ ধারণ করিল। জাতীয়তাবোধের সর্বাধিক সংগ্রামশীলতার পরিচয় দিল জার্মানি। সামরিক শক্তিতে বিশ্বাসী জার্মানি বৈজ্ঞানিক এবং সামরিক উন্নতিকেই জাতীয় জীবনে চরম উন্নতি মনে করিয়া নিজেদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া ভাবিতে লাগিল এবং যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া জার্মানিকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মর্যাদাশালী দেশে পরিণত করিতে চাহিল।

বিভিন্ন দেশে উগ্র জাতীয়তাবোধ

সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী মনোবৃত্তি ভিন্ন প্রত্যেক দেশেই সামরিক প্রস্তুতিও চলিতেছিল। জার্মানির কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পর হইতে ফ্রান্সও সামরিক শক্তির পুনর্গঠনে মনোযোগী হইয়াছিল। জার্মানি কর্তৃক আলসেস্-লোরেন অধিকার ফ্রান্স কোনক্রমে বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। অপরদিকে জার্মানি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রে জার্মান সৈন্যবাহিনীকে গড়িয়া তুলিতেছিল। এইভাবে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে সামরিক প্রস্তুতির এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু

ফ্রান্স ও জার্মানির সামরিক প্রতিযোগিতা

ইংলণ্ড ও জার্মানির নৌবলের প্রতিযোগিতা

হইয়াছিল। এই দুই দেশের সামরিক প্রতিযোগিতার প্রভাবে ক্রমে অপরাপর দেশেও প্রতিযোগিতা শুরু হইল।

জার্মানির নৌবল বৃদ্ধির ফলে ইংলণ্ডের নৌবলের প্রাধান্য ব্যাহত হইতে চলিয়াছে ভাবিয়া ইংলণ্ড নৌবল-বৃদ্ধি শুরু করিল। সুতরাং আন্তর্জাতিক শান্তি ভঙ্গ না হইলেও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যুদ্ধের যাবতীয় প্রস্তুতির প্রতিযোগিতা চালাইল। সমগ্র ইওরোপ এক বিশাল 'বারুদখানায়' পরিণত হইল।

বিস্‌মার্ক জার্মানির নিরাপত্তার জন্য যে সামরিক চুক্তি-নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ইওরোপের অপরাপর শক্তিগুলিও অনুসরণ করিতে লাগিল। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক অস্ট্রিয়া, জার্মানি ও ইতালির মধ্যে ট্রিপ্‌ল্‌ এলায়েন্স (Triple Alliance) স্থাপন করেন। তাঁহার কার্যকালে অবশ্য তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গকে জার্মানির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতে দেন নাই, কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের পর ক্রমেই ট্রিপ্‌ল্‌ এলায়েন্স-এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের ট্রিপ্‌ল্‌ আঁতাঁত (Triple Entente) স্বাক্ষরিত হয়। এইভাবে ইওরোপ দুই বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

'ট্রিপ্‌ল্‌ এলায়েন্স' ও 'ট্রিপ্‌ল্‌ আঁতাঁত'

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮)

(World War I)

যুদ্ধের পথে (Towards War) : ১৮৭১ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ইওরোপীয় দেশগুলি কিভাবে ক্রমেই এক সর্বগ্রাসী এবং আত্মঘাতী যুদ্ধের সম্মুখীন হইতেছিল সেই আলোচনা আমরা পূর্বে করিয়াছি। জার্মানি কর্তৃক 'ট্রিপল্ এলায়েন্স' (Triple Alliance) স্থাপন এবং উহার প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড কর্তৃক 'ট্রিপল্ আঁতাত' (Triple Entente) স্বাক্ষর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। ইওরোপীয় দেশগুলি যখন দুইটি পরস্পর-বিরোধী 'যুদ্ধ শিবিরে' পরিণত হইয়াছিল তখন যে-কোন আন্তর্জাতিক ঘটনা হইতেই যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা স্বভাবতই ছিল। 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের সুযোগ লইয়া অস্ট্রিয়া কর্তৃক বোস্নিয়া ও হার্জেগোভিনা গ্রাস, ট্রিপলি দখলের জন্য ইতালির যুদ্ধ ঘোষণা, বলকান সমস্যা ইত্যাদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে অত্যধিক জটিলতাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

ইওরোপের শক্তিবর্গ পরস্পর-বিরোধী দুইটি 'যুদ্ধ শিবিরে' পরিণত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ (Causes of the World War I) ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ভিয়েনা কংগ্রেস হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপীয় ইতিহাসের রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্যে নিহিত ছিল। ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান দান ছিল জাতীয়তাবাদ, আর এই জাতীয়তাবাদ-ই ছিল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ। ভিয়েনা সম্মেলন জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল সেই ভিত্তি ধ্বংস করিতেই উনবিংশ শতাব্দীর

ভিয়েনা কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয়তাবাদের উপেক্ষায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ নিহিত

অবশিষ্ট সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে শেষ পর্যন্ত ভিয়েনা চুক্তির ত্রুটিগুলির প্রায় অধিকাংশ দূর করা সম্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সকল ত্রুটি দূর করিতে গিয়া যে-সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহার মধ্য হইতে জাতীয়তাবাদ-বিরোধী নূতন কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল।

সেডানের যুদ্ধের পর জার্মানি ফ্রান্সকে আল্‌সেস্‌-লোরেন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। জার্মানির নিরাপত্তা এবং এই সকল স্থান জার্মান-অধ্যুষিত এই দুইটি যুক্তির উপর নির্ভর করিয়াই জার্মানি আলসেস্‌-লোরেন দখল করিয়াছিল বটে, কিন্তু এই দুই স্থানের অধিবাসিবৃন্দ বহুকাল ফরাসী শাসনাধীনে থাকিয়া নিজেদের ফরাসী জাতিভুক্ত বলিয়া-ই মনে করিত। স্বভাবতই ফ্রান্স এই দুইটি স্থান যাহাতে ভবিষ্যতে ফরাসী রাজ্যভুক্ত হয় সেই আশা ত্যাগ করিতে পারিল না। ফরাসী জাতির মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি ভিন্ন অর্থনৈতিক কারণেও ফ্রান্স আল্‌সেস্‌-লোরেন পুনরুদ্ধার করিতে আগ্রহান্বিত ছিল। লোরেন অঞ্চল ছিল লৌহখনিতে পরিপূর্ণ। জার্মানির শিল্পোন্নতি লোরেনের লৌহখনির জন্যই প্রধানতঃ সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং ফরাসী লৌহ-ইস্পাত শিল্পোৎপাদকগণ লোরেন অঞ্চল জার্মানির হস্তে চলিয়া যাওয়াটা কোনভাবেই ভুলিতে পারিল না।

আল্‌সেস্‌-লোরেন পুনরধিকারের জন্য ফ্রান্সের সঙ্কল্প: জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা বৃদ্ধি

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় ঐক্য সম্পন্ন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ট্রেন্‌টিনো (Trentino) এবং ট্রিয়েস্ট্‌ (Area around Trieste) তখনও ইতালি দখল করিতে পারে নাই। এই সকল অঞ্চলে ইতালীয় অধিবাসীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। সুতরাং ইতালি এই সকল স্থান দখল করিতে বদ্ধপরিকর ছিল।* এই সব স্থান দখল না করিলে ইতালীয় ঐক্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এজন্য প্রয়োজনবোধে অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতেও ইতালি প্রস্তুত ছিল।

ট্রিন্‌টিনো ও ট্রিয়েস্ট্‌ অঞ্চল দখলের জন্য ইতালীয়দের সঙ্কল্প: ইতালি ও অস্ট্রিয়ার মনোমালিন্য

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিন চুক্তি দ্বারা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগো-

* "The oft-heard cry *Italia Irredenta* (Unredeemed Italy), therefore, was one of war." The World since 1914, Langsam, p. 4.

ভিনা নামক দুইটি স্লাভ্‌ অধ্যুষিত বলকান প্রদেশের উপর আধিপত্য লাভ করে। কিছুকাল পরে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলে সার্বিয়া এই দুইটি স্থান নিজ রাজ্যের সহিত সংযুক্তির জন্য আন্দোলন চালাইতে থাকে। বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনাবাসীরাও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী হইতে স্বাধীন হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। সার্বিয়ার সহিত সংযুক্তি না চাহিলেও সার্বিয়ার সাহায্যে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর ছিল। অপর পক্ষে বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনার জাতীয় স্পৃহা উপেক্ষা করিয়া অস্ট্রিয়া স্বৈরাচারী শাসন চালাইতেছিল। এই সূত্রে অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়।

বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনার স্বপক্ষে সার্বিয়ার নেতৃত্ব, অস্ট্রিয়ার স্লাভ্‌ জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা : অস্ট্রিয়া-সার্বিয়ার মনোমালিন্য

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য জাতীয়তাবাদের অবমাননার চরম নিদর্শনস্বরূপ ছিল। পোল, চেক্‌ স্লোভাক্‌, রুথেনীয় ও রুমানিয়ান অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সাম্রাজ্য একমাত্র বৃদ্ধ সম্রাট যোসেফ্‌ ফ্রান্সিসের জনপ্রিয়তার জন্যই টিকিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য জাতীয়তাবাদের আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের সংগঠন জাতীয়তা বিরোধী

অপর দিকে তুর্কী সরকারের শাসন পরিচালনার অকর্মণ্যতা, জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের ইচ্ছা (Drang nach Osten, i. e. urge towards the East), রাশিয়ার স্লাভ্‌জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার নীতি (Pan-Slavism) এবং ম্যাসিডন অধিকার লইয়া গ্রীস, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতা বলকান অঞ্চলকে যুদ্ধের বহ্নিকুণ্ডে পরিণত করিল।

বলকান অঞ্চল যুদ্ধের বহ্নিকুণ্ডে পরিণত

জাতীয়তাবাদের উপেক্ষা অথবা জাতীয়তাবাদ দমনের মধ্যে যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহের বীজ নিহিত থাকে তেমনি উৎকট জাতীয়তাবোধও যুদ্ধের মনোবৃত্তি সৃষ্টির সহায়তা করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসরে এই উৎকট জাতীয়তা-বোধ জার্মানিতে চরমভাবে প্রকাশ পায়। জার্মান ঐতিহাসিক হেন্‌রিক্‌ ফন্‌ ট্রিট্‌স্কি (Heinrich von Treitschke) এবং হাউস্টন্‌ স্টুয়ার্ট চেম্বারলেন (Houston Stewart

উৎকট জাতীয়তাবোধ : পরস্পর বিদ্বেষের সৃষ্টি : মানসিক প্রস্তুতি

Chamberlain), জেনারেল ফ্রেডারিক ফন্ বার্ণহার্ডি (Freidrich von Bernhardi) প্রভৃতি জার্মান জাতীয়তাবোধের এক নূতন রূপ দান করেন। জার্মান পিতৃভূমি (*Vaterland*) সকল দেশের শ্রেষ্ঠ এবং জার্মান জাতি অপরাপর জাতি অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে এই ধারণা জার্মানদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কেবলমাত্র জার্মানিতেই এই ধরণের উৎকট জাতীয়তাবোধ প্রকাশ পাইয়াছিল এমন নহে, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশেও ঐ সময়ে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর জাতীয়তাবোধের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। জার্মানিতে ইহার মাত্রা একটু বেশি ছিল, এই মাত্র। ফলে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইল। পরস্পর কূটনৈতিক আদান-প্রদান কঠিন হইয়া পড়িল। প্রত্যেক দেশেই যুদ্ধের মানসিক প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলিল। সংবাদপত্রগুলি এই মনোভাব বৃদ্ধির সহায়তা করিতে লাগিল।

জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন হওয়ার সময় হইতে জার্মান নিরাপত্তার জন্য বিস্‌মার্ক যে সামরিক-চুক্তি স্থাপনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে অপরাপর জাতিও অনুসরণ করিতে থাকে। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্ক তাঁহার 'ট্রিপল্ এলায়েন্স্' (Triple Alliance) বা 'ত্রি-শক্তি চুক্তি' সম্পাদন করেন। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি, ইতালি ও অস্ট্রিয়া আত্মরক্ষার ব্যাপারে পরস্পর সামরিক সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের পর ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও রাশিয়া প্রত্যেকেই এককভাবে থাকিবার বিপদ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিস্‌মার্কের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া জার্মানির সহিত রি-ইন্‌সিওরেন্স্ চুক্তি ভঙ্গ করিল। এই সুযোগে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের অসুবিধা হইল না। কিন্তু ইংলণ্ড তখন সম্পূর্ণভাবে মিত্রহীন। জার্মানিকে ইংলণ্ড শত্রুদেশ বলিয়া বিবেচনা করিত। এমতাবস্থায় ইংলণ্ডের বিরোধী অপর দুইটি শক্তি—ফ্রান্স ও রাশিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলে ইংলণ্ডের ভীতি আরও বৃদ্ধি পাইল। ইংলণ্ডের নিরাপত্তার প্রশ্ন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জটিলতাপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে থিওফাইল ডেল্‌ক্যাসি (Theophile Delcasse) নামে একজন জার্মান-বিরোধী ফরাসী রাজনীতিক ফরাসী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। ইহার অল্পকাল পরে ইংলণ্ডের সিংহাসনে সপ্তম এডোয়ার্ড আরোহণ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের উপশম হইল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড

সামরিক চুক্তি :
'ট্রিপল্-এলায়েন্স্'

তাহাদের পরস্পর ঔপনিবেশিক বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়া আঁতাঁত কর্ডিয়েল (Entente Cordiale) নামে এক মৈত্রী স্থাপন করিল। ঐ বৎসর ইংলণ্ডও জাপানের সহিত এক মিত্রতাচুক্তিতে আবদ্ধ হইল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে অপর এক মিত্রতাচুক্তি স্থাপিত হইল। এইভাবে ক্রমে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে ট্রিপল্ আঁতাঁত (Triple Entente) নামে এক মৈত্রী স্থাপিত হয়। ফলে, সমগ্র ইওরোপ ট্রিপল্-এলায়েন্স্ ও ট্রিপল্ আঁতাঁত এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

ট্রিপল্ আঁতাঁত

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক বিস্তার লইয়া এক দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আফ্রিকা, এশিয়া প্রভৃতি মহাদেশে ইওরোপীয় বিস্তারনীতির ফলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে এক রেষারেষির সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্য-সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও রাশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি অর্থনৈতিক-সাম্রাজ্যবাদের পূর্বাভাস হিসাবে দেখা দেয়। এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশেরই শিল্পপতিগণ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেছিল। এই সকল জিনিসপত্রের রাশিকৃত উৎপাদন ক্রমে শিল্পপতিদের যুদ্ধ-সৃষ্টির জন্য উৎসুক করিয়া তুলিয়াছিল। কারণ, যুদ্ধ ভিন্ন এই সকল সরঞ্জাম বিক্রয় করিবার সুযোগ ছিল না।

ঔপনিবেশিক প্রতিযোগিতা

শিল্পপতিগণের যুদ্ধ-স্পৃহা

এইভাবে সমগ্র ইওরোপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; তাহাদের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার আন্তরিক চেষ্টা করিবার মত কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ছিল না। ফলে, দিন দিন আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর সন্দেহ এবং গোপন কূটনীতি (Secret diplomacy) দেখা দিল। আন্তর্জাতিক ব্যবহারে গোপনতা রক্ষা করিয়া চলিবার সাধারণ নীতি এবং প্রয়োজনীয়তা সীমা অতিক্রম করিল। একই মন্ত্রিসভার সকল সদস্য নিজ নিজ সরকার কি কি গোপন-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন তাহা জানিবার সুযোগ পাইতেন না। চতুর্দিকের সন্দেহের ধূম্রজালে ইওরোপ তখন দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছে। সামরিকক্ষেত্রে ইওরোপ তখন এক বারুদ-স্তূপে

গোপন কূটনীতি : পরস্পর সন্দেহ : ইওরোপ বারুদ-স্তূপে পরিণত

পরিণত হইয়াছে। স্বভাবতই, এইরূপ পরিস্থিতিতে যে-কোন ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতে এক সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সৃষ্টি হইবে তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না।*

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ উদ্ভূত হইল। সার্বিয়া অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর স্লাভ্-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি দখল করিতে বদ্ধপরিকর ছিল, ইহা ভিন্ন সার্বিয়া আড্রিয়াটিক সাগরতীরে একটি বন্দর দখল করিবার চেষ্টা করিলে বার বার অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও ইতালি বাধা দান করিয়াছিল। সার্বিয়া বাধ্য হইয়াই অস্ট্রিয়ার মধ্য দিয়া নিজ রপ্তানি দ্রব্য পাঠাইত। কিন্তু এই বিষয় লইয়া প্রায়ই সার্বিয়া ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সরকারের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হইত। এই সকল বিবাদের ফলে অস্ট্রিয়ার স্লাভ্-অধ্যুষিত অঞ্চলের স্বাধীনতালাভ এবং সার্বিয়ার সহিত সংযুক্তির স্পৃহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সরকারকে ভীতি প্রদর্শন করিবার জন্য এই সকল অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী নানাপ্রকার গোপন সমিতি গড়িয়া উঠে। 'ব্ল্যাক হ্যাণ্ড' (Black Hand)† নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল বোস্‌নিয়ার গবর্ণর ওস্কার পোলিওরেক (Oskar Poliorek)-কে হত্যা করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ফার্ডিনাণ্ড বোস্‌নিয়া ভ্রমণে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া তাহারা গবর্ণরের পরিবর্তে আর্কডিউক ফ্রান্সিস্‌কেই হত্যা করা স্থির করিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ও তাঁহার পত্নী বোস্‌নিয়ার রাজধানী সেরাজিভো (Serajevo) ভ্রমণে আসিলেন। ঐ দিনই সার্বিয়ায় আগত তিনজন সন্ত্রাসবাদী বোস্‌নিয়ান ছাত্রের একজন আর্কডিউক ফ্রান্সিসের মোটর-গাড়ীতে একটি বোমা নিক্ষেপ করে। এযাত্রা আর্কডিউক রক্ষা পাইলেন। বোমা-নিক্ষেপকারী ধরা পড়িল। আর্কডিউক তাঁহার গন্তব্যস্থলে পৌঁছিলেন। সেখানে সম্বর্ধনাপত্র পাঠ শেষ হইলে ফিরিবার পথে সন্ত্রাসবাদী ছাত্রদের অপর একজন আকস্মিকভাবে গুলি করিয়া আর্কডিউক ফ্রান্সিস্ ও তাঁহার স্ত্রী সোফির (Sophie) প্রাণনাশ করিল।

অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও সার্বিয়ার মধ্যে বিরোধ

সেরাজিভো'র হত্যাকাণ্ড

সেরাজিভো'র হত্যাকাণ্ড বারুদখানায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কাজ করিল। অস্ট্রিয়ার সরকার সার্বিয়াকে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিলেন। সার্বিয়ান-

* "Peace remains at the mercy of an accident."—*Wilhelm Von Schoen*, Ambassador to Paris. Vide, Langsam, p. 13.

† Also known as 'Union of Death'.

গণকে অস্ট্রিয়ার সরকার 'আততায়ীর জাতি' (race of assassins) বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অস্ট্রিয়ার অধীন বোস্‌নিয়ার অধিবাসী-ই দায়ী ছিল। জাতি হিসাবে অবশ্য বোস্‌নিয়ানগণ সার্বিয়ানদের ন্যায় স্লাভ্‌ ছিল। ইহা ভিন্ন এই হত্যাকাণ্ড অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বোস্‌নিয়ার রাজধানী সেরাজিভোতে সংঘটিত হইয়াছিল।

সার্বিয়ার নিকট অস্ট্রিয়ার চরমপত্র :

তথাপি অস্ট্রিয়ার সরকার জার্মানির সাহায্যের গোপন প্রতিশ্রুতি পাইয়া ২৩শে জুলাই (১৯১৪) সার্বিয়ার সরকারের নিকট কতকগুলি কঠোর শর্তসম্বলিত এক চরমপত্র প্রেরণ করিলেন। এই পত্রে (Austrian note) সার্বিয়া সরকারের (ক) অস্ট্রিয়া-বিরোধী প্রচারকার্যের তীব্র প্রতিবাদ করা হইল। (খ) সার্বিয়া সরকারকে সেরাজিভো'র হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়া ঘোষণা প্রকাশ করিতে বলা হইল। (গ) ইহা ভিন্ন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লিপ্ত আছেন এইরূপ সরকারী কর্মচারী ও স্কুল-শিক্ষকগণের পদচ্যুতি দাবি করা হইল। (ঘ) সার্বিয়ার দুইজন পদস্থ কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করিতে বলা হইল। (ঙ) আর্কডিউকের হত্যার তদন্ত ব্যাপারে অস্ট্রিয়ার সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য গ্রহণ করিতে এবং অস্ট্রিয়া-বিরোধী প্রচারকার্য বন্ধ করিতে সার্বিয়ার সরকারকে জানান হইল। (চ) মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই চরমপত্রের উত্তর দাবি করা হইল।

চরমপত্রের শর্তাদি

২৫শে জুলাই (১৯১৪) সার্বিয়া সরকার এই চরমপত্রের উত্তর প্রেরণ করিলেন। ইহাতে অস্ট্রিয়ার চরমপত্রে উল্লিখিত দাবিগুলির অধিকাংশই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু অপর কয়েকটি শর্ত যাহা মানিয়া লইলে সার্বিয়ার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হইত সেগুলির মীমাংসার জন্য সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার নিকট সময় চাহিল এবং আন্তর্জাতিক কোন বৈঠকে সেগুলির মীমাংসা হউক এই দাবি করিল। সার্বিয়ার উত্তর অস্ট্রিয়ার মনঃপূত হইল না। ২৬শে জুলাই (১৯১৪) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। দুই দিন পর (২৮শে জুলাই, ১৯১৪) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

সার্বিয়ার উত্তর : অস্ট্রিয়ার অসন্তুষ্টি

অস্ট্রিয়া কর্তৃক সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (২৮শে জুলাই, ১৯১৪)

এই যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপে এক দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বলকান অঞ্চল অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধীন হইলে রাশিয়ার স্লাভ্‌ ঐক্যের আদর্শ

নাশ হইবে, ইহা ভিন্ন রাশিয়ার বলকান-প্রাধান্যের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না বিবেচনা করিয়া রাশিয়া ঘোষণা করিল যে, সার্বিয়ার ভাগ্য-বিপর্যয়ে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে না।* অস্ট্রিয়ার সৈন্য সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে রাশিয়াও সৈন্যসমাবেশে পশ্চাদ্‌পদ থাকিবে না এই কথা রাশিয়ার জার স্পষ্টভাষায় অস্ট্রিয়ার সরকারকে জানাইয়া দিলেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন এইভাবে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া চলিয়াছে তখন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যর্ এডওয়ার্ড গ্রে এই জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ২৯শে জুলাই (১৯১৪) অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার রাজধানী বেল্‌গ্রেড-এর উপর কামান দাগিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধ দাবাগ্নির ন্যায় সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

ইওরোপে প্রতিক্রিয়া

এডওয়ার্ড গ্রে কর্তৃক শান্তিরক্ষার চেষ্টা: বেল্‌গ্রেড আক্রমণ ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু (২৯শে জুলাই, ১৯১৪)

সার্বিয়া আক্রান্ত হইলে রাশিয়া সৈন্যসমাবেশের আদেশ দিল। জার্মানি রুশ সৈন্যসমাবেশকে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার সামিল মনে করিয়া রাশিয়াকে এক চরমপত্রে (ultimatum) সৈন্যসমাবেশ বন্ধ করিতে অনুরোধ জানাইল। রুশ-জার্মান যুদ্ধ বাধিলে ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকিবে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর জার্মান সরকার ফ্রান্সের নিকট অপর একটি চরমপত্র দ্বারা জানিতে চাহিলেন। রাশিয়া জার্মানির চরমপত্রের কোন জবাব না দেওয়াতে ১লা আগস্ট (১৯১৪) জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ফ্রান্স জার্মানির চরমপত্রের উত্তরে জানাইল যে, রুশ-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্স নিজ স্বার্থ বিবেচনা করিয়া যাহা কর্তব্য তাহাই করিবে। রাশিয়ার সহিত মৈত্রী-চুক্তির শর্তানুযায়ী ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে ইহা নিশ্চিত মনে করিয়া জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করিল (৩রা আগস্ট, ১৯১৪)। এদিকে ইতালি নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিল। ট্রিপল্-এলায়েন্সের অপর দুইটি শক্তি—জার্মানি ও অস্ট্রিয়া আক্রমণাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে এই যুক্তিতে ইতালি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হইল। কারণ, ট্রিপল্-এলায়েন্স ছিল আত্মরক্ষামূলক চুক্তি (Defensive Alliance)।

রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা

জার্মানির যুদ্ধ ঘোষণা

ইতালির নিরপেক্ষতা

* "In no circumstance will Russia remain indifferent to Serbia's fate." Tsar's telegram to Serbia. Vide, Ketelbey, p. 393.

এদিকে জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণের জন্য বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া এক সেনা-বাহিনী প্রেরণ করিল। অথচ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের এক আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা বেলজিয়ামের আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষতা স্বীকৃত হইয়াছিল। জার্মানি ও ফ্রান্স ছিল এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী। ফ্রান্স বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা মানিয়া চলিতে রাজী হইলেও জার্মানি তাহা মানিল না। বেলজিয়ামের নিরাপত্তা বজায় রাখা ছিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্রের অন্যতম। সুতরাং বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা উপেক্ষা করিয়া জার্মানির সৈন্য উহার সীমা লঙ্ঘন করিলে বেলজিয়াম ইংলণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। গ্রেট ব্রিটেন সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (৪ঠা আগস্ট, ১৯১৪)।* এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবর্ত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশ মাত্রেই এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যোগদান করিল। ইতালি, জাপান, চীন ও আমেরিকা মিত্রপক্ষে (The Allies) যোগদান করিল। রুশ-তুর্কী বিরোধ বহুকাল হইতেই চলিতেছিল। স্বভাবতই তুরস্ক রাশিয়ার শত্রুপক্ষ জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল।

জার্মানি কর্তৃক বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য

ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণা

যুদ্ধের প্রকৃতি (Character of the War) : (১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইহার পূর্বে অপর কোন যুদ্ধই এত ব্যাপকতা লাভ করে নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ (Total War)। ইহার পূর্বে পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হইয়াছিল সেগুলির কোনটাতেই পৃথিবীর এতগুলি দেশ অংশ গ্রহণ করে নাই। (২) ইহা ভিন্ন এই যুদ্ধে যে-পরিমাণ বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র উভয় পক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা পূর্বে আর কখনও

সর্বাত্মক যুদ্ধ

* "If I am asked what we are fighting for, I can reply in two sentences. In the first place, we are fighting to fulfil a solemn international obligation, Secondly, we are fighting to vindicate the principle that small nationalities are not to be crushed, in defiance of international good faith, by the arbitrary will of a strong and overmastering power."—*Mr. Asquith* in his speech in the House of Commons, August, 6, 1914. "Why is our honour involved in this war? Because...we are bound in an honourable obligation to defend the independence, the liberty and the integrity of a small neighbour that has lived peaceably, but she could not have compelled us, because she was weak."—*Lloyd George* in a speech in Queen's Hall, London. Sept. 19, 1914.

ইওরোপ
(প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে)
জার্মানি (১৯১৪)
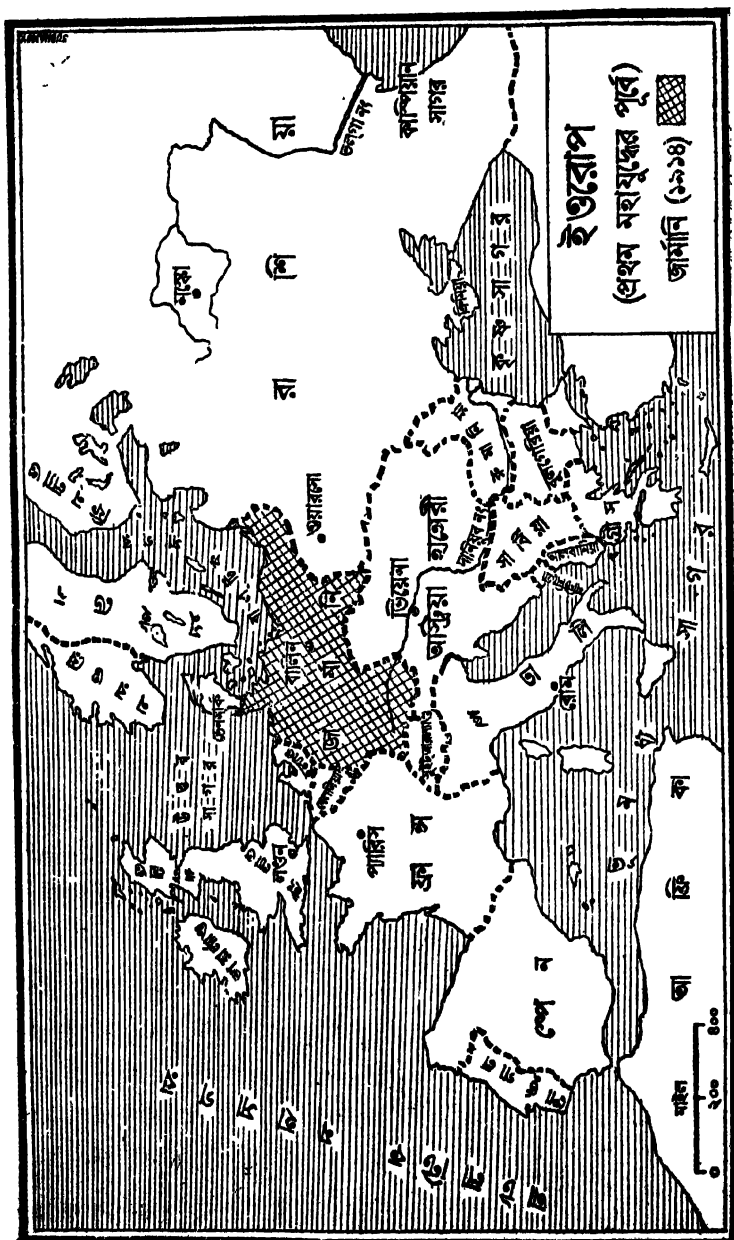
হয় নাই। বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইয়া যুদ্ধজয়ের এইরূপ চেষ্টা পূর্বে কখনও করা হয় নাই। ডুবোজাহাজ, ট্যাঙ্ক, বড় কামান, হাউইট্‌জার প্রভৃতির ব্যবহার, মাস্টার্ড গ্যাস, তরল আগুন (Liquid fire), বিষাক্ত গ্যাস, রোগের জীবাণুর সাহায্যে শত্রুপক্ষকে পরাভূত করিবার অভিনব চেষ্টা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সর্বপ্রথম করা হইয়াছিল। (৩) জল, স্থল ও আকাশে এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধে বিমান ও ডুবোজাহাজের ব্যবহার সংগ্রামশীল জগতের এক অভিনব অভিজ্ঞতা। (৪) জার্মানির জাতীয়তাবোধ এবং সর্বগ্রাসী সামরিক প্রাধান্য নীতি ইওরোপে যে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। জার্মানির প্রাধান্যে ইওরোপের শক্তি-সাম্য বিনষ্ট হইতে চলিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এই শক্তি-সাম্য পুনঃস্থাপনেরই চেষ্টা, সন্দেহ নাই। (৫) এই যুদ্ধে যে সকল মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল সেগুলির মারণক্ষমতা যেমন ছিল অভূতপূর্ব তেমনি ছিল বীভৎসতাপূর্ণ। সামরিক বা বেসামরিক লোক বা বস্তুর কোন পার্থক্য রাখা হইত না। গণতান্ত্রিক যুগের গণ-তান্ত্রিক যুদ্ধ মানুষের যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্ব-ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধজয়ের জন্য শিল্প, রাজস্ব, প্রচারকার্য সব কিছুরই এইরূপ নিয়োগ ইতিপূর্বে কখনও করা হয় নাই।

বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার

বিমান ও ডুবোজাহাজ

শক্তি-সাম্য পুনঃ-স্থাপনের সংকল্প

সামরিক বা বেসামরিক ব্যক্তি বা বস্তুর প্রভেদ লুপ্ত

যুদ্ধের ঘটনাবলী (Events of the War)ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলীকে বৎসর হিসাবে ভাগ করিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত হইবে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন যুদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল তখন যুদ্ধে লিপ্ত শক্তিগুলির মধ্যে জার্মানি ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তি-শালী এবং যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। স্বভাবতই জার্মান সেনাবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করিবার শক্তি মিত্রপক্ষের ছিল না। লীজ (Leige) ও নামুর (Namur) নামক স্থানে বেলজিয়ামবাসী বীরত্ব সহকারে যুঝিয়াও জার্মান সৈন্যকে প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল না। মন্‌স্‌ ও সার্লেরয় (Mons and Charleroi) নামক স্থানে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর বাধা প্রতিহত করিয়া জার্মান সৈন্য ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের পঁয়ত্রিশ মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু

১৯১৪ খ্রীঃ

লীজ ও নামুর-এর যুদ্ধ

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে মিত্রপক্ষের সেনাপতি জেনারেল ফচ্ (Foch) মার্ণ (Marne) নদীর তীরে জার্মান সেনাবাহিনীকে বাধা দান করেন। এই যুদ্ধে জেনারেল ফচের তৎপরতা ও দক্ষতায় জার্মানবাহিনী পরাজিত হইয়া মার্ণ নদীর তীর ত্যাগ করিয়া পশ্চাদ্‌পসরণে বাধ্য হইল। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে প্যারিস রক্ষা পাইল। ইহা ভিন্ন মিত্রপক্ষ অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া জার্মানির সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ পাইল। জার্মানি মার্ণ-এর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ দ্রুত অবসানের সুযোগ হারাইল। কিন্তু এইস্‌নি (Aisne) নদীর তীরে তাহারা মিত্রপক্ষের আক্রমণ উপেক্ষা করিয়া সুদৃঢ়ভাবে নিজেদের শিবির স্থাপন করিল। উভয়-পক্ষে তুমুল ট্রেঞ্চ্-যুদ্ধ (Trench warfare) চলিল।

মার্ণ-এর যুদ্ধ

'ট্রেঞ্চ্' হইতে যুদ্ধ

এই বৎসর অপর এক জার্মানবাহিনী সমগ্র বেলজিয়াম দখল করিয়া লইল, কিন্তু ইপ্রেস্ (Ypres) নামক স্থানে শত চেষ্টা করিয়াও তাহারা ব্রিটিশবাহিনীকে পরাজিত করিতে পারিল না। এদিকে রুশ সেনাবাহিনী পূর্ব-এশিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়া ট্যানেনবার্গের (Tannenberg) যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়ার অগ্রগতিও জার্মানির সহায়তায় রুদ্ধ হইল। রুশবাহিনী অস্ট্রিয়ার রাজ্যসীমা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

ইপ্রেস্ ও ট্যানেনবার্গের যুদ্ধ

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি পূর্ব-ঘোষিত নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করে। অপরদিকে জার্মানি তুরস্ককে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ করিতে সমর্থ হয়। তুরস্ক দার্দানেলিজ প্রণালী (Dardanelles) মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে বন্ধ করিয়া দিয়া রাশিয়া ও ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর যোগাযোগের পথ রোধ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী সেনা দার্দানেলিজ আক্রমণ করিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। গেলিপোলি (Galli-poli) উপদ্বীপেও মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। মেসোপটামিয়া অঞ্চলেও কুট-এল্-আমারা (Kut-al-Amara)-এর যুদ্ধে ইংরেজবাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু ইহার অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশসৈন্য বাগদাদ দখল করিয়া পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ কতক পরিমাণে লইতে সমর্থ হয়। এই বৎসর হইতেই জার্মানি ইংলণ্ডের সামুদ্রিক প্রাধান্য ও বাণিজ্যিক স্বার্থ নষ্ট

১৯১৫ খ্রীঃ

গেলিপোলি ও কুট-এল্-আমারা-এর যুদ্ধ

করিবার উদ্দেশ্যে 'সাবমেরিণ' বা ডুবোজাহাজের আক্রমণ দ্বারা ইংরেজ জাহাজ ধ্বংস করিতে শুরু করে।

সার্বিয়ার সম্পূর্ণ পরাজয়

ইহা ভিন্ন জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার যুগ্ম আক্রমণে সার্বিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয় এবং শত্রুপক্ষের পদানত হয়। এইভাবে সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই মিত্রপক্ষের পরাজয় ঘটে।

১৯১৬ খ্রীঃ: ভার্দুন ও সোমের যুদ্ধ

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভার্দুন (Verdun) ও সোম (Somme)-এর রণাঙ্গনে জার্মান সেনাবাহিনী ও ইঙ্গ-ফরাসী সেনাবাহিনীর মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ ঘটে। ফ্রান্সের দ্বারদেশে ভার্দুনের যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়, কিন্তু কোন পক্ষেরই পরাজয় ঘটে নাই। জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ফরাসী সৈন্য নিজ অবস্থান বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। অপরদিকে সোমের যুদ্ধে জার্মানবাহিনী ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হয়।

রুমানিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা—পরাজয়

এই বৎসর অবশ্য রাশিয়া অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে পশ্চাদ্‌পসরণে বাধ্য করে, কিন্তু জার্মানি হইতে সামরিক সাহায্য আসিয়া পৌঁছিলে অস্ট্রিয়াকে আর পরাজিত করা সম্ভব হইল না। রাশিয়ার সাময়িক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া রুমানিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, কিন্তু জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার যুগ্মবাহিনীর হস্তে পরাজিত হয়। রুমানিয়ার রাজধানী বুকারেস্ট্‌ অস্ট্রিয়া-জার্মানির সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়।

ডগারব্যাঙ্ক ও হেলগোল্যাণ্ডের যুদ্ধ

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল জাট্‌ল্যাণ্ডের জলযুদ্ধ। এই যুদ্ধের পূর্বে ডগারব্যাঙ্ক (Doggerbank) ও হেলগোল্যাণ্ডের উপসাগর (Bay of Helgoland)-এর জল-যুদ্ধে জার্মান নৌবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু জাট্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে জার্মান রণপোত ব্রিটিশ রণপোতের

জাট্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ (৩১শে মে, ১৯১৬)

ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে। ফলে, উভয়পক্ষে যে ভীষণ নৌযুদ্ধের সৃষ্টি হয় তাহাই জাট্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে উত্তর সাগরে (North Sea) এই যুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষেই বিশালাকার এবং বহু সংখ্যক রণতরী ব্যবহৃত হয়। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনী পরাজিত হয়। উভয়পক্ষেই ক্ষতির পরিমাণ এত বেশি হয় যে, এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও জার্মানি আর ইংরেজ নৌবাহিনীর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে

ব্রেস্ট্ লিটভস্কের সন্ধির পরে
রাশিয়া (১৯১৮ খ্রীঃ)
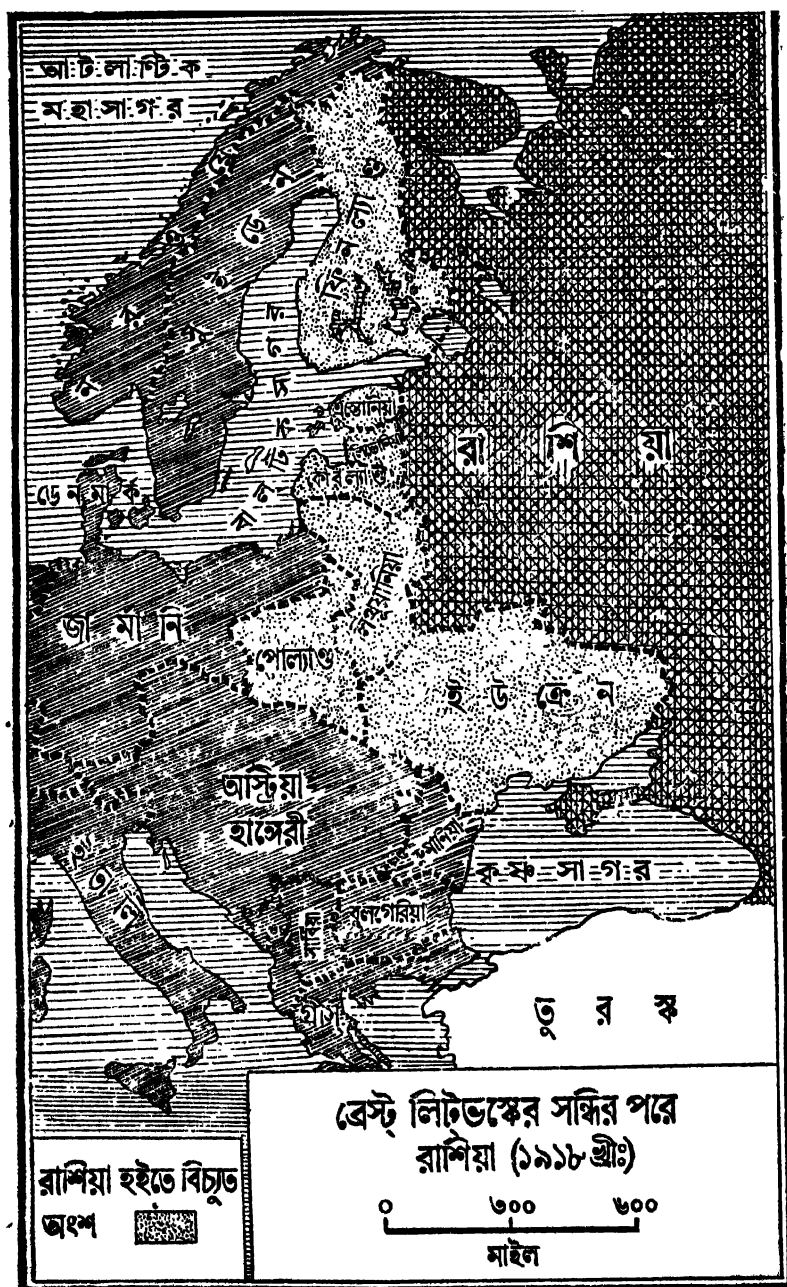
সক্ষম হয় নাই। সুতরাং পরাজিত হইয়াও ব্রিটিশ পক্ষ এই যুদ্ধে জয়লাভের-ই ফলভোগ করিয়াছিল।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের সর্বপ্রধান ঘটনা হইল রাশিয়ার বল্‌শেভিক বিপ্লব। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। বল্‌শেভিক দল সরকার গঠন করে। এই নব-গঠিত সরকার স্থাপিত হওয়ার ফলে সামরিকভাবে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রভাব যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর মধ্যেও দেখা গেল। ইহা ভিন্ন বল্‌শেভিক সরকার যুদ্ধনীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। এই কারণে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ব্রেস্ট-লিট্‌ভস্ক্‌ (Brest-Litvosk)-এর সন্ধি দ্বারা জার্মানির সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিল। এই সন্ধির শর্তানুসারে রাশিয়া পোল্যাণ্ড, বাল্টিক প্রদেশসমূহ প্রভৃতি পশ্চিমদিকে যাবতীয় স্থান জার্মানির নিকটে ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়। রাশিয়ার সহিত যুদ্ধাবসানের ফলে জার্মানি পূর্ব-ইওরোপ হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য পশ্চিম-ইওরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োগের সুযোগ পাইয়াছিল। মিত্রপক্ষের সামরিক অবস্থা তাহাতে সঙ্কটজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু এমন সময়ে আমেরিকা মিত্রপক্ষের সহায়তার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। জার্মান সাবমেরিণের যথেচ্ছ আক্রমণে মার্কিন জাহাজ ও বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। এই কারণে জার্মানিকে পরাজিত করা আমেরিকার স্বার্থের দিক দিয়াও যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল।

বল্‌শেভিক বিপ্লব (১৯১৭)

ব্রেস্ট্-লিট্‌ভস্ক্-এর সন্ধি (১৯১৮)

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান

এই বৎসরই জার্মান সেনাবাহিনী সোম নদীর তীর হইতে অপসরণ করিয়া হিণ্ডেনবুর্গ লাইনের পশ্চাতে অবস্থান করিতেছিল। এখানে মিত্রপক্ষের সহিত জার্মানদের তুমুল যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিল। উভয়পক্ষের প্রচুর ক্ষতি হইলেও কোন পক্ষই প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল না।

জার্মান সৈন্যের হিণ্ডেনবুর্গ লাইনের পশ্চাতে অপসরণ

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে জার্মানি মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিল। এমিয়েন্স ও ইপ্রেসের যুদ্ধে জার্মানি সাফল্যলাভ না করিলেও এই দুই স্থান রক্ষা করিতে গিয়া মিত্রপক্ষের বিরাট সংখ্যক সৈন্য প্রাণ হারাইল। সাময়িকভাবে জার্মানবাহিনী প্যারিস অভিমুখে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইল।

এমিয়েন্স ও ইপ্রেসের যুদ্ধ

কিন্তু শীঘ্রই জার্মানির পরাজয় শুরু হইল। জেনারেল ফচ্-এর সুদক্ষ সমর-পরিচালনায় ইওরোপ ও এশিয়ার প্রতিক্ষেত্রেই জার্মানি পরাজিত হইতে লাগিল। জার্মানির মিত্রশক্তিবর্গ তুরস্ক, রুমানিয়া ও অস্ট্রিয়া মিত্রপক্ষের নিকট পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল। এদিকে জার্মানির অভ্যন্তরে উদারনৈতিক আন্দোলনের ফলে রাশিয়ার অনুকরণে এক রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা দেখা দিল। জার্মান নৌবাহিনীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সর্বত্র সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার ফলে জার্মান সরকার যুদ্ধ অবসান করাই স্থির করিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর মিত্রপক্ষের সহিত জার্মানির যুদ্ধবিরতি ঘটিল। জার্মানির কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম দেশ হইতে পলায়ন করিলেন। জার্মানি প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত হইল। দীর্ঘ চার বৎসর যুদ্ধের বীভৎস অভিজ্ঞতার পর ইওরোপে শান্তি ফিরিয়া আসিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে মিত্রপক্ষের দেশগুলির প্রতিনিধিবর্গের বৈঠক বসিল। ইহাতে এই যুদ্ধ অবসানের স্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হইল।

জার্মানিতে বিপ্লবের আশঙ্কা

যুদ্ধবিরতি (১১ই নভেম্বর, ১৯১৮)

প্যারিসে মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গের বৈঠক

শান্তির প্রস্তুতি (Preparation for Peace): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে (৫ই জানুয়ারী, ১৯১৮) ল্যায়েড্ জর্জ মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় শত্রুপক্ষ অর্থাৎ জার্মানি প্রভৃতির চরম শাস্তিবিধানের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্য মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইল্সনের বক্তৃতায় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী মার্কিন কংগ্রেসের নিকট বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট উইল্সন আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি হিসাবে তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা' নীতির (Fourteen Points) বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার চৌদ্দ দফা পরিকল্পনা ছিল নিম্নলিখিত রূপ:

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ: ল্যায়েড্ জর্জ ও প্রেসিডেণ্ট উইল্সন

(১) আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পরস্পর ব্যবহারে কোনপ্রকার গোপনতা অবলম্বন করা হইবে না। গোপন কূটনীতি (Secret diplomacy) ত্যাগ করিয়া খোলাখুলিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। (২) প্রত্যেক দেশের নিজস্ব উপকূলের সংলগ্ন সমুদ্রের অংশ ভিন্ন

সমুদ্র মাত্রই যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে সকলের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে। (৩) বাণিজ্য বিষয়ে শুল্ক প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক বাধা-বিঘ্ন যথাসম্ভব উঠাইয়া দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। (৪) প্রত্যেক দেশেই অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধাদির সরঞ্জাম হ্রাস করিতে হইবে। কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তির অধিক সামরিক শক্তি রাখা হইবে না। (৫) উদার ও নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি লইয়া ঔপনিবেশিক অধিকারগুলির পুনর্বিবেচনা করা হইবে—অর্থাৎ কে কোন্ স্থানের অধিকারে স্থাপিত হইবে তাহা বিবেচনা করা হইবে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট জনগণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। (৬) রাশিয়ার হৃত রাজ্যাংশ ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং রাশিয়া যাহাতে স্বাধীন এবং জাতীয় নীতি অনুসরণ করিয়া সুগঠিত হইয়া উঠিতে পারে সেই সুযোগ দিতে হইবে। (৭) বেলজিয়াম হইতে বিদেশী সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে এবং বেলজিয়ামকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে পুনঃস্থাপন করিতে হইবে। (৮) ফ্রান্সকে আল্‌সেস্-লোরেন ফিরাইয়া দিতে হইবে। (৯) জাতীয়-তার ভিত্তিতে ইতালির রাজ্য-সীমা নির্ধারণ করিতে হইবে। (১০) অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ দিতে হইবে। (১১) জাতীয়-তার ভিত্তিতে বলকান দেশগুলির পুনর্বণ্টন ও পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং সেগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রক্ষার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (১২) দার্দানেলিজ প্রণালীকে আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে এবং তুর্কী সুলতানের অ-মুসলমান প্রজাবর্গের স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (১৩) পোল্যাণ্ডকে পুনর্গঠন করিতে হইবে এবং সমুদ্রে পৌঁছিবার সুযোগ দান করিতে হইবে। (১৪) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ও রাজ্যসীমার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে।

উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্ত

প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের উপরি-উক্ত চৌদ্দ দফা শর্তসম্বলিত পরিকল্পনা ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইতালি প্রভৃতি অগ্রাহ্য না করিলেও উহা গ্রহণও করিল না। ফলে, শান্তি-সম্মেলনে উইল্‌সন ও অপরাপর দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে বিরোধের পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল (Results of the World War I): প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মোট সাড়ে ছয় কোটি সৈন্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই

সংখ্যার এক কোটি ত্রিশ লক্ষ অর্থাৎ প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছিল। প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন গুরুতর-ভাবে আহত হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে ৭০ লক্ষ পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপে যত যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে মোট যে সংখ্যক লোক মারা গিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক লোক ১৯১৪-১৯১৮ এই চারি বৎসরে প্রাণ হারাইয়াছিল। মিত্রপক্ষের অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি জার্মানি-বিরোধী দেশগুলিরই সর্বাধিক লোকক্ষয় হইয়াছিল এবং মোট হতাহতের দুই-তৃতীয়াংশই ছিল মিত্রপক্ষে।

হতাহতের সংখ্যা

যুদ্ধক্ষেত্রে যে বিরাট সংখ্যক সৈন্যের প্রাণনাশ হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বেসামরিক লোক এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল। সামরিক আক্রমণ, খাদ্যাভাব, নানাপ্রকার রোগ ও মহামারী বেসামরিক লোকের প্রাণনাশ করিয়াছিল। এই বিশাল সংখ্যক নরনারীর মৃত্যুতে একাধিক দেশে পরবর্তী যুগে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল।

বেসামরিক ক্ষতি

খরচের দিক দিয়া বিচার করিলেও এই যুদ্ধের বিশালতা অনুমান করা যাইতে পারে। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির মোট দৈনিক খরচ ছিল ২৪ কোটি ডলার এবং যুদ্ধের মোট খরচ হইয়াছিল ২৭ হাজার কোটি ডলার। ইহা হইতেই যুদ্ধে কি পরিমাণ সামগ্রী ও সম্পত্তি মানুষের প্রাণনাশে ব্যয়িত হইয়াছিল তাহার ধারণা পাওয়া যায়।

অর্থ ও সম্পত্তিনাশের পরিমাণ

ইহা ভিন্ন, মৃত এবং হতাহত সৈন্যের স্থান পূরণ করিবার জন্য যে জবরদস্তি-মূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণের নীতি (conscription) চালু করা হইয়াছিল তাহাতে উদীয়মান বহু বৈজ্ঞানিক, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক প্রভৃতি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইংরেজ কবি উইলফ্রিড্ আওয়েন ও রবার্ট ব্রুকের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই দুইজনেই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

জাতীয় জীবনের ক্ষতি

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন (The Peace Conference of Paris): ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্যারিস নগরীতে পৃথিবীর ৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে সমবেত হইলেন। নিরপেক্ষ দেশ

সুইট্জারল্যাণ্ডেই এই সভার অধিবেশন আহূত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ৪৮ বৎসর পূর্বে সেডানের যুদ্ধের পর জার্মানি প্যারিস নগরীতেই চুক্তি সম্পাদন করিয়া ফ্রান্সের মর্যাদা নাশ ও সম্পত্তি দখল করিয়াছিল। ফ্রান্স প্যারিসে বসিয়াই এইবার উহার প্রতিশোধ লওয়ার সুযোগ ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইল না। একমাত্র ফ্রান্সের মনরক্ষার জন্যই আন্তর্জাতিক সম্মেলন প্যারিস নগরীতে সমবেত হইল।

প্যারিস নগরী শান্তি-সম্মেলনের স্থান নির্বাচিত

৩২টি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইল্সন, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ডেভিড্ ল্যয়েড জর্জ, ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ ক্লিমেন্শো, ইতালির প্রধান মন্ত্রী ভিটোরিও ওর্লাণ্ডো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরও বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি দেশ-বিদেশ হইতে এই শান্তি-সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনের প্রকৃত কার্যক্ষমতা "প্রধান চারিজন" (Big Four -এর হস্তেই ছিল। ইঁহারা হইলেন: উইল্সন, ল্যয়েড্ জর্জ, ক্লিমেন্শো এবং ওর্লাণ্ডো। ফরাসী প্রতিনিধি ক্লিমেন্শো এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন।

প্রধান চারিজন *(Big Four)*

প্যারিস শান্তি-সম্মেলন একাধিক দিক দিয়া ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়। ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত সদস্যবর্গ যেমন উচ্চ আদর্শের মৌখিক পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কার্যতঃ সংকীর্ণ স্বার্থপরতার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন সেইরূপ প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিবর্গও উচ্চ আদর্শবাদের মৌখিক প্রকাশে কোন ত্রুটি করিলেন না। ভিয়েনা সম্মেলনে যেমন জার প্রথম আলেক্জাণ্ডার আদর্শবাদিতার প্রতীকস্বরূপ ছিলেন, প্যারিস শান্তি-সম্মেলনেও সেইরূপ ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইল্সন। তিনি ন্যায় ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্মিলিত প্রতিনিধিবর্গকে সচেতন করিয়া দিলেন। ইওরোপের দেশগুলির পুনর্গঠন ও পুনর্বণ্টনে সংশ্লিষ্ট জনগণের মতামতের মর্যাদাদানের কথাও তিনি বিশেষভাবে বলিলেন। "জনমতের ভিত্তিতে আইনসম্মত শাসন স্থাপন করাই আমাদের উদ্দেশ্য"—এই কথা উইল্সন সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ব্যক্ত করিলেন* এবং এই আদর্শ কার্য-

ভিয়েনা কংগ্রেসের সহিত তুলনীয়

প্রেসিডেণ্ট উইল্সনের আদর্শবাদ

* "What we see is a reign of law based upon the consent of the governed and sustained by the organised opinion of mankind."
Wilson, Vide Ketelbey, p. 430.

করী করিবার জন্ত তিনি তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা শর্ত'-সম্বলিত এক দীর্ঘ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে এই সকল শর্ত কার্যকরী করা সম্ভব হইল না, কারণ যুদ্ধ যখন চলিতেছিল তখন বিভিন্ন দেশ পরস্পর পরস্পরের সহিত বহু চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল এবং এই সকল চুক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জার্মানিকে পদানত করা এবং জার্মানির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। ইহা ভিন্ন জার্মানির নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও কোন কোন দেশের ছিল।

ইওরোপের দেশগুলির প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

এইভাবে প্যারিস শান্তি-সম্মেলনে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত শুরু হইল। একদিকে ন্যায় ও সততা, মানবতা ও স্থায়ী শান্তি ইত্যাদি আদর্শবাদী নীতির ভিত্তিতে ইওরোপের পুনর্গঠনের ইচ্ছা, অপরদিকে জার্মানি ভবিষ্যতে শক্তিশালী হইয়া পুনরায় ইওরোপের শক্তি-সাম্য যাহাতে বিনষ্ট না করিতে পারে সেজন্য জার্মানিকে দুর্বল করিবার, জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং ইওরোপের শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা।* এই দুই আদর্শের দ্বন্দ্বে পদানত জার্মানিকে হীনবল করার নীতিই জয়ী হইল। কোন কোন বিষয়ে ন্যায় ও সততার আংশিক প্রয়োগ যে না করা হইল এমন নহে, তথাপি প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের উচ্চ আদর্শবাদিতা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। ইওরোপীয় রাজনীতির কূটকৌশল ও জটিলতা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ সরলপ্রাণ মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন ল্যয়েড জর্জ, ক্লিমেন্‌শো, ওর্লাণ্ডো প্রমুখ কূটনীতিজ্ঞগণের কূটচালে সহজেই পরাস্ত হইলেন। তাঁহার 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points) নামেই পর্যবসিত হইল। আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনে তাঁহার আদর্শ কার্যকরী হইল না।

দুইটি পরস্পর-বিরোধী ধারার সংঘাত

উইল্‌সনের আদর্শবাদের পরাজয়

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে জার্মানির সহিত ভার্সাই (Versailles)-এর

* "At the peace conference two ideas were struggling for mastery ; on the one side was the conception of an impartial and altruistic distribution of justice ; on the other were notions more familiar to the peace conferences, of the Balance of Power, of security against a recurrence of danger from the defeated state, of territorial and economic compensation on the part of the victors." Ketelbey, p. 431.

সন্ধি, অস্ট্রিয়ার সহিত সেণ্ট্‌ জার্মেইন (St. Germain)-এর সন্ধি, হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন (Trianon)-এর সন্ধি, বুলগেরিয়ার সহিত নিউলি (Neuilly)-এর সন্ধি, এবং তুরস্কের সহিত সেভ্‌রে (Sevres)-এর সন্ধি—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটাইল। এই সকল সন্ধি পরাজিত শক্তিগুলিকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল, বলা বাহুল্য। পরাজিত শত্রুর প্রতি উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা মিত্রশক্তিবর্গ যেমন বুঝিলেন না, তেমনি ইওরোপের পুনর্গঠনে ন্যায় বা সততার ধারও তাঁহারা ধারিলেন না।

ভার্সাই, সেণ্ট্‌-জার্মেইন, ট্রিয়ানন, নিউলি ও সেভ্‌রে—এই পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষরিত

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনের প্রধান প্রধান সমস্যা ছিল: (১) মার্কিন প্রেসিডেণ্ট প্রস্তাবিত চৌদ্দ দফা শর্ত-সম্বলিত আন্তর্জাতিক পরিকল্পনার দলিল প্রস্তুত করা, (২) ফ্রান্সের নিরাপত্তা এবং রাইন নদীর বাম তীর সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা, (৩) জার্মানির সীমা নির্ধারণ করা এবং জার্মান উপনিবেশগুলি সম্পর্কে কি করা হইবে তাহা স্থির করা, (৪) ইতালির ঐক্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য ট্রিয়েস্ট্‌ (Triest) ও ট্রেন্টিনো (Trentino) অঞ্চলের উপর ইতালির দাবি, এবং পোল্যাণ্ডের পুনর্গঠনের দাবি সম্পর্কে বিবেচনা করা, এবং (৫) জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা।

প্যারিস শান্তি-সম্মেলনের সমস্যা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স নামক আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শর্তগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তির অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হইবে কি না সে বিষয়ে প্রথম মতানৈক্য দেখা দিল। কেবলমাত্র প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের সনির্বন্ধতায় শেষ পর্যন্ত (২৮শে এপ্রিল, ১৯১৯) লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের চুক্তি (Covenant) গৃহীত হইল। একটি নূতন শর্ত সংযোজনার দ্বারা বলা হইল যে, আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য মধ্যস্থতা, আঞ্চলিক মৈত্রী ও সৌহার্দ্য বা মন্‌রো-নীতির (Monroe Doctrine) ন্যায় ব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে এবং পারস্পরিক ব্যবহারে জাতি বা জাতির মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্য করা হইবে না এবং প্রত্যেক দেশের প্রজাই সমমর্যাদা প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ একটি প্রস্তাব প্যারিস সম্মেলনের নিকট জাপান উত্থাপিত করিলে ব্রিটেন এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরোধিতায় তাহা অগ্রাহ্য করা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স-এর চুক্তি গৃহীত

হইল। এইভাবে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গিয়াও স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা এবং পরস্পর কৃত্রিম বৈষম্য সম্পূর্ণভাবেই বজায় রহিল।

জার্মানির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফ্রান্স দাবি করিল যে, রাইন নদী এবং ফ্রান্স-বেলজিয়াম-নেদারল্যাণ্ডের অন্তর্বর্তী দশ হাজার বর্গমাইল স্থান একটি মধ্যবর্তী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল (Autonomous buffer state) বলিয়া ঘোষিত হউক। কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব বাতিল হইল। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে আল্‌সেস্‌-লোরেনের ন্যায় অপর একটি সমস্যাসঙ্কুল স্থানের সৃষ্টি হইত। কিন্তু ফ্রান্স্ ইহাতে নিজ নিরাপত্তার দাবি ত্যাগ করিল না। অবশেষে আমেরিকা ও ইংলণ্ড পৃথক পৃথক চুক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসী নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলে ফরাসী মন্ত্রী ক্লিমেন্‌শো শান্ত হইলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে জুন তারিখে জার্মানির সহিত ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার পরিপূরক হিসাবে ফ্রান্স ও ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে আরও দুইটি চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও আমেরিকা জার্মানির আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিল।

রাইন অঞ্চলে স্বায়ত্ত-শাসিত অঞ্চল সৃষ্টির জন্য ফরাসী প্রস্তাব অগ্রাহ্য

ফ্রান্সের নিরাপত্তার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার দায়িত্ব গ্রহণ

ভার্সাই-এর সন্ধির খস্‌ড়ার উপর জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে কেবলমাত্র একবার একটি লিখিত মন্তব্য পেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। ২৩০টি বড় বড় পৃষ্ঠায় টাইপ করা ভার্সাই-এর সন্ধির উপর জার্মান প্রতিনিধিগণ ৪৪৩ পৃষ্ঠা মন্তব্য লিখিয়া পেশ করিলেন। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ বিবেচনা করিয়া এই সকল মন্তব্যের অতি সামান্য অংশই গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। এই সামান্য পরিবর্তনও ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ল্যয়েড্ জর্জের বিশেষ সনির্বন্ধতায় সম্ভব হইয়াছিল। ল্যয়েড্ জর্জ প্যারিসের শান্তি-সম্মেলন শুরু হওয়ার সময় যে প্রকার প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন উহা সামান্য পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতে পারিয়াছিলেন সন্দেহ নাই পরিবর্তিত সন্ধির শর্তানুসারেও জার্মানির ভাগ্যবিড়ম্বনার অবধি ছিল না।

জার্মানির প্রতি মিত্রপক্ষের বিদ্বেষ

ভার্সাই-এর সন্ধি (Treaty of Versailles): ভার্সাই এর সন্ধির শর্তানুসারে জার্মানি (১) ফ্রান্সকে আল্‌সেস্‌-লোরেন ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল (২) বেলজিয়ামকে মরেস্‌নেট্, ইউপেন ও মালমেডি (Moresnet, Eupen

and Malmedi) দিতে বাধ্য হইল। (৩) পোল্যাণ্ডকে পোজেন-এর অধিকাংশ ও পশ্চিম-প্রাশিয়া দিতে হইল, এবং যদি উত্তর-সাইলেশিয়া ও ও পূর্ব-প্রাশিয়ার অধিবাসীরা গণভোট দ্বারা পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে ঐ সকল অঞ্চলও পোল্যাণ্ডকে দিতে হইবে বলিয়া স্থির হইল। (৪) বাল্টিক সাগর তীরে মেমেল (Memel) বন্দরটি মিত্রপক্ষের নিকট ত্যাগ করিতে হইল। কিয়দকাল পরে এই বন্দরটি লিথুয়ানিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত হইয়াছিল। (৫) জার্মানিকে আফ্রিকাস্থ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং চীন, শ্যাম, মিশর, মরক্কো, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ত্যাগ করিতে হইল। চীনদেশস্থ জার্মান অধিকার-সমূহ জাপানকে দেওয়া হইল। অপরাপর স্থানগুলি লীগ-অব-ন্যাশন্‌স-এর পরিদর্শনাধীনে 'Mandatories'-এ পরিণত করা হইল।

পুনর্বণ্টনের শর্তাদি

জার্মানির সামরিক শক্তির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে ইওরোপ তথা পৃথিবীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া মাত্র এক লক্ষে আনা হইল। (২) বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিবার নীতি জার্মানিকে ত্যাগ করিতে হইল। (৩) যে সামান্য সৈন্যসংখ্যা জার্মানিকে রাখিতে দেওয়া হইল তাহাও কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা এবং জার্মানির সীমারক্ষার কার্যে ব্যবহার করিতে হইবে, বলা হইল। (৪) জার্মানির নৌবাহিনীরও সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেওয়া হইল, হেলগোল্যাণ্ডের সামরিক ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। রাইন নদীর বাম তীরের ত্রিশ মাইলের মধ্যে যে সকল জার্মান দুর্গ বা সামরিক ঘাঁটি ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, বিমানবহর রাখা চলিবে না, গোলাবারুদ প্রস্তুতের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে—এই সকল শর্তও জার্মানির উপর চাপান হইল। (৫) উপরি-উক্ত শর্তগুলি যাহাতে যথাযথভাবে পালন করা হয় সেজন্য জার্মানিতে মিত্রপক্ষের এক সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হইল। (৬) জার্মানির যুদ্ধজাহাজগুলি ইংলণ্ডের নিকট ত্যাগ করিতে বলা হইল। এই সকল যুদ্ধজাহাজের অধিকাংশই অবশ্য জার্মান এ্যাড্‌মিরালের আদেশে স্কাপা ফ্লো (Scapa flow) নামক জলভাগে যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পূর্বেই ডুবাইয়া ফেলা হইয়াছিল।

সামরিক শর্তাদি

অর্থনৈতিক দিক দিয়াও জার্মানিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে (১) জার্মানির

বাণিজ্যপোতের অধিকাংশই ফ্রান্সকে দেওয়া হইল। (২) সার (Saar) অঞ্চল নামক একটি জার্মান জেলা পনর বৎসরের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করা হইল। এই দীর্ঘ পনর বৎসর ধরিয়া ঐ অঞ্চলের কয়লার খনিগুলি যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক ফরাসী কয়লার খনিগুলি ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফ্রান্সকে ভোগদখল করিবার অধিকার দেওয়া হইল। পনর বৎসর অতিবাহিত হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ভোট গ্রহণ করিয়া জার্মানির সহিত উহার সংযুক্তির প্রশ্ন স্থির করা হইবে, বলা হইল। বেলজিয়াম ও ইতালিকেও জার্মানি নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে, জার্মানির লোহা ও রবার ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিভিন্ন দেশকে দিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইল। (৩) যুদ্ধসৃষ্টির অপরাধ জার্মানির উপর আরোপ করিয়া জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম এবং অপরাপর আরও বহু ব্যক্তিকে মিত্রপক্ষের নিকট সমর্পণের দাবি করা হইল। (৪) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে মিত্রপক্ষ কি পরিমাণ অর্থ জার্মানির নিকট হইতে আদায় করিবে তাহা স্থির করা সম্ভব হইল না। বিভিন্ন প্রতিনিধি বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ দাবি করিলেন। বিভিন্ন প্রতিনিধির হিসাব অনুযায়ী এই দাবি মোট ১৫ শত কোটি ডলার হইতে ২০ শত কোটি ডলারের মধ্যে দাঁড়াইল। কী পরিমাণ অর্থ দাবি করিলে ঠিক হইবে তাহা প্রতিনিধিবর্গ স্থির করিতে না পারিয়া অবশেষে এই ব্যবস্থা করিলেন যে, ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানি মিত্রপক্ষকে মোট ৫০০ কোটি ডলার পরিমাণ সোনা বা অপর কোন জিনিস দিবে। ইতিমধ্যে একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন মোট কত পরিমাণ অর্থ জার্মানিকে দিতে হইবে তাহা স্থির করিবেন আর জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

অর্থনৈতিক শর্তাদি: ক্ষতিপূরণ

ভার্সাই-এর সন্ধির সমালোচনা (Criticism of the Treaty of Versailles): প্রথম মহাযুদ্ধে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এবং ইওরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে যে তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রতিক্রিয়া আমরা ভার্সাই-এর সন্ধিতে জার্মানির প্রতি ইওরোপীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্যবহারে লক্ষ্য করি। পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা, উপযুক্ত মর্যাদা, ন্যায় বা সততা প্রদর্শনের দূরদৃষ্টি বা প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার মত রাজনৈতিক বিবেচনা বা অন্তর্দৃষ্টি সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গের ছিল না। ভবিষ্যতে জার্মানি

মিত্রপক্ষের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব

যাহাতে পুনরায় শক্তিশালী হইয়া ইওরোপের শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বনই প্রতিনিধিবর্গের একমাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছিল।

ভার্সাই-এর সন্ধিতে* আমরা দুইটি নীতির প্রাধান্য দেখিতে পাই, যথা : (১) যুদ্ধসৃষ্টির অপরাধে জার্মানিকে কঠোর শাস্তি দেওয়া এবং (২) জার্মানির আক্রমণ হইতে ভবিষ্যতে ইওরোপের নিরাপত্তা যাহাতে ব্যাহত না হইতে পারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা। এই দুই নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া প্যারিস সম্মেলনে সমবেত কূটনীতিকগণ পরাজিত শত্রুর কৃতজ্ঞতার মাধ্যমে শান্তি স্থাপন ও শ্রদ্ধা অর্জনের চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ন্যায্য-বিচার, দূরদৃষ্টি ও মানবতার দাবি উপেক্ষা করিয়া স্বার্থপর ও সংকীর্ণ প্রতিহিংসা গ্রহণে তাঁহারা ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের কার্যাবলী একাধিক যুক্তিতে সমর্থন-যোগ্য নহে বলিয়া প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই।

দুইটি প্রধান নীতি : (১) জার্মানিকে যুদ্ধের অপরাধে শাস্তি দান, (২) ভবিষ্যতে জার্মানির শক্তি-সঞ্চয়ের পথ রোধ

প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের কালে পরাজিত শত্রুর মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন হয়। শান্তিচুক্তির শর্তগুলি অন্যায্য ও অপমানজনকভাবে কঠোর হইলে পরাজিত শত্রুর শ্রদ্ধা বা কৃতজ্ঞতা অর্জনের কোন সুযোগ স্বভাবতই থাকে না, ফলে শান্তিচুক্তির বিরোধিতা প্রথম হইতেই শুরু হয়।† এই বিরোধ ও বিদ্বেষ ভবিষ্যতে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় পরিণত হয়। জার্মানির ক্ষেত্রেও এইরূপ হইয়াছিল। মিত্রপক্ষের প্রতিনিধিবর্গ জার্মান প্রতিনিধিগণকে ভার্সাই-এর চুক্তির খস্‌ড়ার উপর কেবলমাত্র একবার লিখিত মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মতামতের অতি সামান্যই ভার্সাই-এর সন্ধিতে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধের ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা ঐ চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। উপরন্তু জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় সামরিক প্রহরাধীনে

(১)মানসিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়া শান্তির প্রতিকূল

* "The treaty represented two main ideas : a stern and relentless justice on the basis of the assumption of German guilt and a need of protecting Europe against a revival of German ambition." *A Short History of Modern Europe*, Riker, p. 396.

† "It is possible that if the victorious powers had shown less severity in their treatment of Germany, she might have reconciled herself more readily to her altered status." Lipson, p. 322.

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে (১৯১৯ খ্রীঃ)
জার্মানি
০ ৮০ ১৬০
মাইল
উত্তর সাগর
ডেনমার্ক
শ্লেজভিগ
গণভোট সাপেক্ষ
বালটিক সাগর
সুইডেন
মিত্রশক্তিকে
স্বাধীন শহর বলিয়া ঘোষিত
নিয়েমেন নং
পূর্ব প্রাশিয়া
ডানজিগ
হ্যামবার্গ
স্টেটিন
ব্রিমেন
এল্‌ব নং
বার্লিন
পোল্যাণ্ডকে
ভিস্চুলা নং
পোল্যাণ্ড
ওডার নং
হ্যানোভার
বেলজিয়ামকে
গণভোট সাপেক্ষ
চেকোস্লোভাকিয়াকে
কোলোন
বেলজিয়াম
ড্রেসডেন
সাইলেশিয়া
রাইন নং
ফ্রাঙ্কফার্ট
চেকোস্লোভাকিয়া
সার অঞ্চল
ফ্রান্সকে
(১৫ বৎসরের জন্য)
ফ্রান্স
দানিয়ুব নং
আলসেস-লোরেন
মিউনিক
ফ্রান্সকে
সুইট্‌জারল্যাণ্ড
অস্ট্রিয়া

সম্মেলনের অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত করিয়া এবং অধিবেশন শেষে বাহিরে লইয়া গিয়া জার্মান দেশ ও জাতির প্রতি অযথা অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এইরূপ আচরণের মধ্যে মিত্রপক্ষের শক্তি ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় যতটুকুই থাকুক না কেন, স্থায়ী শান্তি স্থাপনের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি উহাতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্মান জাতি, এমন কি ইওরোপের আরও বহুদেশে ভার্সাই-এর সন্ধি একটি 'Dictated Peace' বা বিজেতার আদেশ অনুযায়ী বিজিতের উপর জবরদস্তিমূলকভাবে চাপান শান্তিচুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। স্বভাবতই, জার্মান জাতি এই সন্ধির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের (১৯৩৯—'৪৫) বীজ এই মনোভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল।

জার্মানির প্রতি অযথা অপমানজনক ব্যবহার

'Dictated Peace'

দ্বিতীয়তঃ, ভার্সাই-এর সন্ধি লীগ-অব্-ন্যাশন্সের পত্তন করিয়াছিল। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মূল নীতির দিক দিয়া বিচার করিলেও ভার্সাই-এর সন্ধি সমর্থন করা যায় না। এই সন্ধির শর্তাদি কোন উদার, বা ন্যায্য নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। জার্মানিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু করা হইয়াছিল, কিন্তু জার্মানি হইতে যে সকল সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহার প্রতিদানে জার্মানিকে কোন সুবিধাদানের মনোবৃত্তি মিত্রপক্ষের ছিল না। জার্মানির উপনিবেশগুলি লীগ-অব্-ন্যাশন্সের পরিদর্শনাধীনে অপরাপর ইওরোপীয় শক্তির 'উদার এবং দায়িত্বমূলক' শাসনাধীনে স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু লীগ-অব্-ন্যাশন্সের শর্তানুসারে * উপনিবেশ সম্পর্কে ন্যায্য-নীতি অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়াও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ তাহাদের নিজ নিজ উপনিবেশের উপর পূর্ববৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসন চালাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই।

(২) অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক শর্তাদির অনুদারতা ও অবিচার—লীগ-অব্-ন্যাশন্সের নীতিবিরোধী

তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করিবার নীতি ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরকারী দেশ মাত্রেই গ্রহণ করিয়াছিল। লীগ-অব্-ন্যাশন্স-এর মূল ভিত্তি ছিল প্রেসিডেন্ট উইল্সনের চৌদ্দ দফা শর্তাবলী (Fourteen

---

*"A free open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims." *League of Nations Covenant*, vide Langsam, p. 69.

Points)। এই শর্তাবলীর চতুর্থ শর্তানুযায়ী * স্বাক্ষরকারী দেশগুলি নিজ নিজ দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সামরিক শক্তি ভিন্ন উদ্‌বৃত্ত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিতে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে কেবলমাত্র জার্মানির উপরই মিত্রপক্ষ এই শর্তের প্রয়োগ করিয়া এবং নিজ নিজ দেশের সামরিক শক্তি অপরিবর্তিত রাখিয়া কপটতা এবং নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির দিক হইতে বিচার করিলে মিত্রপক্ষের এই আচরণ বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। জার্মানির সামরিক শক্তি বেলজিয়ামের সামরিক শক্তি অপেক্ষাও হ্রাস করা হইয়াছিল। এই দিক দিয়া বিচার করিলে জার্মানির পক্ষে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অসৎ অভিপ্রায়ের অভিযোগ আনা মোটেই অযৌক্তিক হইবে না।

সামরিক শক্তি-হ্রাস-নীতি অবহেলিত

চতুর্থতঃ, জার্মানি হইতে আল্‌সেস্‌-লোরেন ফ্রান্সকে দান করা, পোল্যাণ্ডকে পশ্চিম-প্রাশিয়া, পোজেনের অধিকাংশ ফিরাইয়া দেওয়ার মধ্যে মিত্রপক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রাধান্য দিয়াছিলেন বলা হইয়া থাকে। কিন্তু অস্ট্রিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডকে যেসকল স্থান জার্মানি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল সেগুলির সর্বত্রই পোলজাতির লোকসংখ্যা অধিক ছিল এমন নহে। জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত এই সকল স্থানের সংযুক্তি নিরপেক্ষ বিচারে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিল।†

জাতীয়তাবাদের প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

পঞ্চমতঃ, জার্মানিকে যুদ্ধ সৃষ্টির অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া জার্মানির নিকট হইতে অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবির পশ্চাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়া জার্মানির সর্বনাশসাধনের ইচ্ছা প্রকাশ পায়। জার্মানিকে

* "Adequate guarantees that national armaments will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety." Wilson's *Fourteen Points*, Langsam, p. 69.

† "It was perhaps open to question whether the territories ceded by Germany to Poland included only those inhabited by indisputably Polish populations." E. H. Carr; International Relations between the two World Wars, pp. 5-6.

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক, ঔপনিবেশিক এবং বিস্তৃতির দিক দিয়া দুর্বল করিয়া ভবিষ্যতে জার্মানি যাহাতে ইওরোপীয় দেশগুলির ভীতির সঞ্চার না করিতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। নীতি কিংবা রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক হইতে বিচার করিলে পরাজিত শত্রুর এইরূপ অবমাননা এবং নির্যাতন নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, স্বীকার করিতেই হইবে। মিত্রশক্তিগুলির প্রতিহিংসাপরায়ণতাই ইহা হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে।

অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণের দাবি: রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা

ঐতিহাসিক রাইকার বলিয়াছেন যে, যুদ্ধে বিজয়ী শক্তিগুলি বিজিত শক্তি বা শক্তিবর্গের উপর কঠোর শর্তাদি চিরকালই চাপাইয়া থাকে। জার্মানি যদি প্রথম মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিত তাহা হইলে জার্মানিও যে মিত্রশক্তিগুলির উপর অনুরূপ শর্তাদি না চাপাইত তাহা বলা যায় না। রাশিয়ার সহিত জার্মানির ব্রেস্ট্-লিট্ভস্কের সন্ধি এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। রাইকারের অভিমত সমর্থন করিবার জন্য ইতিহাসে দৃষ্টান্তের অভাব নাই সত্য, কিন্তু পরাজিত শত্রুর প্রতি অনুকম্পা ও মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার শত্রুকে শত্রুতা ত্যাগে অনুপ্রাণিত করিতে পারে, শত্রুর কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে—এইরূপ দৃষ্টান্তও ইতিহাসে রহিয়াছে। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে স্যাডোয়ার যুদ্ধের (১৮৬৬) পর জার্মানির প্রতি অস্ট্রিয়ার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার বিস্মার্কের উদারতার ফলস্বরূপ ইহা অনস্বীকার্য। মানবতা এবং নৈতিকতার দিক ভিন্ন প্রকৃতক্ষেত্রেও ভার্সাই-এর সন্ধি যে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সেই বিষয়েও সন্দেহ নাই।*

ঐতিহাসিক রাইকারের অভিমত

(১) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের সুযোগ-সুবিধা হইতে জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী দেশকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করিবার নীতির মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী দেশকে এইভাবেই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যহীন করিবার মধ্যেই ভার্সাই-এর সন্ধি ভঙ্গ করিবার দৃঢ়সংকল্প জার্মান জাতির মধ্যে জাগিয়াছিল। অপর একটি যুদ্ধের দ্বারা নিজ মর্যাদা এবং হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টায় জার্মান জাতি প্রথম হইতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। (২) পোল্যাণ্ডকে পশ্চিম-প্রাশিয়া

জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হরণের ফল: সন্ধিভঙ্গ করিবার জন্য জার্মানির সংকল্প

* "But the moral defects of the treaty are no more glaring than the practical." Riker, p. 698.

ফিরাইয়া দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাশিয়া নিজ রাজ্যাংশের যে সংহতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা বিনষ্ট করিলে জার্মান জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন শাসনকার্য এবং রাজ্যের নিরাপত্তারও অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। জার্মানি এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেও সুযোগ পাইলেই উহার পরিবর্তন করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? মিত্রপক্ষ কর্তৃক জার্মানির এই অপমানের পশ্চাতেই ভবিষ্যতে জার্মানির উত্থানের ইঙ্গিত রহিয়াছে। জার্মানি এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রথম হইতেই কৃতসংকল্প হইয়া উঠে। (৩) তদুপরি জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে অভাবনীয় পরিমাণ অর্থ দাবি করা হইয়াছিল তাহা বাস্তবক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নহে। মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর ক্ষতিপূরণের যে বিরাট বোঝা চাপাইয়াছিল তাহার মধ্যেই এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইয়াছিল। কাল্পনিক যে কোন পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধার্য করিবার মধ্যে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা বা শত্রুকে দুর্বল করিবার আগ্রহ প্রকাশ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ইহা বাতুলতা ভিন্ন কিছুই নহে। জার্মানির কয়লার শতকরা ৪০ ভাগ, লোহার শতকরা ৬৫ ভাগ এবং রবারের সমগ্র পরিমাণ মিত্রশক্তিদের স্বার্থে ব্যয় করিবার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব জার্মানির উপর স্থাপন করা ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। হাঁসকে উপবাসী রাখিয়া সোনার ডিম আশা করা দুরাশা মাত্র। জার্মানিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করিয়া ক্ষতিপূরণের আশা করা ঐরূপ সোনার ডিমের ন্যায়ই দুরাশা ছিল। ফলে, এই সকল শাস্তিমূলক শর্তের অধিকাংশই শেষ পর্যন্ত অকার্যকরী রহিয়া গিয়াছিল।

জার্মানির অপমান: সন্ধিভঙ্গের সংকল্প

অভাবনীয় ক্ষতিপূরণ দাবি: অদূরদর্শিতার পরিচায়ক

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রধানতঃ, জার্মানি কর্তৃক সৃষ্ট প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের নরনারীর যে দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে এক প্রতিশোধাত্মক জনমত গঠিত হইয়াছিল। ভার্সাই-এর সন্ধি-সংগঠকগণ এই শক্তিশালী জনমত উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহা ভিন্ন মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর

উপসংহার:

চুক্তির শর্তাদি ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তথাপি নিরপেক্ষ বিচারে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সংকীর্ণ, স্বার্থপর জাতীয়তাবোধ, জার্মানির শক্তিবৃদ্ধিতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ভীতি প্রভৃতি কারণ ভার্সাই-এর সন্ধিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল।

(১) ইওরোপীয় জনমতের চাপ, (২) মিত্রশক্তিবর্গের পরস্পর চুক্তি

জার্মানির ন্যায় শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন দেশকে পূর্বে কখনও এইভাবে পদানত করিবার দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। স্বভাবতই এই সন্ধি মানিয়া লওয়া জার্মান জাতির পক্ষে অসম্ভব ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ ভার্সাই-এর সন্ধিতেই যে বপন করা হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংকীর্ণ স্বার্থপরতা-হেতু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ সৃষ্টি

সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি (Treaty of Saint Germain): মিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি তথা অপরাপর সন্ধিগুলিও ভার্সাই-এর সন্ধির মূলনীতির অনুকরণে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী যুগ্ম রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জার্মান-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়াকে একটি ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যে পরিণত করা হইল। জার্মান-অধ্যুষিত অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত সংযুক্তির জন্য আগ্রহান্বিত ছিল, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জার্মানি ও অস্ট্রিয়াকে জাতীয়তার ভিত্তিতে যাহাতে ঐক্যবদ্ধ হইতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিল। অস্ট্রিয়া জার্মানির সহিত এমন কোন চুক্তি বা সম্বন্ধ স্থাপন করিবে না যাহাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—এই শর্তটিও ইওরোপীয় রাজনীতিকগণ অস্ট্রিয়ার উপর চাপাইলেন। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তির ফলে যাহাতে অধিকতর শক্তিশালী জার্মানির সৃষ্টি না হইতে পারে, সেইজন্য অস্ট্রিয়ার জার্মান অধিবাসীদিগকে জাতীয়তার ভিত্তিতে নিজ ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেওয়া হইল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জাতীয়তার দোহাই দিয়াই সমবেত রাজনীতিকগণ অস্ট্রিয়ার সাইলেশিয়া সুদেতেন অঞ্চল এবং বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশ দুইটি একত্রিত করিয়া চেকোস্লোভাকিয়া (Czecho-Slovakia) নামে এক নূতন রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন স্লাভ্-অধ্যুষিত বোস্নিয়া ও হার্জেগোভিনা অস্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সার্বিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। সার্বিয়ার নূতন নামকরণ হইল

মিত্রপক্ষ ও অস্ট্রিয়া: সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধি

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তিতে বাধাদান

যুগোস্লাভিয়া (Yugo-Slavia)। জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বনে ইওরোপীয় রাজনীতিকগণের কার্যকলাপ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিল। দক্ষিণ-টাইরল (South Tirol), ট্রেন্টিনো (Trentino), ট্রিয়েস্ট্ (Trieste), ইস্ট্রিয়া (Istria) এবং ডালম্যাশিয়া (Dalmatia)'র নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ অস্ট্রিয়ার রাজ্য হইতে ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। দক্ষিণ-টাইরলের অধিবাসিবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিল জার্মান ভাষাভাষী, অথচ ইতালির সহিত গোপন চুক্তির শর্তাদি রক্ষা করিতে গিয়া এই স্থানটি জার্মানিকে না দিয়া ইতালিকে দেওয়া হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডকে অস্ট্রিয়ান গ্যালিসিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইভাবে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যুগ্ম রাজ্যের অবসান করা হইয়াছিল। জার্মানির ন্যায় অস্ট্রিয়াও ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা যাহা কিছু বিভিন্ন মহাদেশে ভোগ করিতেছিল তাহা মিত্রপক্ষকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দানিউব নদীর নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত কতকগুলি বিশেষ শর্ত অস্ট্রিয়াকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ক্ষতিপূরণ, যুদ্ধসৃষ্টির অপরাধে অপরাধী অস্ট্রিয়াবাসীর বিচার প্রভৃতি নানাবিধ শর্ত অস্ট্রিয়াকে মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। অস্ট্রিয়ার সৈন্যসংখ্যা ত্রিশ হাজারে নামাইয়া আনিতে হইয়াছিল এবং সৈন্য সংগ্রহ ব্যাপারে জার্মানির উপর যেরূপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চাপান হইয়াছিল অনুরূপ ব্যবস্থা অস্ট্রিয়াকে মানিয়া লইতে হইয়াছিল।

জাতীয়তাবাদের নীতি প্রয়োগে পক্ষপাতিত্ব

অস্ট্রিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিলোপ

অস্ট্রিয়ার সামরিক শক্তি হ্রাস: ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতেই ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ভার্সাই-এর সন্ধির যেসকল দোষ-ত্রুটি ছিল ঠিক সেইরূপ দোষ-ত্রুটি সেণ্ট্ জার্মেইনের সন্ধিতেও ছিল। এই সন্ধির বিরুদ্ধেও একই প্রকার অভিযোগ করা যাইতে পারে।

নিউলির সন্ধি (Treaty of Neuilly): নিউলির সন্ধি মিত্রপক্ষ এবং বুলগেরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল (নভেম্বর ২৭, ১৯১৯)। এই সন্ধি দ্বারা বুলগেরিয়ার পশ্চিম অংশের কয়েকটি স্থান যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইয়াছিল। যুগোস্লাভিয়ার সামরিক নিরাপত্তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বুলগেরিয়ার সৈন্যসংখ্যা মোট ৩৩ হাজারের বেশি হইবে না স্থির হইল। ক্ষতিপূরণের শর্তও বুলগেরিয়ার উপর চাপান হইল। বুলগেরিয়ার রাজ্যাংশ খুব বেশি হ্রাস

বুলগেরিয়ার সহিত নিউলির সন্ধি

না পাইলেও এই সকল শর্তের ফলে বুলগেরিয়া বলকান অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা দুর্বল দেশে পরিণত হইল।

ট্রিয়ানন-এর সন্ধি (Treaty of Trianon): ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়াননের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে হাঙ্গেরীর নিজ রাজ্যস্থ ম্যাগিয়ার জাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। রুমানিয়াকে ট্রানসিলভ্যানিয়া এবং উহার পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের একাংশ ও টেমেস্‌ভারের অধিকাংশ দেওয়া হইল। টেমেস্‌ভারের অবশিষ্টাংশ ক্রোশিয়া-স্লাভোনিয়া যুগোস্লাভিয়াকে দেওয়া হইল। চেকোস্লোভাকিয়াকে স্লোভাকিয়া দেওয়া হইল। বার্গেনল্যাণ্ড বা পশ্চিম-হাঙ্গেরী অস্ট্রিয়ার সহিত সংযুক্ত করা হইল। ৩৫ হাজার সৈনিকের অধিক সৈন্য হাঙ্গেরীর সেনাবাহিনীতে রাখা নিষিদ্ধ হইল। হাঙ্গেরীর নৌবাহিনীরও কোন অস্তিত্ব রাখা হইল না, সমুদ্র অঞ্চলে পাহারার জন্য সামান্য কয়েকটি জাহাজ তাহাদের রহিল। অপরাপর পরাজিত শক্তিবর্গের ন্যায় হাঙ্গেরীকেও এক বিশাল ক্ষতিপূরণের শর্ত মানিয়া লইতে হইল।

হাঙ্গেরীর সহিত ট্রিয়ানন-এর সন্ধি

সেভ্‌রে-এর সন্ধি (Treaty of Sevres): ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তুরস্কের সহিত মিত্রশক্তির সেভ্‌রে-এর সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুসারে মিশর, সুদান, সাইপ্রাস, ট্রিপোলিটানিয়া, মরক্কো ও টুনিস প্রভৃতি স্থানের উপর অধিকর ত্যাগ করিতে তুরস্ক বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন আরব, প্যালেস্টাইন, মেসোপটামিয়া ও সিরিয়ার উপর হইতেও তুর্কী অধিকার বিলোপ করা হইল। স্মার্ণা ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া মাইনর সাময়িকভাবে গ্রীসের আধিপত্যাধীনে স্থাপন করা হইল। গ্রীসকে ইজিয়ান সাগরস্থ কয়েকটি দ্বীপ এবং থ্রেসের একাংশ দেওয়া হইল। রোড্‌স্ ও ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জে ইতালির অধিকার স্বীকৃত হইল। অবশ্য ভবিষ্যতে ইতালি ডোডেকানীজ দ্বীপপুঞ্জ গ্রীসকে দান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তুরস্ক আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। দার্দানেলিজ ও বোস্‌ফোরাস্ প্রণালীদ্বয় আন্তর্জাতিকভাবে নিরপেক্ষ জলপথ বলিয়া ঘোষিত হইল এবং উহার তীরস্থ সামরিক ঘাঁটি প্রভৃতি উঠাইয়া দেওয়া হইল। একদা বিশাল ওটোমান সাম্রাজ্য কন্‌স্টান্টিনোপল এবং এ্যানাটোলিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল।

তুরস্কের সহিত সেভ্‌রে-এর সন্ধি

তুরস্ক এক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত

তুর্কী সুলতান ষষ্ঠ মোহম্মদের প্রতিনিধি সেভ্রে-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু উহা যখন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনের জন্য তুরস্কে প্রেরিত হইল তখন মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দল (Nationalists) এই সন্ধি অনুমোদনে বাধা দান করিল। শেষ পর্যন্ত ল্যসেনের (Lausanne) সন্ধি দ্বারা তুরস্ক সেভ্রে-এর সন্ধির পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হয়।

জাতীয়তাবাদী দলের বাধা দান

ম্যাণ্ডেট্‌স্ (Mandates): জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এবং তুরস্কের আরবীয় উপদ্বীপস্থ সাম্রাজ্যের শাসনভার লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের দায়িত্বাধীনে গ্রহণ করা হইল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের পরিদর্শনাধীনে বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশকে এই সকল অঞ্চলের শাসনকার্য সাময়িকভাবে পরিচালনার ভার দেওয়া হইল। যে সকল দেশের অধীনে এই সকল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যাংশ স্থাপন করা হইল সেগুলিকে Mandatory Powers এবং সেগুলির অধীনে স্থাপিত স্থানগুলিকে Mandates নামকরণ করা হইল।

এই সকল Mandates-এর অধিবাসীদের উন্নতিবিধান করাই ছিল লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রতি বৎসর Mandatory Powerগুলিকে তাহাদের অধীন Mandates-এর অবস্থা সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নিকট দাখিল করিতে হইত।

Mandatesগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণী। তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত যেসকল স্থানের অধিবাসিবৃন্দ নিজ শাসন পরিচালনার মত উন্নত ছিল তাহাদিগকে Mandatory Powerগুলি কেবলমাত্র উপদেশ ও প্রয়োজনীয় সাহায্যদান করিবে। যখনই এই সকল স্থানের অধিবাসীরা নিজ পায়ে দাঁড়াইবার শক্তি অর্জন করিবে, তখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ Mandateগুলিকে 'ক' পর্যায়ভুক্ত করা হইল। আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলিকে 'খ' পর্যায়ভুক্ত করা হইল। এই সকল স্থানে Mandatory Power-কে শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হইল, কারণ এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত ছিল না। 'গ' পর্যায়ে রাখা হইল প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাস্থ জার্মান উপনিবেশগুলিকে। এগুলি নিকটবর্তী Mandatory Powers-এর রাজ্যাংশ হিসাবে বিবেচনা করা হইল,

তবে এই সকল স্থানের জনগণের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্য কতক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

'ক' পর্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ইরাক, প্যালেস্টাইন ও ট্রান্সজর্ডন ব্রিটিশ সরকারের হস্তে দেওয়া হইল, সিরিয়া, লেবানন দেওয়া হইল ফ্রান্সকে। 'খ' পর্যায়ভুক্ত Mandates-এর মধ্যে ক্যামেরুনস্-এর একাংশ, টোগোল্যাণ্ডের একাংশ এবং টঙ্গানিকা (জার্মান ইস্ট্-আফ্রিকা) ব্রিটেনের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল, টোগোল্যাণ্ড ও ক্যামেরুনস্-এর অবশিষ্টাংশ স্থাপন করা হইল ফ্রান্সের অধীনে। বেলজিয়ামকে রুয়াণ্ডা-উরুণ্ডির শাসনভার দেওয়া হইল। 'গ' পর্যায়ভুক্ত স্থানগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকাকে দেওয়া হইল, জার্মান স্যামোয়া দেওয়া হইল নিউজিল্যাণ্ডকে, নাউরু দ্বীপটি দেওয়া হইল ইংলণ্ডকে। বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ অপরাপর যাবতীয় জার্মান উপনিবেশ অস্ট্রেলিয়াকে এবং বিষুবরেখার উত্তরস্থ সকল জার্মান উপনিবেশ জাপানকে দেওয়া হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব (Historical importance of the World War I): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফল এত বিভিন্ন এবং ব্যাপক যে, সেগুলির প্রত্যেকটি নির্ধারণ করা বা প্রত্যেকটি সম্পর্কে আলোচনা করা সহজসাধ্য নহে। গুরুত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়া অনুচিত হইবে না।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব: ব্যাপক ও বিভিন্ন

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর সর্বপ্রথম সমষ্টিগত যুদ্ধ (Total War)। জাতীয় জীবনের কোন স্তরই এই যুদ্ধের প্রভাবমুক্ত ছিলনা। নবজাত শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত সকলের উপরই এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আঘাত লাগিয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপকতা—জল, স্থল, আকাশ—সর্বত্র এই যুদ্ধের বিস্তৃতি, নূতন নূতন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসে এক নূতন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই।

সর্বপ্রথম সমষ্টিগত যুদ্ধ (Total War)

এই যুদ্ধের ফলে চারিটি বৃহৎ সাম্রাজ্য লোপ পাইয়াছিল, যথা, জার্মান, রুশ, তুরস্ক ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী। ইওরোপের রাষ্ট্রনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে ইওরোপের মানচিত্রের যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল তাহাতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র একেবারে ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপের মানচিত্র তদানীন্তন লোকের নিকট কোন নূতন

জার্মান, রুশ, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতন: নূতন নূতন রাষ্ট্রের উত্থান

মহাদেশের মানচিত্র বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র ছিল না। পোল্যাণ্ড, বোহেমিয়া, লিথুয়ানিয়ার পুনর্গঠন, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়ার গঠন ইওরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে এক নূতন রাজনৈতিক ধারার সৃষ্টি করিয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টির পূর্বে যে উৎকট জাতীয়তাবোধ জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দেখা গিয়াছিল তাহা প্রশমিত হইয়া পরাধীন দেশসমূহে স্বাধীনতাকামী জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইল। বলকান অঞ্চলে নির্যাতিত জাতীয়তাবাদ আংশিকভাবে জয়যুক্ত হইল। চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ইহা পরিলক্ষিত হয়।

স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদ

এই যুদ্ধে জাতীয়তাবাদ ছাড়া গণতন্ত্রেরও প্রসার ঘটিয়াছিল। পরাধীন দেশগুলিতে স্বাধীনতালাভের এক দুর্দমনীয় আবেগ ও আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষ, মিশর ও পূর্ব-আফ্রিকা অঞ্চলে এই স্বাধীনতা-আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে সকল নূতন স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের জয় পরিলক্ষিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কেবলমাত্র ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র ছিল প্রজাতান্ত্রিক, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের অল্পকালের মধ্যেই ইওরোপীয় মহাদেশে প্রজাতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা হইয়াছিল মোট ষোল।

গণতন্ত্রবাদ

কিন্তু জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই একটি বিরুদ্ধ ধারাও পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধ-প্রসূত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অপরাপর সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অকৃতকার্যতার ফলে কোন কোন দেশে গণতন্ত্রের স্থলে 'ডিক্টেটরশিপ্' (Dictatorship)-এর উদ্ভব হইতে থাকে। এই নূতন রাজনৈতিক মনোভাবের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবে, ইতালির ফ্যাসিজম্ ও জার্মানির নাৎসিজম-এর উত্থানে।

ডিক্টেটরশিপ্-এর উদ্ভব (Rise of Dictatorship)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিকতার প্রসার হইয়াছিল। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর 'কন্সার্ট-অব-ইওরোপ' (Concert of Europe) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাময়িকভাবে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিতে

সচেষ্ট হইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কন্সার্ট-অব-ইওরোপের অনুকরণে প্রেসিডেণ্ট উইল্সনের 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর উপর নির্ভর করিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্স (League of Nations) নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। প্রত্যেক দেশই আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহায়তা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখিবার প্রতিশ্রুতি দান করিল। এই আন্তর্জাতিকতার অপর একটি প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় 'থার্ড ইণ্টারন্যাশনাল' (Third International)-এর প্রতিষ্ঠায়।

আন্তর্জাতিকতার বৃদ্ধি : লীগ-অব-ন্যাশন্স

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা পরবর্তী যুগের যুবসমাজের মধ্যে এক গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ও চিন্তাশীলতার উদ্রেক করে। পৃথিবীর সর্বত্রই যুবসমাজের মধ্যে এক অভাবনীয় চেতনা দেখা দেয়।

যুবসমাজের জাগরণ

এই যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকা ছিল একটি ঋণগ্রস্ত দেশ, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মহাজন দেশে (creditor country) পরিণত হয়। মার্কিন রাষ্ট্রের এই উত্থান পরবর্তী কালে নানাপ্রকার ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছিল।

আমেরিকার অর্থনৈতিক প্রাধান্য লাভ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মারণাস্ত্রের ভয়াবহ ফলাফল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেসকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল, যুদ্ধোত্তরকালে তাহা জনসমাজের যথেষ্ট উপকারসাধন করিয়াছে বলা বাহুল্য। চিকিৎসাশাস্ত্র এই যুদ্ধের ফলে বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বেসামরিক বিমান-চলাচল, নৌ-চলাচল প্রভৃতিরও যথেষ্ট উন্নতি এই যুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিসাবেই ঘটিয়াছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিজ্ঞানের উন্নতি

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর দান ছিল সর্বাধিক। তাহাদের শ্রমের ফলেই এই বিশাল যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে স্বভাবতই শ্রমিক সম্প্রদায় নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিল। ক্রমেই তাহারা রাজনৈতিকক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইওরোপের রাজনীতিতে এক নবযুগের সূচনা করিল। রাজনৈতিকক্ষেত্রে শ্রমজীবিগণের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায়

শ্রমিকদের উন্নতি : নারীজাতির নূতন মর্যাদা লাভ

সমাজ-উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। নারীজাতিরও রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সমধিক বৃদ্ধি পাইল।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

এই যুদ্ধে যে ব্যাপক অর্থনৈতিক সর্বনাশ সাধিত হইয়াছিল তাহার ফল দেখা গেল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কটে। বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাদি পৃথিবীর সর্বত্র দেখা দিল। এই সকল অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের পথ উন্মুক্ত করিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপূরক হিসাবেই দেখা দিল।

অষ্টম অধ্যায়

ইওরোপের বাহিরে ইওরোপায় বিস্তারনীতি

(European Expansion beyond Europe)

নূতন দেশ ও সমুদ্রপথ আবিষ্কার : বাণিজ্য ও উপনিবেশ-বিস্তার

ইওরোপের বাহিরে ইওরোপীয় দেশগুলির বিস্তার রেনেসাঁস যুগ হইতেই শুরু হইয়াছিল। নূতন দেশ ও সমুদ্রপথ আবিষ্কারের সময় হইতেই স্পেন, হল্যাণ্ড, পোর্তুগাল এবং ক্রমে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ-বিস্তারের আগ্রহ হ্রাস : উনবিংশ শতাব্দীতে নূতন আগ্রহ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তারের ইচ্ছা কতক-পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঐ শতাব্দীতে আমেরিকাস্থ ইংরেজ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা ঘোষণা করে, ইহা ভিন্ন ব্রাজিল পোর্তুগালের আধিপত্য-অস্বীকার করে। ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কতকাংশ হারায়। এই সকল দৃষ্টান্তে ইওরোপীয় শক্তিগুলির সাম্রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ সাময়িকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বটে,

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে কতকগুলি নূতন কারণ উপস্থিত হইলে ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইওরোপের বাহিরে সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির এক নব উদ্যম শুরু হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির কারণগুলি ছিল প্রধানত—

কারণ : (১) অর্থনৈতিক, (২) রাজনৈতিক, (৩) সামাজিক, (৪) ধর্মনৈতিক ও (৫) সামরিক।

অর্থ নৈতিক

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইওরোপের সর্বত্র যন্ত্রপাতির এবং আধুনিক অর্থ-নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগের ফলে উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সব প্রচুর সামগ্রী বিক্রয়ার্থে নূতন নূতন বাজারের প্রয়োজন প্রত্যেক দেশেই উপলব্ধ হইল। যানবাহনের উন্নতির ফলে মাল রপ্তানির কোন অসুবিধা ছিল না। সুতরাং ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য-বিস্তার ও উপনিবেশ-স্থাপনের এক উৎকট উদ্যম দেখা দিল।

রাজনৈতিক

কিন্তু অর্থ নৈতিক কারণ ভিন্ন ইহার রাজনৈতিক কারণও ছিল। প্রত্যেক দেশই সাম্রাজ্য-বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সামরিক ঘাঁটি দখল করিবার এক দারুণ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইল। সাম্রাজ্যের বিশালতার উপরই দেশের শক্তি ও মর্যাদা নির্ভরশীল এইরূপ এক মনোবৃত্তি প্রত্যেক দেশেই দেখা দিল। সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির প্রতিযোগিতার সূত্রে দেশগুলির মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদেরও সৃষ্টি হইল।

সামাজিক

প্রত্যেক দেশে ক্রমবর্ধমান লোকসংসখ্যার জীবিকার ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না। ফলে, বেকারত্ব প্রায় সকল দেশেই এক জটিল সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা এবং বেকারদের সংস্থানের জন্যও সাম্রাজ্যবাদী নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল।

ধর্মনৈতিক

খ্রীষ্টধর্ম-যাজকদের ধর্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা এবং সেই সূত্রে বিভিন্ন দেশে তাহাদের যাতায়াতের ফলেও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি পাইল।

ইহা ভিন্ন অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ইওরোপীয়

দেশগুলির আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ ছিল না। স্বভাবতই ইওরোপীয়দের সহিত সংঘর্ষে এশিয়া বা আফ্রিকাবাসী আত্মরক্ষায় সক্ষম হইল না। ফলে, এই দুই মহাদেশের প্রায় সকল স্থানই ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া পড়িল।

সামরিক

এশিয়া মহাদেশে ইওরোপীয় সাম্রাজ্য-বিস্তার (European Expansion in Asia): ইংলণ্ড: [অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা মহাদেশে কানাডা, নিউ ব্রান্স্‌উইক্, নোভাস্কোশিয়া, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, প্রিন্স্ এডোওয়ার্ড দ্বীপ, হাড্‌সন উপসাগরীয় অঞ্চল, জেমেকা এবং অপরাপর কয়েকটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ ইংলণ্ডের অধীন ছিল। ভারতবর্ষে বাংলাদেশ, বোম্বাই এবং পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের কতক স্থান ইংরেজদের অধিকারে ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকাস্থ ইংরেজ উপনিবেশগুলির মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপিত হয়। এই সূত্রে ব্রিটিশ সরকার লর্ড ডার্‌হাম্‌কে কানাডার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী সংস্কারের সুপারিশের জন্য নিয়োগ করিলেন। ডার্‌হাম্ কানাডার শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থারই এক অতি দুর্বল এবং অকার্যকর অনুকরণ দেখিতে পাইলেন এবং সেখানে প্রকৃত দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের সুপারিশ করিলেন। আমেরিকার ১৩টি উপনিবেশের স্বাধীনতা-ঘোষণা তখনও ইংরেজদের স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, সুতরাং ডার্‌হাম্ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার উভয় অংশকে (Upper & Lower Canada) একত্রিত করিয়া একই আইনসভা ও শাসনব্যবস্থার অধীনে স্থাপন করা হইল। কিন্তু কানাডার একাংশ ছিল ফরাসীপ্রধান এবং অপরাংশ ছিল ইংরেজপ্রধান। এমতাবস্থায় নূতন শাসনব্যবস্থা কার্যকরী হইল না। লর্ড ডার্‌হাম্ উত্তর-আমেরিকার উপনিবেশগুলিকে একই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাধীনে স্থাপনের সুপারিশও করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকান এ্যাক্ট' পাস করিয়া কানাডার উভয় অংশ, নোভাস্কোশিয়া এবং নিউ ব্রান্স্‌উইক্—এই কয়টি উপনিবেশ লইয়া ডোমিনিয়ন-

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

ডার্‌হাম্ রিপোর্ট: 'ব্রিটিশ নর্থ আমেরিকান' উপনিবেশগুলির স্বায়ত্তশাসন লাভ

অব-কানাডা (The Dominion of Canada) নামে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করা হইল। এই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হইল অটওয়া (Ottowa)। এইভাবে আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিল। ফলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে এই সকল উপনিবেশের সম্পূর্ণ-ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ভয় দূরীভূত হইল।]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্যাপ্টেন কুক্ সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া ও নিউ-জিল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ এবং প্রাকৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। ওলন্দাজগণ সর্বপ্রথমে এই সকল স্থান আবিষ্কার করিলেও এই সকল স্থানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তাহারা কোনপ্রকার খবরাখবর সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্যাপ্টেন কুক্ কর্তৃক এই দুইস্থান পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতার পর সেখানে ইংলণ্ডের নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত ইংরেজগণের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এইরূপ নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত এবং স্বেচ্ছায় আগত ঔপনিবেশিকগণ সহ অস্ট্রেলিয়ার মোট ইংরেজ বাসিন্দার সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ হাজার। স্বেচ্ছায় যাহারা অস্ট্রেলিয়ায় চলিয়া আসিয়া-ছিল তাহাদের প্রতিবাদের ফলে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজ দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রেরণ করা বন্ধ হয়। ইতিমধ্যে ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হইলে দলে দলে ঔপনিবেশিকগণ অস্ট্রেলিয়ায় আসিতে থাকে। অল্পকালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ক্রমে এই অঞ্চলে নিউ সাউথ্ ওয়েলস্, কুইনস্ ল্যাণ্ড, ভিক্টোরিয়া, সাউথ্ অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টার্ণ অস্ট্রেলিয়া ও টাস্ম্যানিয়া —এই কয়টি উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। এই সকল উপনিবেশকে কানাডার শাসনব্যবস্থার অনুরূপ শাসনব্যবস্থার অধীনে স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ক্রমবর্ধমান অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশ লক্ষে পরিণত হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য

অস্ট্রেলিয়ার ১২ শত মাইল পূর্বে অবস্থিত নিউজিল্যাণ্ড নামক স্থানে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ইংরেজগণ উপনিবেশ বিস্তারে সচেষ্ট হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই উপনিবেশটি সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ অধিকারে আসে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ডকে ডোমিনিয়ন আখ্যা দেওয়া হয়।

নিউজিল্যাণ্ডে ব্রিটিশ অধিকার

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মারাঠাসংঘকে পরাজিত করিয়া ইংরেজগণ তাহাদের সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ শত্রুর পতন ঘটাইল। ইহার পর হইতে ভারতে ব্রিটিশ অধিকার উত্তরোত্তর বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। ১৮৪৫ হইতে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধের ফলে পাঞ্জাব এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা ইংরেজদের সম্পূর্ণ অধিকারে আসিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের দমনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের শেষ সশস্ত্র অভিযান বিফল হইল। পরবৎসর ঘোষণা দ্বারা ভারতের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ সরকার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন।

ভারতে ব্রিটিশ অধিকার

১৮৩৯-৪২ এবং ১৮৭৮-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য দুইটি আফগান যুদ্ধের ফলে আফগানিস্তানের উপর ইংরেজ প্রভাব বিস্তৃত হইল। ইহা ভিন্ন ভারতের নিকটবর্তী অন্যান্য স্থান, যথা ব্রহ্মদেশ, বেলুচিস্তান প্রভৃতিও ইংরেজদের অধীনে আসিল।

আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ ও বেলুচিস্তান

রাশিয়াঃ প্যারিসের সন্ধির (১৮৫৬) পর সাময়িকভাবে ইওরোপ মহাদেশে রুশ-বিস্তারনীতি রুদ্ধ হইলে রাশিয়া এশিয়া মহাদেশে সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতে চাহিল। পশ্চিমদিকে রাশিয়ার সাম্রাজ্য পারস্য ও আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইল এবং পূর্বদিকে চীনের অন্তর্দেশ পর্যন্ত রাশিয়ার আধিপত্য স্থাপিত হইল। পশ্চিমদিকে রাশিয়ার বিস্তৃতি ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিবে আশঙ্কায় ভারতীয় পররাষ্ট্র-নীতিতে নানাপ্রকার জটিলতা দেখা দিল। এই সূত্রেই আফগানিস্তানের সহিত ব্রিটিশ সরকারের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অবশেষে দুইটি আফগান যুদ্ধের দ্বারা আফগানিস্তানের সিংহাসনে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন একজন আমীরকে স্থাপন করা হইলে আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিস্তৃতি প্রতিহত হইল। উত্তরদিকে রুশ সাম্রাজ্য উরাল সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। চীনদেশের আভ্যন্তরীণ

আফগানিস্তান ও পারস্যের দিকে রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

উত্তরদিকে প্রশান্ত মহাসাগর ও পূর্বদিকে আমুর নদী পর্যন্ত রাশিয়ার বিস্তৃতি

দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাশিয়া পূর্বদিকে আমুর নদী পর্যন্ত সাম্রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হইল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া চীন হইতে ভ্লাডিভস্টক্ দখল করিল। 'এই বন্দরটি দখল করিবার ফলে রুশ সাম্রাজ্যের সীমা কোরিয়ার নিকটবর্তী হইল। ইহা ভিন্ন চীনদেশে রুশ-বিস্তারনীতির ফলে মাঞ্চুরিয়া রুশ সাম্রাজ্য কর্তৃক প্রায় পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িল।

ভ্লাডিভস্টক্ দখল

ফ্রান্স ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে লুই ফিলিপ্পির রাজত্বকালের শেষ দিকে ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আমল হইতেই ঔপনিবেশিক নীতি পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। লুই ফিলিপ্পি যে ঔপনিবেশিক নীতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে অনুসৃত হয়। ফ্রান্স কোচিন চীন (Cochin China) গ্রাস করে, ইহা ভিন্ন আনাম (Annam), কম্বোজ (Cambodia), টন্‌কিন্ (Tonkin) প্রভৃতি স্থানের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নিউ ক্যালিডোনিয়া (New Caledonia) ও নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ ফরাসী অধিকারে আসে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশরদেশের সহিত মিত্রতা-সূত্রে ফ্রান্স সুয়েজ খাল খনন করে। ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের সহায়তা এবং প্রধানত ফরাসী অর্থে সুয়েজ খাল খনন করা হইয়াছিল।*

কোচিন চীন, আনাম, কম্বোজ, নিউ ক্যালিডোনিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

সুয়েজ খাল খনন

জার্মানি ঃ ইতালি ঃ আমেরিকা ঃ হল্যাণ্ড ঃ বিস্‌মার্ক জার্মানিকে পরিতৃপ্ত দেশ (Satiated Country) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানিও ঔপনিবেশিক বিস্তারনীতি গ্রহণ করে। আফ্রিকা ও চীনদেশে জার্মানি ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। চীনদেশ ইওরোপীয়দের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইলে ইতালিও চীনদেশে সুযোগ-সুবিধা লাভে অগ্রসর হয়। ইহা ভিন্ন ইতালি আফ্রিকা মহাদেশে

চীনদেশে জার্মানি ও ইতালির স্বার্থান্বেষণ

---

* "The Canal architected by De Lesseps, financed mainly from France was formally opened by the Empress Eugene in 1869." Ketelbey, p. 480, footnote.

অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত সাম্রাজ্য-বিস্তৃতি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। আমেরিকা মন্‌রো নীতি ঘোষণা করিয়া ইওরোপীয় আক্রমণ হইতে আমেরিকা মহাদেশকে রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া আমেরিকার সাম্রাজ্যবৃদ্ধি এবং নিরাপত্তাসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা কর্তৃক অধিকৃত হয়। হল্যাণ্ডও এশিয়ায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-বিস্তারে পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। বোর্নিও, যাভা, সুমাত্রা, সেলিবিস, দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনির একাংশ প্রভৃতি স্থানে ওলন্দাজ সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকা কর্তৃক অধিকৃত

আফ্রিকা মহাদেশে ইওরোপীয় বিস্তারনীতি (Expansion of Europe in Africa) ঃ উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ভিন্ন আফ্রিকা মহাদেশেও ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে ইওরোপীয়দের মধ্যে তেমন কিছু জ্ঞান ছিল না। মিশরীয় ও কার্থেজীয় সভ্যতা সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি ইওরোপীয়দের জানা থাকিলেও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকা 'অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ' (Dark Continent). নামে অভিহিত হইত, কারণ আফ্রিকার উপকূল-রেখা ভিন্ন অভ্যন্তর দেশের কোন তথ্যই তখনও জানা ছিল না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে স্পেক্, লিভিংস্টোন্ ও স্টেন্‌লি প্রভৃতি ভূগোলজ্ঞদের অনুসন্ধিৎসার ফলে আফ্রিকার অভ্যন্তর দেশের খবর ইওরোপের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে। স্পেক্, লিভিংস্টোন্ প্রভৃতির আফ্রিকা-অভিযানের কাহিনী ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি করে। অল্পকালের মধ্যেই আফ্রিকা মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে শুরু হয়।

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ

উনবিংশ শতাব্দীতে স্পেক্, স্টেন্‌লি ও লিভিংস্টোনের আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তর আবিষ্কার

আফ্রিকায় আধিপত্য-বিস্তারে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড ছিলেন অগ্রণী। স্টেন্‌লির অভিযানের অব্যবহিত পরেই (১৮৭৬ খ্রীঃ) তিনি এক আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সমিতি স্থাপন করেন। এই

উত্তর
আটলাণ্টিক
মহাসাগর
ই ও রো প
ভূ ম ধ্য সা গ র
এ শি য়া
আলজিরিয়া
(ফরাসী)
সা হা রা
সেনিগাল (ফরাসী)
গাম্বিয়া (ব্রিটিশ)
সিয়েরালিওন
(ব্রিটিশ)
আবিসিনিয়া
লোহিত সাগর
দ ক্ষি ণ
আ ট লা ণ্টি ক
ম হা সা গ র
পোর্তুগীজ
পশ্চিম
আফ্রিকা
মাদাগাস্কার
পোর্তুগীজ
পূর্ব
আফ্রিকা
কেপ প্রদেশ
আফ্রিকায়
বৈদেশিক উপনিবেশ ও অধিকার
(অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে)
০ ৫০০ ১০০
মাইল
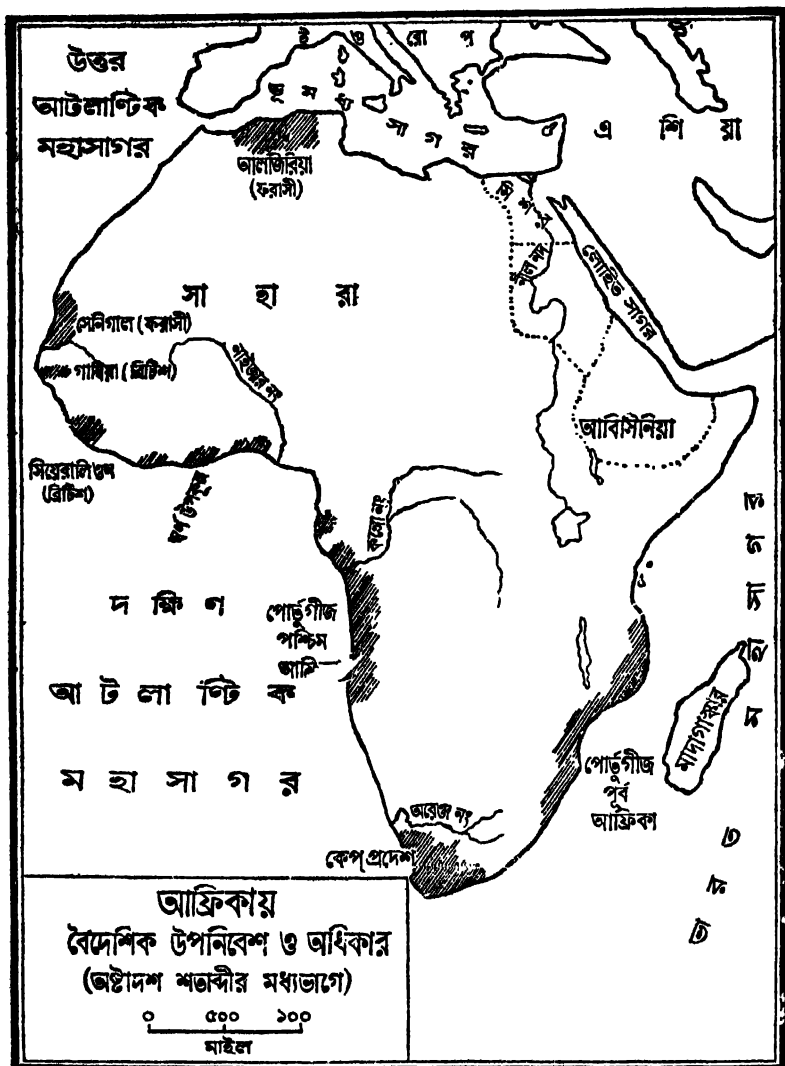
আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক সমিতির উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকার সভ্যতা, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশদ্‌ভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করা। কিন্তু এই সমিতির আন্তর্জাতিক চরিত্র অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইল। আফ্রিকা সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে জানিবার আগ্রহের পরিবর্তে প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আফ্রিকার তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া সেই দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বেলজিয়াম 'কঙ্গো স্বাধীন রাজ্য' (Congo Free State) নামক আফ্রিকার এক বিরাট অংশ দখল করিল। আয়তনে এই রাজ্যটি বেলজিয়ামের প্রায় দশগুণ ছিল। বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলি আফ্রিকা গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল।

বেলজিয়াম

আফ্রিকার উত্তর-উপকূলে আলজিরিয়া ছিল ফরাসী-অধিকৃত। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স টুনিস দখল করিল। ইহার পর ফ্রান্স মরক্কো দখল করিতে অগ্রসর হইল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মরক্কো ফরাসী অধিকারভুক্ত হইয়া গেল। ইহা ভিন্ন ফ্রান্স সমগ্র সাহারা এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সেনিগাল, কঙ্গোনদী ও আইভরি কোস্ট্ (Ivory Coast)-এর মধ্যবর্তী সকল স্থান অধিকার করিল। এইভাবে উত্তর-আফ্রিকায় ফ্রান্সের এক বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলের নিকটবর্তী মাদাগাস্কার দ্বীপটিও ফ্রান্স অধিকার করিয়া লইল।

ফ্রান্স

আফ্রিকা মহাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক এবং শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করিল ইংলণ্ড। উত্তরে কাইরো হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত প্রায় সকল স্থান ইংলণ্ডের অধীনে আসে। একমাত্র জার্মান পূর্ব-আফ্রিকা এই বিশাল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ছিন্ন করিয়াছিল (৯৫ পৃঃ ম্যাপ দ্রষ্টব্য)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান পূর্ব-আফ্রিকার Mandate ব্রিটেনকে দেওয়া হইলে এই যোগাযোগ সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই বিশাল ঐক্যবদ্ধ ভূখণ্ড ভিন্ন গাম্বিয়া, সিয়েরালিয়োন, গোল্ড্‌কোস্ট, নাইজেরিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের একাংশও ব্রিটিশ অধিকারে আসে। দক্ষিণ-আফ্রিকাস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ অঞ্চল, নাটাল, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রিভার

ব্রিটেন

কলোনি লইয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়ন-অব-সাউথ্‌ আফ্রিকা (Union of South Africa) স্থাপিত হয়।

ক্ষুদ্র দেশ পোর্তুগালও আফ্রিকা দখলের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বেলজিয়ান কঙ্গোর দক্ষিণে পোর্তুগাল বহুকাল পূর্ব হইতেই কয়েকটি ক্ষুদ্র স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সকল স্থানের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া পোর্তুগাল এঙ্গোলা নামক এক বৃহৎ প্রদেশ গড়িয়া তোলে। আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলে মোজাম্বিক্‌ বা পোর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকা নামক উপনিবেশ স্থাপিত হয়। পোর্তুগালের ইচ্ছা ছিল পোর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকা ও পোর্তুগীজ পশ্চিম-আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা, কিন্তু ব্রিটিশ প্রতিযোগিতার ফলে সেই আশা সফল হয় নাই।

পোর্তুগাল

আফ্রিকাগ্রাসের প্রতিযোগিতায় ইতালি অপরাপর ইওরোপীয় দেশ অপেক্ষা বিলম্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তথাপি ইতালি ইরিট্রিয়া, এবং ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড দখল করিতে সমর্থ হয়। ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত যুদ্ধের ফলে ইতালি ট্রিপোলি ও সাইরেনেইকা দখল করে। ঐ সময়ে আবিসিনিয়া দখলের চেষ্টা করিয়া ইতালি অকৃতকার্য হয়, কিন্তু ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনির আমলে ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকৃত হইয়াছিল।

ইতালি

বিস্‌মার্কের মন্ত্রিত্বকালে জার্মানি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু ক্রমে বিস্‌মার্ক আফ্রিকায় সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির নীতি গ্রহণ করেন। আফ্রিকা মহাদেশে জার্মানি দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা, ক্যামেরুন্‌স্‌ ও টগোল্যাণ্ড দখল করে।

জার্মানি

স্পেন আফ্রিকা মহাদেশে উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটি প্রদেশ এবং জিব্রাল্টারের বিপরীত দিকে আফ্রিকার উপকূলে কতকস্থানের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইল।

স্পেন

এইভাবে অসহায় আফ্রিকাবাসীর মাতৃভূমি ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে আহুত হইল।

আফ্রিকায় বৈদেশিক উপনিবেশ ও অধিকার (১৯১৪খ্রীঃ)
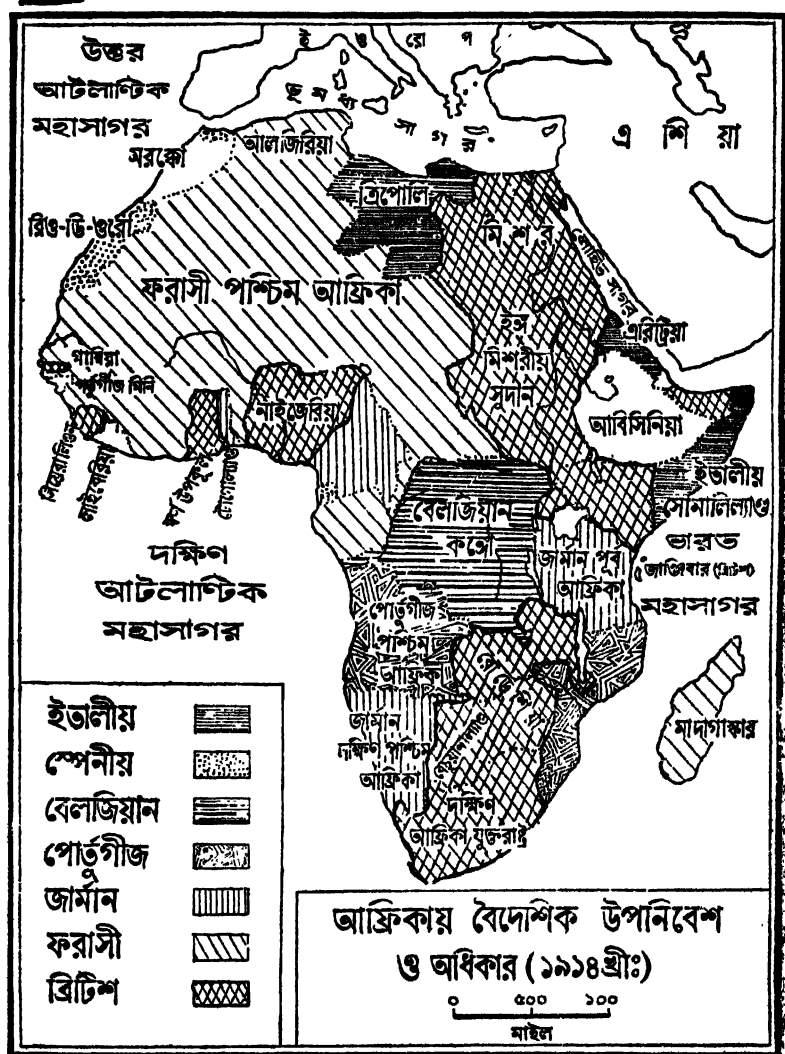
নবম অধ্যায়

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগ, ১৯১৯-১৯৩৯

(Between the Two World Wars)

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে যুগ অতিবাহিত হইয়াছিল উহা প্রকৃতপক্ষে শান্তির যুগ ছিল না। উহাকে যুদ্ধবিরতি বা যুদ্ধের প্রস্তুতির যুগ বলিয়া বর্ণনা করিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এই যুগে একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছিল, অপর দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নানা-প্রকার বিবর্তন সাধিত হইতেছিল। বর্তমান জগতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করিতে হইলে ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুড়ি বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

১৯১৯-১৯৩৯ খ্রীঃ যুদ্ধবিরতির যুগ, শান্তির যুগ নহে

যুদ্ধের বীভৎসতা ও যুদ্ধপ্রসূত দারিদ্র্য ও দুর্দশা মানুষকে সাময়িকভাবে যুদ্ধের উপর বীতশ্রদ্ধ করিয়াছে সত্য, কিন্তু অল্পকাল পরেই যুদ্ধের বীভৎসতার ছবি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়া পুনরায় মানুষের যুদ্ধামোদী করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ যুদ্ধের পর শান্তি এবং শান্তির পর যুদ্ধ চলিয়া আসিয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও বীভৎসতা সাময়িকভাবে মানুষের মনে যে শান্তিস্পৃহা জাগাইয়াছিল তাহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা : সাময়িক-ভাবে মানুষের শান্তি-স্পৃহা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স (The League of Nations) : আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইওরোপে শান্তি বজায় রাখিবার প্রথম চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ (Concert of Europe) গঠনে। কিন্তু সংকীর্ণ স্বার্থপর নীতি, ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টির অভাবহেতু এই প্রতিষ্ঠান তেমন কার্যকরী হয় নাই। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার নামে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রকাশ রুদ্ধ করা-ই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ : আন্তর্জাতিক শান্তির প্রথম চেষ্টা

রুশ জার প্রথম আলেকজাণ্ডার অবশ্য একটি আদর্শবাদী পরিকল্পনা তাঁহার পবিত্র চুক্তিতে কার্যকরী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনা বাস্তব জগতের পক্ষে উপযোগী ছিল না বলিয়াই পবিত্র চুক্তি (Holy Alliance) কোন প্রকৃত সাফল্য লাভ করে নাই। যাহা হউক, কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ গঠনে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের স্বীকৃতি আমরা দেখিতে পাই।

আন্তর্জাতিক শান্তি-রক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা

ইহা ভিন্ন প্যারিস সম্মেলনে (১৮৫৬) ক্রিমিয়ান যুদ্ধপ্রসূত সমস্যার সমাধান ভিন্ন আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করা হইয়াছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের কংগ্রেস রুশ-তুর্কী দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিয়া ৪০ বৎসরেরও অধিককাল ইওরোপ মহাদেশকে যুদ্ধ হইতে মুক্ত রাখিবার সহায়তা করিয়াছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের হেইগ কন্‌ফারেন্স (Hague Conference) সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছিল। উপরোক্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যুদ্ধ সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, তথাপি স্থায়ী শান্তি স্থাপনে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা যে ক্রমেই অধিকভাবে উপলব্ধ হইতেছিল এই সকল চেষ্টার মধ্যে উহা প্রকাশ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপের অনুকরণে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স (League of Nations) নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে। মানব ইতিহাসের সকল স্তরেই পশুশক্তির উপর অত্যধিক আস্থা স্থাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। অথচ এই পশুশক্তি জগতের সমস্যাগুলির সমাধান না করিয়া আরও জটিলতর কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে এবং করিয়া থাকে। এই কারণে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স মানুষের যুদ্ধের মনোবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করিয়া মানুষকে প্রকৃত শান্তিকামী করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এই শান্তির মনোবৃত্তি গঠনের জন্য তাঁহার বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points)-এর উপর লীগ-অব-ন্যাশন্‌স স্থাপনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন।

ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদির মধ্যেই লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের শর্তাদি (Covenant)* সন্নিবিষ্ট ছিল। এই কভেনাণ্ট-এর মূল সূত্র ছিল যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিয়া এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সন্ধির শর্তাদি আন্তরিক এবং সম্পূর্ণভাবে মানিয়া চলিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা।

মূল উদ্দেশ্য : (১) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা

এই কভেনাণ্ট (Covenant)-এর দশম শর্তে বলা হইয়াছিল যে, লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য-দেশগুলির মধ্যে যদি কোন পরস্পর বিবাদ দেখা দেয় তাহা হইলে সেই বিবাদ মীমাংসার জন্য তাহারা লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ করিবে এবং মধ্যস্থতার অন্তত তিন মাসের মধ্যে কোনপ্রকার সামরিক দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবে না। ষোড়শ শর্তে বলা হইয়াছিল যে, কোন সদস্য-দেশ যদি লীগের কভেনাণ্ট উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধ সৃষ্টি করে তাহা হইলে অপরাপর সদস্য-দেশগুলি সেই যুদ্ধ তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল বলিয়া ধরিয়া লইবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কভেনাণ্ট-ভঙ্গকারী দেশের সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক যোগাযোগ ছিন্ন করিবে। প্রয়োজনবোধে সদস্য-দেশগুলি লীগের কভেনাণ্ট রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সামরিক নৌ এবং বিমান বহরের সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত থাকিবে।

(২) পরস্পর বিবাদে লীগের মধ্যস্থতা গ্রহণ

(৩) লীগের কভেনাণ্ট-ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক ও সামরিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

* "The High Contracting parties,

In order to promote international co-operation and to achieve international peace and security,

By the acceptance of obligations not to resort to war, by the prescription of open, just and honourable relations between nations,

By firm establishment of the understanding of international law as actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another,

"Agree to this Covenant of the League of Nations." Preamble to the Covenant of the League of Nations. Langsam, p. 124.

লীগ-অব-ন্যাশনসের একটি সাধারণ সভা (Assembly), একটি কাউন্সিল (Council) ও একটি স্থায়ী দপ্তর (Secretariate) গঠন করা হইল। এই দপ্তরের কার্যাদি পরিচালনার জন্য একজন সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হইলেন। এই প্রতিষ্ঠানের একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘ গঠন করা হইল। নিরপেক্ষ দেশ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের জেনিভা শহর এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যস্থল হইল।

লীগ-অব-ন্যাশনসের সংগঠন

সাধারণ সভা লীগের কভেনাণ্টে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক সদস্য-দেশ তিনজন প্রতিনিধি সেই সভায় প্রেরণ করিতে পারিত, কিন্তু সদস্য-দেশের একটির বেশি ভোট দিবার অধিকার ছিল না। কাউন্সিলে পাঁচটি দেশের সদস্য ছিল—গ্রেটব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি ও জাপান। এই পাঁচটি দেশের প্রতিনিধি ভিন্ন অন্যান্য সদস্য-দেশ হইতে আরও চারজন সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। কাউন্সিল ছিল লীগ-অব-ন্যাশনসের কার্যনির্বাহক সভার ন্যায়। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয় ভারপ্রাপ্ত ছিল। এই বিচারালয়ে কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরিত আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বের বিচার হইত। আন্তর্জাতিক শ্রমিকসংঘের কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-সংক্রান্ত সমস্যা-সমাধানে সহায়তা দান করা।

বিভিন্ন অংশের কার্যাদি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট লীগ-অব-ন্যাশনস গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বটে, কিন্তু মার্কিন সরকার লীগ-অব-ন্যাশনসে যোগদানের চুক্তি অনুমোদন না করায় আমেরিকা কাউন্সিলের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লীগ ত্যাগ

লীগ-অব-ন্যাশনসের আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার কার্যাদি (Activities of the League of Nations for World peace) : আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার ব্যাপারে বা আন্তর্জাতিক সমস্যা-সমাধানে সর্বদাই যে ন্যায় ও সততার আদর্শ মানিয়া চলা হইয়াছিল এমন নহে। একাধিক ক্ষেত্রে লীগ-অব-ন্যাশনসের কার্য গৃহীত নীতি-বিরোধী হইয়াছিল। (১) মেক্সিকোর বিরুদ্ধে নিকারাগুয়া (Nicaragua)-র অভিযোগ, (২) চীনদেশের উপর ব্রিটেন যে অন্যায়মূলক

লীগ-অব-ন্যাশনসের পক্ষপাতিত্ব

চুক্তি বলপূর্বক চাপাইয়াছিল সেই প্রশ্নের মীমাংসা, (৩) ইঙ্গ-মিশরীয় বিবাদের মীমাংসা প্রভৃতি বহুক্ষেত্রে লীগ-অব-ন্যাশন্সের সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ছিল। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, লীগ-অব-ন্যাশন্স আন্তর্জাতিক শান্তি যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে এইরূপ বহু বিবাদের মীমাংসা করিয়া যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

(১) ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে সীমারেখা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে লীগ একটি 'সীমা নির্ধারণ কমিশন' (Boundary Commission) নিযুক্ত করে। এই কমিশন যখন কার্যে রত ছিল ঐ সময়ে তুরস্কের অধীন কুর্দ নামে এক দুর্ধর্ষ জাতির লোক বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তুর্কী সরকার এই বিদ্রোহ দমন করিতে আরম্ভ করিলে কুর্দগণ ইরাক-তুরস্কের সীমান্তে পলাইয়া আসে এবং সেখান হইতে তুর্কী সৈন্যদের সহিত খণ্ডযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। লীগ-অব-ন্যাশন্স একটি দ্বিতীয় কমিশন নিযুক্ত করিয়া এই বিদ্রোহ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং এই সকলের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত ইরাক ও তুরস্কের সীমা নির্ধারিত হয়। ব্রিটেন, তুরস্ক ও ইরাক এই নির্ধারিত সীমা রক্ষা করিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করে (১৯২৬)। (২) গ্রীস ও বুলগেরিয়ার মধ্যে সর্বদাই পরস্পর আক্রমণ ও সীমা লঙ্ঘন চলিতেছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একজন গ্রীক সেনানায়ক ও তাঁহার একজন অনুচর এইরূপ এক ঘটনায় প্রাণ হারাইলে গ্রীস বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে সৈন্য প্রেরণ করে। লীগ-অব-ন্যাশন্স এই বিষয়ে তদন্তের পর গ্রীসকে সৈন্য অপসারণে এবং বুলগেরিয়ার সীমা-লঙ্ঘনের অপরাধে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করে। গ্রীস অবশ্য এই সকল মানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে ইতালি যখন গ্রীসের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল তখন লীগ-অব-ন্যাশন্স এইরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই বলিয়া গ্রীস স্বভাবতই লীগ-অব-ন্যাশন্সের ন্যায়-বিচার সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। (৩) লিথুনিয়ার সরকার পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে 'যুদ্ধ পরিস্থিতি' (State of War) ঘোষণা করিলে লীগ-অব-ন্যাশন্সের হস্তক্ষেপের ফলে উহা প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইতে পারে নাই। এই দুই দেশে তথাপি মনোমালিন্য রহিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধের

ইরাক ও তুরস্কের সীমা-সংক্রান্ত বিবাদের শান্তি মীমাংসা

গ্রীস ও বুলগেরিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা

পরিস্থিতি লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের তৎপরতায় দূর হইয়াছিল। (৪) (ক) লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের কর্তৃত্বাধীনে প্রধানত জার্মান আক্রমণ হইতে ফ্রান্সের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'জেনিভা প্রোটোকোল' (Geneva Protocol or Protocol for the Pacific settlement of International Disputes) নামে একটি দলিল প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

লিথুনিয়া ও পোলাণ্ডের মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ সৃষ্টিতে বাধাদান

জেনিভা প্রোটোকোল

এই দলিলের মূল কথা ছিল, কোন সামরিক দ্বন্দ্ব শুরু হওয়ার চারদিনের মধ্যে লীগের কাউন্সিল কোন্ পক্ষ আক্রমণকারী তাহা স্থির করিবে এবং লীগের অপরাপর সদস্যগণ আক্রান্ত দেশকে রক্ষা করিবার জন্য সামরিক সহায়তা দানে বাধ্য থাকিবেন। কিন্তু ব্রিটেন ও ব্রিটেনের ডোমিনিয়নগুলি এই প্রোটোকোল স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় স্বভাবতই ইহা পরিত্যক্ত হয়। শান্তিরক্ষার চেষ্টা হিসাবে জেনিভা প্রোটোকোল-এর ইঙ্গিতের যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। (খ) ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি (Locarno Pact) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি ও বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যবর্তী সীমারেখা যাহা ভার্সাই-এর সন্ধি দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছিল উহার নিরাপত্তা স্বীকৃত হয়। ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইতালি এই চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন জার্মানির সহিত ফ্রান্স, বেলজিয়াম, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে মধ্যস্থতার দ্বারা উহার নিষ্পত্তি করা হইবে এই শর্তই স্বীকৃত হইয়াছিল। লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর করিবার পর জার্মানিকে লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের স্থায়ী সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

লোকার্ণো চুক্তি : জার্মানিকে লীগের সদস্যহিসাবে গ্রহণ

(৫) লীগ-অব-ন্যাশন্‌স সুইডেন ও ফিনল্যাণ্ডের বিবাদ, জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের বিবাদ, সার্বিয়া ও আলবেনিয়ার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল বিবাদের মীমাংসায় সামরিক শক্তি প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হয় নাই, একমাত্র সার্বিয়ার ক্ষেত্রে সামরিক শক্তি প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন প্রয়োজন হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, Mandated স্থানসমূহ এবং ডানজিগ, সার অঞ্চল, দার্দানেলিজ ও বস্‌ফোরাস প্রণালী-সংক্রান্ত ...না বিষয়েও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক

লীগের অপরাপর কার্যাদি

বৈঠকের অধিবেশন, আফিং, ক্রীতদাস ব্যবসায়, শ্রমিক সমস্যা প্রভৃতি নানাবিষয়ে এবং অস্ট্রিয়াকে অর্থ নৈতিক সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার ব্যাপারে লীগের দান নেহাৎ কম নহে। আন্তর্জাতিক বিচারালয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট ২৬টি বিবাদের বিচার করিয়াছিল।

লীগ-অব-ন্যাশনসের ব্যর্থতা (Failure of the League of Nations)ঃ উপরোক্ত কার্যকারিতা সত্ত্বেও লীগ-অব-ন্যাশনস প্রকৃত সাফল্য লাভে সমর্থ হয় নাই, কারণ এই প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি সহজাত দুর্বলতা ছিল।

লীগের ব্যর্থতার কারণঃ (১) পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান

প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানের কার্যাদি পরীক্ষামূলকভাবে চলিতেছিল। স্বভাবতই লীগ-অব-ন্যাশনসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন দেশেরই তেমন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার প্রয়োজন কেহ তেমন উপলব্ধি করে নাই। দ্বিতীয়ত, জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে আন্তর্জাতিক স্বার্থ ত্যাগ করিবার মত মনোবৃত্তি তখন কোন দেশেরই ছিল না। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে স্বভাবতই প্রত্যেক দেশ লীগের শর্তাদি ও লীগের মূল নীতির অবমাননা করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। তৃতীয়ত, কয়েকটি সাধারণ বিষয় ভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়েই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সর্ববাদি-সম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার প্রয়োজন—এই নীতির ফলে কোন একটি দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। চতুর্থত, লীগ-অব-ন্যাশনসের নিজ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার মত কোন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না থাকায় লীগের পক্ষে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব ছিল না। লীগের নিজস্ব কোন-প্রকার সামরিক শক্তি না থাকায় লীগের সিদ্ধান্ত সুপারিশ হিসাবে মনে করা হইত এবং উহা গ্রহণ করা-না-করা দেশগুলির নিজেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। ফলে, ইতালি কর্তৃক গ্রীস আক্রান্ত হইলে লীগ ইতালিকে নিরস্ত করিবার যে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা ইতালি সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। মাঞ্চুরিয়া দখল করিতে জাপানকে লীগ কোনভাবেই নিরস্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। পঞ্চমত, লীগের সাফল্যের একমাত্র উপায় ছিল সদস্য-দেশগুলির আন্তরিক এবং নৈতিক সাহায্য ও

(২) জাতীয় স্বার্থের সম্মুখে আন্তর্জাতিক স্বার্থ নাশ

(৩) কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা

(৪) লীগের সামরিক শক্তির অভাব

(৫) সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আন্তরিক সহায়তার অভাব

সহায়তা। কিন্তু নিজ নিজ স্বার্থ জড়িত থাকিলে কোন দেশই আন্তর্জাতিক শান্তি বা লীগের নীতি মানিয়া চলিবার প্রশ্নের ধার ধারিত না। এই সকল কারণে ক্রমেই লীগ দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইতে লাগিল। ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল (১৯৩৫), জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল (১৯৩৮) প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই লীগ কোন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স স্বভাবতই ভাঙ্গিয়া গেল।

(৬) আমেরিকার ন্যায় বিশাল দেশের এই সংস্থায় যোগদানে অসম্মতি এবং পরাজিত জার্মানিকে উহার সদস্য হিসাবে গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রথম হইতেই লীগ-অব-ন্যাশন্‌স-এর দুর্বলতার সূচনা করিয়াছিল।

(৭) সামরিক নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) ছিল লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের একটি মূল নীতি। এই উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স-এর অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছিল। এই অধিবেশনে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ যুদ্ধজাহাজ, বিমানবাহী জাহাজ প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়, কিন্তু ইংলণ্ড ছোট যুদ্ধজাহাজের ও ফ্রান্স সাবমেরিণের সংখ্যা হ্রাস করিতে রাজী হয় নাই। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর নিরস্ত্রীকরণের জন্য এক বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স (Disarmament Conference) আহূত হয়। এই কন্‌ফারেন্সে জার্মানি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য অন্তত ফ্রান্সের সমপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অধিকার দাবি করে। অপরপক্ষে জার্মানির সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য ফ্রান্স জার্মানি অপেক্ষা অধিক পরিমাণ সামরিক শক্তি রাখিবার দাবি করে। এই সূত্রে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে জার্মানি এই অধিবেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং ইহার অল্প-কাল পরেই ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক করিয়া দেশের সামরিক শক্তি-বৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। ফ্রান্স ও জার্মানির বিরোধের ফলে পৃথিবীর নিরস্ত্রী-করণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

নিরস্ত্রীকরণের চেষ্টা : ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স ও বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স

নিরস্ত্রীকরণ নীতির ব্যর্থতা

যুদ্ধোত্তর ইতালি : ফ্যাসিজম-এর উত্থান (Post-War Italy : Rise of Fascism) : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজনৈতিকক্ষেত্রে

শতধা বিচ্ছিন্ন ইতালি ভিয়েনা চুক্তির শর্তাদি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু রাজনৈতিক একতালাভে সমর্থ হইলেও জাতীয় জীবনে কোন-প্রকার উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন ইতালির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিভিন্ন অংশের স্থানীয় স্বার্থপরতা ও প্রাদেশিক মনোবৃত্তি ইতালীয় জাতিকে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে বাধা দিল। জাতীয় মর্যাদা বা জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বলিয়া কিছুই ইতালীয় জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। ইতালীয়গণ ছিল যেমন স্ব স্ব প্রধান তেমনি হুজুকপ্রিয়। অধ্যবসায় ও নিরপেক্ষ বিচারক্ষমতা তাহাদের ছিল না। জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরী করিবার পক্ষে যে সকল গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন সেগুলির কিছুই তাহাদের ছিল না।

ঐক্যবদ্ধ ইতালির জাতীয়তাবোধ ও মর্যাদাবোধের অভাব

জাতির এইরূপ অক্ষমতার সহিত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কুফল মিলিত হইলে ইতালিতে এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির যে স্বার্থনাশ হইয়াছিল এবং ইতালিকে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল সেই তুলনায় প্যারিস শান্তি সম্মেলন হইতে ইতালি অতি সামান্য ক্ষতিপূরণই পাইয়াছিল। ফলে, ইতালীয়দের মনে প্যারিস শান্তি সম্মেলন কর্তৃক স্থাপিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতালীয় জাতির মনোভাব যখন এইরূপ তখন যুদ্ধোত্তর সমস্যা-প্রসূত অভাব-অনটন, বেকারত্ব ও আর্থিক দুরবস্থা এক দারুণ অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছিল। জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির ফলে মজুরী বাড়াইবার জন্য ধর্মঘট লাগিয়াই ছিল। এইরূপ পরিস্থিতি সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্যের পক্ষে খুব উপযোগী ছিল। ফলে, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল যে, রাশিয়ার ন্যায় ইতালিও উগ্র সমাজ-তান্ত্রিক দেশে পরিণত হইয়া যাইবে এইরূপ ধারণা সকলেরই মনে জাগিতেছিল। 'লেনিন দীর্ঘজীবী হউন' (Long live Lenin), 'রাজার পতন হউক' (Down with the king) প্রভৃতি ধ্বনি ইতালির আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিতেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ইতালির দুর্দশা

সমাজতান্ত্রিক প্রচার-কার্যের প্রভাব

বিপ্লবী পন্থায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সমাজতন্ত্র স্থাপনের আগ্রহ

সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। কৃষকগণ জমিদারের খাজনা দেওয়া বন্ধ করিল। বহুস্থানে বলপূর্বক জমিদারের জমি কৃষকরা দখল করিয়া লইল। শহর এলাকায় শিল্পপতিগণ মজুরী হ্রাস না করিলে এবং শ্রমিকরা অধিক সময় কাজ না করিলে কারখানা চালু রাখা অসম্ভব বলিয়া জানাইলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কারখানা-পরিচালনার ভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই শ্রমিক ও কৃষকরা তাহাদের কর্মপন্থার ভুল বুঝিতে পারিল। জোরজবরদস্তি দ্বারা কারখানা বা জমি দখল করা গেলেও সেগুলি পরিচালনা করা তত সহজ নয়। অনভিজ্ঞ কৃষক ও শ্রমিকগণ ক্রমেই বুঝিতে পারিল যে, কৃষক-মজদুর সরকার স্থাপন ও পরিচালন তেমন সহজ হইবে না। প্রচলিত পার্লামেণ্টারী প্রথা যেমন দেশের নানাবিধ জটিল সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় নাই, কৃষক-মজদুরদের পরিচালিত সরকারও শাসনকার্যে অনুরূপ অক্ষম হইবে ইহা উপলব্ধি করিয়া ইতালিবাসী পুনরায় একটি কার্যকরী সুদক্ষ শাসনব্যবস্থার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। শিক্ষিত সমাজ ও যুব সমাজ ইতালির আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থায় একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা সরকারের আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যেও নূতন কোন শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হউক এই ইচ্ছা দেখা দিয়াছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে ফ্যাসিস্ট্ (Fascist) দলের উত্থান অতি সহজ হইল। জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিবার এবং শাসন-ব্যবস্থায় সংহতি আনিবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন বেনিটো মুসোলিনি।

কৃষক ও শ্রমিকদের বিপ্লবী পন্থা অবলম্বন

কৃষক-মজদুরদের অকৃতকার্যতা

সরকারের প্রতি শিক্ষক ও যুব সমাজের অশ্রদ্ধা

মুসোলিনির নেতৃত্ব

বেনিটো মুসোলিনি (Benito Mussolini): ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমানা (Romagna) নামক স্থানে বেনিটো মুসোলিনির জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী কর্মকার। তাঁহার মাতা ছিলেন একজন শিক্ষয়িত্রী। মাতার ইচ্ছানুসারে বেনিটো মুসোলিনি শিক্ষা সমাপন করিয়া নর্মাল ট্রেনিং পাস করেন এবং স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। মুসোলিনির উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া পূর্ণ হওয়ার কোন উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করিয়া সুইট্জারল্যাণ্ডে গমন করেন। সেখানে আরও জ্ঞানার্জনে

বাল্যজীবন

তিনি রত থাকেন এবং বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কিছুকাল থাকিবার পর এক সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সরকারের বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সরকারী আদেশে মুসোলিনি সেই দেশ ত্যাগ করিয়া ইতালিতে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ

ইতালিতে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ পূর্ণ উদ্যমেই চালাইতে লাগিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ট্রিপোলি-টানিয়া দখলের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি প্রকাশ্য-ভাবে তাহার বিরোধিতা আরম্ভ করেন। এজন্য তাঁহাকে অল্পকালের জন্য আটক রাখা হয়। পর বৎসর (১৯১২) মুসোলিনি Avanti নামে এক সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে মুসোলিনি ইতালির পক্ষে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকাই উচিত বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতালীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। সমাজতান্ত্রিকগণ যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে ছিলেন না। সুতরাং মুসোলিনি যুদ্ধে যোগদানের যুক্তি সমর্থন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাকে Avanti নামক সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক পদ হইতে বিতাড়িত করা হয়। মুসোলিনি নিজে যুদ্ধে যোগদানের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য Il Popolo d' Italia নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি স্বয়ং যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে কার্য গ্রহণ করেন। আঘাত-প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি সামরিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইলেন এবং সরকারের সহায়তায় পুনরায় Il Popolo d' Italia পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া যুদ্ধের স্বপক্ষে জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়েই তাঁহার বাগ্মিতা জনসাধারণের উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও মুসোলিনি

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি সেনাবাহিনী হইতে যুদ্ধশেষে কর্মচ্যুত সৈনিকদের এবং অপরাপর যাঁহারা দেশের মঙ্গলসাধনে আগ্রহান্বিত এইরূপ ব্যক্তিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলন এক বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণ করে। সমাজের প্রতি স্তর হইতেই সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ, শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রম, উত্তরাধিকার কর, মূলধনীদের উপর কর, চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত,

যুদ্ধোত্তরকালে মুসোলিনির কার্যাদি

সেনেট বিলোপ, জাতীয়সভা আহ্বান, গোলাবারুদের কারখানা জাতীয়করণ এবং রেলপথ প্রভৃতি কোন কোন শিল্প শ্রমিকদের পরিচালনাধীনে স্থাপন প্রভৃতি দাবি করিয়া এক দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইল। এই দাবি বিশেষভাবে যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈনিকদের জন্যই প্রচার করা হইতে লাগিল। মুসোলিনি যে সম্মেলনের অধিবেশনে তাঁহার নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন উহার অধিকাংশ সভ্যই Fasci'd azione নামে এক সংঘের সহিত জড়িত ছিল। এই নাম হইতেই ফ্যাসিস্ট্ (Fascist) নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

ফ্যাসিস্ট্ দলের উৎপত্তি

মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট্ দল আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালীয় শাসনব্যবস্থা তখন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ায় দেশে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। ফ্যাসিস্ট্ দল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার দায়িত্ব নিজ হইতেই গ্রহণ করিল। যেখানেই কোনপ্রকার অরাজকতা বা গোলযোগ দেখা দিল সেখানেই ফ্যাসিস্ট্ দল বলপূর্বক তাহা দমন করিতে লাগিল। সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্ বিপ্লব-বিরোধী ফ্যাসিস্ট্গণ সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্টদিগকে আক্রমণ করিয়া চলিল। এই আক্রমণাত্মক নীতি 'Squadrism' নামে পরিচিত ছিল। ১৯২০ ও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মোট এক শতেরও অধিক খণ্ডযুদ্ধ এই সকল বিরোধী দলের মধ্যে ঘটিয়াছিল।

সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্ দলের সহিত ফ্যাসিস্ট্দের বিরোধ

যুদ্ধোত্তর ইতালির শাসনভার ছিল প্রথমে মন্ত্রী নিটি (Nitti) এবং পরে মন্ত্রী গিওলিটি (Giolitti)-এর অধীনে। কিন্তু ইঁহারা কেহই দেশের অরাজকতা দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দ্বারা দেশের যুদ্ধোত্তর দুর্দশারও কোন উপশম করিতে তাঁহারা সমর্থ হইলেন না। এমতাবস্থায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মুসোলিনি ও তাঁহার ফ্যাসিস্ট্ দল দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্দের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ শুরু করিলে সরকার অসহায়ভাবে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

নিটি ও গিওলিটির মন্ত্রিত্ব

মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট্ দল সামরিক কুচ্‌কাওয়াজ করিত এবং কাল পোশাক (Black shirt) পরিত। সামরিক অভিজ্ঞতা ও সামরিক কুচ্‌কাওয়াজ তাহাদিগকে সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট্দের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। স্বভাবতই

ফ্যাসিস্ট্ দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি

এই অন্তর্দ্বন্দ্বে ফ্যাসিস্ট্ দলই জয়লাভ করিল। এইভাবে ফ্যাসিস্ট্ দল ক্রমেই এক অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিল। তাহাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এদিকে ইতালীয় সরকারের দুর্বলতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সরকার পক্ষ মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য আহ্বান জানাইলেন। মুসোলিনি এই সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন। তিনি এইভাবে শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিতে রাজী ছিলেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুর্বল ইতালীয় সরকারের উচ্ছেদ সাধন করিয়া শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট্ বাহিনীসহ রোম দখল করিলেন। রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল মুসোলিনিকে বাধা দান করিয়া দেশে অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি করিতে চাহিলেন না। তিনি মুসোলিনিকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর মুসোলিনি তাঁহার ফ্যাসিস্ট্ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া ইতালির শাসনভার গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় হইতে মুসোলিনিই ইতালীয় রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হইয়া উঠিলেন, তাঁহার উপাধি হইল II Duce. রাজা স্বভাবতই ক্রমে নেপথ্যে সরিয়া গেলেন।

মুসোলিনির 'Coup d'etat'

ফ্যাসিস্ট্ দলের ক্ষমতা লাভ

ফ্যাসিস্ট্ দলের শাসনক্ষমতা লাভের পশ্চাতে জনমতের সক্রিয় সহায়তা না থাকিলেও, জনমত উহার বিরোধী ছিল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় চালিত শাসনব্যবস্থার অকর্মণ্যতায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ফ্যাসিস্ট্ দল জনস্বার্থ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিল। সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত সৈন্যগণ ফ্যাসিজমের পক্ষপাতী ছিল। সুতরাং মুসোলিনি যখন শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন তখন জাতির সমর্থন যে তাঁহার পশ্চাতে ছিল একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।*

জনমতের সমর্থন

* "It is fairly evident that Fascism would not have succeeded if it had not enjoyed the passive approval of a large, perhaps, preponderant section of public opinion". Riker, p. 757.

মুসোলিনির ঘোষণা হইতেই ফ্যাসিস্ট্‌ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেশবাসীকে জানাইয়া দিলেন—আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদা বৃদ্ধি-ই হইবে ফ্যাসিস্ট্‌ শাসনের মূল উদ্দেশ্য। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য আইন-কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা, সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ব্যক্তি-মাত্রেরই প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তি রাষ্ট্র তথা সমষ্টির স্বার্থরক্ষার্থে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করিবে। সমষ্টি ভিন্ন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা স্বার্থ স্বীকৃত হইবে না। অর্থনৈতিকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকৃত হইবে; শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ থাকিতে পারিবে না এবং এইজন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রের পরিদর্শনাধীনে থাকিবে। শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতা বা Laissez faire নীতি স্বভাবতই রহিল না। ধর্মের দিক দিয়াও মুসোলিনি ঐক্য নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন।

ফ্যাসিজম্‌ তথা মুসোলিনির উদ্দেশ্য ও নীতি: আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন—পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মর্যাদা অর্জন

ধর্মবিষয়ে ঐক্য নীতি

আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী: (১) শান্তি ও শৃঙ্খলার-ই তখন সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ছিল। মুসোলিনি সৎ বা অসৎ উপায়ে পার্লামেণ্টে সমাজতান্ত্রিক দলের বিরোধিতা দমন করিলেন। প্রয়োজন-বোধে গোপন হত্যা, পদচ্যুতি ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করিয়া সরকারের বিরোধী দল বা ব্যক্তিমাত্রেরই দমন সম্ভব হইল। ৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিস্ট্‌ দল ভিন্ন অপরাপর সকল রাজনৈতিক দলের অবসান করা হইল।* এইভাবে দেশে সরকারের বিরোধী কোন দল বা শক্তি রহিল না। দেশের অরাজকতা দূর হইল। রাজনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া মুসোলিনি অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দিকে মনোযোগ দিলেন। (২) ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী বাজেটে আয় ও ব্যয় সমান করা সম্ভব হইল। ইহার পর হইতে প্রতি

শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন

সরকারী বাজেটে উদ্বৃত্ত

* "All parties must end, must fall. I want to see a panorama of ruins about me—the ruins of other political forces—so that Fascism may stand alone, gigantic and dominant".—*Mussolini*, Quoted by Langsam, p. 341.

বৎসর সরকারী আয় হইতে যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকিত তাহা সরকারী তহবিলে সঞ্চিত হইতে লাগিল। (৩) পরিকল্পনা অনুযায়ী শিল্পোন্নয়ন শুরু হইল। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের লইয়া একটি টেক্‌নি-ক্যাল বোর্ড স্থাপন করা হইল। এই বোর্ড নূতন নূতন কারখানা স্থাপন এবং পুরাতন কারখানাগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণ করিতে লাগিল। দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণদান, জনকল্যাণকর সরকারী পরিকল্পনা গ্রহণ, শ্রমিকদের মোট শ্রমের ঘণ্টা হ্রাস ইত্যাদি নানা উপায়ে এক ব্যাপক অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন শুরু হইল। (৪) শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী স্থির করিয়া দেওয়া হইল। জিনিস-পত্রের দাম বাঁধিয়া দিয়া এবং গম, তুলা, তামাক প্রভৃতির চাষের উন্নতিসাধন করিয়া জনসাধারণের জীবনযাত্রা যেমন পূর্বাপেক্ষা সহজ করা হইল, বিদেশ হইতে আমদানির প্রয়োজনও তেমনি হ্রাস করা সম্ভব হইল। (৫) বিদেশ হইতে আনীত খাদ্যদ্রব্যের উপর উচ্চহারে শুল্ক স্থাপন করিয়া, নূতন জমি আবাদ এবং খাদ্য-দ্রব্যাদি উৎপাদনে নানাপ্রকার উৎসাহ দান করিয়া দেশকে খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলা হইল। (৬) ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সরকারী সাহায্যে জাহাজ-কোম্পানি খোলা হইল। বলকান অঞ্চল, রাশিয়া ও অপরাপর দেশের সহিত সমুদ্রপথে যোগাযোগ বৃদ্ধি করিয়া সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের প্রসারসাধন করা হইল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজ প্রস্তুতের তিনটি কারখানাকে একত্রিত করিয়া এক বিশাল কারখানায় পরিণত করা হইল। ইতালীয় জাহাজ নির্মাণের কারখানাগুলি নিজ দেশ, এমন কি রাশিয়া, তুরস্ক, গ্রীস ও দক্ষিণ-আমেরিকার কয়েকটি রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিতে লাগিল। (৭) ইলেক্‌ট্রিক ও রেডিও শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইল। বিদেশী মোটর গাড়ীর উপর খুব উচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন করিয়া ইতালীয় মোটর শিল্পের উন্নতিসাধন করা হইল। (৮) বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়া ইতালির অর্থনৈতিক উন্নতিবিধান করা হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি ও ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহা

শিল্পোন্নয়ন

মজুর শ্রেণীর উন্নতি-সাধন

খাদ্যদ্রব্যাদির উৎপাদনে উৎসাহ দান

জাহাজ নির্মাণ

ইলেক্‌ট্রিক, রেডিও ও মোটর শিল্পের উন্নতি

জল-বিদ্যুৎ, সিল্ক, রেয়ন উৎপাদন

ভিন্ন সিল্ক, রেয়ন প্রভৃতি শিল্পেও অপরাপর দেশ অপেক্ষা ইতালি অগ্রণী হইয়া উঠে। (৯) প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পূর্ণ উদ্যমে চলিতে থাকে। রাষ্ট্রের সহায়তায় শিল্পোন্নয়নের ফলে ক্রমে শিল্পের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই রাষ্ট্রায়ত্ত হইয়া পড়ে। (১০) ইতালীয়দের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল অত্যধিক। ফ্যাসিস্ট্ সরকার পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় করিয়া শিক্ষার প্রসার সাধন করেন। কিন্তু এই শিক্ষার মূলনীতি ছিল ফ্যাসিস্ট্ সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা। সুকুমার শিল্পেরও উৎসাহ ফ্যাসিস্ট্ সরকার দিয়াছিলেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি সব কিছুরই উদ্দেশ্য ছিল তিনটি : 'Believe, Obey, Fight'। (১১) ধর্মের ব্যাপারে মুসোলিনি দীর্ঘকালের রাষ্ট্র ও পোপের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া চার্চকে ফ্যাসিস্ট্ সরকারের সমর্থকে পরিণত করেন। ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য বিধান করা ছিল মুসোলিনির নীতি। (১২) ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি ফ্যাসিস্ট্ সিণ্ডিক্যালিজম্ (Fascist Syndicalism) নামে অর্থনীতি-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন।* পূর্বেকার পার্লামেন্ট-এর পরিবর্তে তিনি 'কর্পোরেশন' ও 'ফ্যাসিও' (Fascios)-এর প্রতিনিধি-বর্গের এক চেম্বার বা সভা স্থাপন করেন। এই সভার মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৬৮২। ফ্যাসিও নামক ফ্যাসিস্ট্ দলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে মোট এক-তৃতীয়াংশ এবং কর্পোরেশন নামক বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য হইতে দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য লইয়া এই চেম্বার গঠন করা হয়। কর্পোরেশনের সদস্যদের মধ্যে মজুর

বৈদেশিক বাণিজ্য-বৃদ্ধি

শিক্ষার বিস্তার ; শিক্ষার নীতি—'Believe, Obey, Fight'.

পোপের সহিত ধর্ম-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসা

'ফ্যাসিস্ট্ সিণ্ডিক্যা-লিজম্ (১৯৩৯)'

* "He (Mussolini) has established civil and political order, put industry on its feet, increased production and the general prosperity of the country, completed and projected vast land reclamation scheme, undertaken public works of many kinds, introduced social welfare measures of great variety—at the price of an efficient and at times repressive autocracy, of a censorship of public opinion, and of the abolition of Parliamentary government and of economic freedom to bargain." Ketelbey p. 453.

ও মালিক উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইত। এইভাবে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা গঠিত চেম্বারের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করিয়া মুসোলিনি কমিউনিস্ট্ মতবাদের প্রত্যুত্তর দিলেন। এই চেম্বারের বিভিন্ন কমিটি ছিল। এই সকল কমিটি সরকারকে নানা বিষয়ে উপদেশ দান করিত। আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা অবশ্য সরকারের হাতেই রাখা হইয়াছিল।

ফ্যাসিজমের গুণ

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ফ্যাসিস্ট্ সরকারের জনকল্যাণকর কার্যাবলীর স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। শিল্প, কৃষি, উন্নয়ন প্রভৃতি দিক দিয়া ফ্যাসিস্ট্ সরকারের দান নেহাৎ কম ছিল না। জাতীয়তাবোধও এইরূপ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তথাপি ফ্যাসিস্ট্ শাসনব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। স্বমত প্রকাশের অধিকার এই শাসনাধীনে কাহারোই ছিল না।

ফ্যাসিজমের অপগুণ

সর্বদা সন্দেহ এবং গোয়েন্দার তদন্তের ভয়ে ভীত থাকিয়া জনসাধারণের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছিল বলা বাহুল্য। সরকারী মতের বিরোধিতা কিংবা সরকারী মত ভিন্ন অপর যে-কোন মত প্রকাশ করা ছিল বিপজ্জনক।* শিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করিবার নীতি ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তির সর্বনাশ সাধন করিতেছিল। জনকল্যাণকর হইলেও সর্বাত্মক স্বৈরাচার চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ঘৃণা অর্জন করিয়াছিল। মুসোলিনির আমলে বহু সহস্র ইতালিবাসী দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল।

প্যারিসের সম্মেলনে ইতালি ট্রেন্টিনো বা টাইরল এবং উহার নিকটবর্তী জার্মান ভাষাভাষী প্রায় দুই লক্ষেরও অধিক অস্ট্রিয়ানকে ইতালির অধীনে স্থাপন করা হয়। তদানীন্তন ইতালীয় সরকার এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসোলিনি এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে ইতালীয় করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন।† এই

* "Fascism tolerates no difference of opinion,"—*Mussolini*, Vide, Riker, p. 759.

† "We shall make them (the German-speaking Austrians) Italians"—Mussolini, Vide, Langsam, p. 352.

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ইতালীয় ভাষা জোর করিয়া চাপান হইল। উচ্চ কর্মচারিপদ মাত্রেই ইতালীয়দের দেওয়া হইল। নদীর নাম, স্থানের নাম ইত্যাদি সব কিছু পরিবর্তন করিয়া ইতালীয় নামে অভিহিত করা হইল। এমন কি পারিবারিক নামও ইতালীয় ভাষায় ভাষান্তরিত করা হইল। এই-ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও ভাষার উপর আঘাত করিলে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া তীব্র প্রতিবাদ জানাইল। মুসোলিনি অস্ট্রিয়া ও জার্মানিকে ইতালির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ট্রেন্টিনো বা টাইরলের জার্মান ভাষাভাষী অস্ট্রিয়ানদের বিষয় লইয়া কোনপ্রকার আন্দোলন করিবে না বলিয়া স্বীকৃত হইল। অপর দিকে হিট্‌লার জার্মানির কর্তৃত্ব লাভ করিলে ইতালি ও জার্মানির মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইল (১৯৩৯)। এই চুক্তি দ্বারা স্থির হইল যে, টাইরলের জার্মান ভাষাভাষী অধিবাসিগণ ইচ্ছা করিলে জার্মানিতে চলিয়া যাইতে পারিবে।

ট্রেনটিনোর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বলপূর্বক ইতালীয় করিবার অপচেষ্টা

অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত চুক্তি

পররাষ্ট্র-নীতি ঃ মুসোলিনি তথা ফ্যাসিস্ট্ সরকারের পররাষ্ট্র-নীতির মূল কথাই ছিল আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে ইতালির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করা। মুসোলিনি ইতালিকে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত করিতে চাহিলেন। ফ্যাসিস্ট্‌গণ ও তাহাদের নেতা মুসোলিনি যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। মুসোলিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধনীতি জাতির শক্তির প্রাচুর্যের প্রমাণস্বরূপ। এই বিশ্বাসের স্বাভাবিক ফল হিসাবেই জল, স্থল ও বিমানবাহিনী অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি করা হইল। মুসোলিনি স্বয়ং এই তিন বিভাগেরই অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিলেন।

পররাষ্ট্র-নীতির মূল উদ্দেশ্য ঃ ইতালির মর্যাদা ও প্রতিপত্তিবৃদ্ধি

স্থল, জল ও বিমান-বাহিনী বৃদ্ধি

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধনীতিতে বিশ্বাসী ফ্যাসিস্ট্-নেতা মুসোলিনি সর্বপ্রথম প্যারিস সম্মেলন কর্তৃক ইতালির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিকার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ইহা ভিন্ন তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া ইতালির শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে চাহিলেন। প্রয়োজনীয় সামরিক বাহিনী গঠন করিয়াই মুসোলিনি তাঁহার নীতি কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্যারিস সম্মেলন কর্তৃক অবিচারের প্রতিকার ঃ সাম্রাজ্য বিস্তার

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধে ফ্রান্সের অসংখ্য লোকক্ষয় হইয়াছিল। এই কারণে বিদেশীদের ফ্রান্সে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে ফরাসী সরকার উৎসাহ দিতেন। এদিকে ইতালির আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং প্রধানত জীবিকা অর্জনের জন্য বহু সংখ্যক ইতালিবাসী ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। ফরাসী সরকার এই সকল ইতালীয়কে ফরাসী নাগরিকত্ব দান করিয়া অধিকসংখ্যক ইতালীবাসীকে ফ্রান্সে চলিয়া আসিবার উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। এই সূত্রে ফ্রান্সের সহিত ইতালির মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। ইহা ভিন্ন প্যারিস সম্মেলনে ইতালি যে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পায় নাই সেইজন্যও ইতালি ফ্রান্সকেই দায়ী মনে করিত। ফরাসী-অধিকৃত স্যাভয়, নিস্‌, কর্সিকা ও টুনিশিয়া প্রভৃতি স্থানের উপর ফ্রান্স অপেক্ষা ইতালির দাবি-ই অধিক এই কথাও ইতালীয়গণ মনে করিত। এই সকল কারণে ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমেই প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হইতে চলিয়াছিল। ইতালির সহিত ফ্রান্সের মিত্রদেশ যুগোশ্লাভিয়ার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে ইতালি ও ফ্রান্স যুদ্ধে প্রায় অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিয়াছিল। উভয় সীমান্তেই সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই দেশে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয় নাই।

ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে মনোমালিন্য

মুসোলিনি পূর্ব-ইওরোপে ইতালির ক্ষমতা দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ (Dodecanese Islands), ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ফাইউম্‌ (Fiume) ইতালির অধিকারে আসে। ইহা ভিন্ন মধ্য ও পূর্ব-ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত ইতালি সামরিক, বাণিজ্যিক ও মিত্রতা-মূলক চুক্তি স্থাপনে সমর্থ হয়।

পূর্ব-ইওরোপে ইতালির শক্তি বৃদ্ধি

ইহার পর ইতালি আফ্রিকায় অধিকার বিস্তারে মনোযোগী হয়। প্যারিস সম্মেলনে ইতালি উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পায় নাই স্মরণ করিয়া ইংলণ্ডের উদ্‌যোগে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে টাঞ্জিয়ার নামক স্থানের শাসনভার (Mandate) ইতালিকে দেওয়া হইল। সাইরেনেইকা (Cyrenaica) ও মিশরের মধ্যে সীমা নির্ধারণ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে উহার সমস্যা ইতালির স্বপক্ষে মীমাংসিত হইল। এইভাবে শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া

টাঞ্জিয়ার-এর Mandate : সাইরেনেইকা সমস্যা

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি বলপূর্বক রাজা হেইলি সেলাসির (Haile Selassie) রাজ্য আবিসিনিয়া দখল করিয়া লইলেন। লীগ্-অব-ন্যাশনস ইতালিকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইল না। মুসোলিনি এক ঘোষণা দ্বারা ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড, ইথিওপিয়া ও ইরিট্রিয়া ঐক্যবদ্ধ করিয়া লইলেন।

আবিসিনিয়া দখল (১৯৩৬)

ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে ক্রমে ইতালি ও ইংলণ্ডের মধ্যেও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আবিসিনিয়া দখল করিবার পর ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের সহিত ইতালির মনোমালিন্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইলে মুসোলিনি নিজ শক্তি বৃদ্ধির জন্য জার্মানির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। জার্মানি ইতিপূর্বেই জাপানের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিল। ইতালির সহিত জার্মানির চুক্তি সম্পাদিত হইলে জার্মানি, ইতালি ও জাপানের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। এই 'তিন দেশ' (Axis Powers) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একই পক্ষে থাকিয়া মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি ইতালীয় সাম্রাজ্যবৃদ্ধির জন্য টুনিস্ দখল করিতে চাহিয়াছিলেন। ফ্রান্সের দৃঢ়তায় অবশ্য তিনি টুনিস্ দখল করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ঐ বৎসর মুসোলিনি আল্বানিয়া দখল করিয়া ইতালির রাজা ভিক্টর ইমান্যুয়েলকে আল্বানিয়ারও রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

জার্মানি-জাপান ও ইতালির মিত্রতা

আলবানিয়া দখল

রাশিয়া (Russia)

রুশ-বিপ্লব, ১৯১৭ (The Russian Revolution): ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এই বিপ্লব বর্তমান পৃথিবীর বিস্ময় ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে।

রুশ-বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

রুশ-বিপ্লবের পশ্চাতে দুইটি মূল কারণ বিদ্যমান ছিল: (১) জারতন্ত্রের শাসন-পরিচালনার অক্ষমতা, (২) রুশ জনসাধারণের চিন্তাধারার উপর পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রভাব। এই দুই মূল কারণের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণের আলোচনার মাধ্যমেই রুশ-বিপ্লবের প্রকৃতি ও গতি অনুধাবন করা সহজ হইবে।

রুশ-বিপ্লবের মূলত দুইটি কারণ: (১) জারতন্ত্রের অক্ষমতা, (২) জনসাধারণের মানসিক চেতনা

কোন বিপ্লবই কোন একটি বা একই প্রকার কারণে সংঘটিত হয় না। বিপ্লবের পশ্চাতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ, রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক নানাপ্রকার কারণ থাকে। রুশ-বিপ্লবের পশ্চাতেও অনুরূপ কারণ ছিল সন্দেহ নাই। উপরোক্ত মূল কারণ এবং অন্যান্য কারণের মধ্যে ফরাসী-বিপ্লবের কারণগুলির আভাস পাওয়া যায়।

নানাবিধ কারণের ফলে বিপ্লব সংঘটিত

জারতন্ত্রের শাসনপরিচালনার অক্ষমতা জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে (১৮৯৪-১৯১৭) সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। দ্বিতীয় নিকোলাসের শাসন যেমন ছিল স্বৈরাচারী তেমনই ছিল অকর্মণ্য। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল একেবারে অসহনীয়। রাশিয়ার প্রজা-হিতৈষী জারগণ দেশের উন্নতিসাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় নিকোলাসও ব্যক্তিগতভাবে দেশপ্রেমিক ও প্রজাবর্গের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বৈরাচারের প্রধান ত্রুটি-ই হইল এই যে, যখনই রাজা বা জারের কর্মকুশলতার অভাব দেখা দিবে তখনই উহার পতন ঘটিবে। ফরাসী বিপ্লব হইতেও এই শিক্ষা-ই পাওয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় নিকোলাসের প্রজাহিতৈষণা ও দেশপ্রেম তাঁহার দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতাকে পূরণ করিতে পারিল না। তিনি ছিলেন ভীরু, কাপুরুষ, তদুপরি অব্যবস্থিতচিত্ত। তিনি ছিলেন তাঁহার রাণী আলেকজান্দ্রার সম্পূর্ণ করায়ত্তে। রাণী আলেকজান্দ্রা নিজে ছিলেন রাস্‌পুটিন (Rasputin) নামক এক সাইবেরিয়াবাসী ধর্মযাজকের প্রভাবাধীন। রাস্‌পুটিনের প্রভাব শাসনকার্যে এবং শাসননীতিতেও প্রতিফলিত হইত। ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই-এর ন্যায় দ্বিতীয় নিকোলাসও নিজ রাণীর সর্বনাশাত্মক প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। ফরাসীরাজের ন্যায় তিনিও স্বার্থান্বেষী অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। এইরূপ পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশে এক বিদ্রোহ দেখা দিল। নিকোলাস বাধ্য হইয়া ডুমা (Duma) নামে এক পার্লামেন্ট বা জাতীয় সভা স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই পার্লামেন্টে রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় নিকোলাসের পক্ষে

(১) রাজনৈতিক: জারতন্ত্রের অকর্মণ্যতা: দ্বিতীয় নিকোলাস

রাণী ও রাস্‌পুটিনের প্রভাব

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ: (ডুমা) পার্লামেন্ট গঠন

স্বৈরাচারী শাসন চালু রাখার কোন অসুবিধা হইল না। পার্লামেণ্টে বিরোধী পক্ষ ছিল 'সোশিয়্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি' (Social Democratic Party)। এই দলের একাংশের নাম ছিল 'বল্‌শেভিক্'। ক্রমে এই বল্‌শেভিক্‌গণই শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই দলের শক্তি ও সংগঠন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ায় বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে।

বল্‌শেভিক্ দল

সামাজিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ অব্যবস্থা ও অসন্তোষ বিদ্যমান ছিল। সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজ-ব্যবস্থার অনুরূপ। কয়েকটি বৃহৎ শহর ভিন্ন অপর কোথাও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিয়া কিছু ছিল না। প্রতি এক হাজার রুশের মধ্যে ১৭ জন ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, ১২৫ জন ছিল ব্যবসায়ী ও শহরের বাসিন্দা এবং অবশিষ্ট ৮ শতেরও অধিক ছিল কৃষক। জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার রাশিয়ার 'সার্ফ প্রথার' (Serfdom) উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'মির' (Mir) নামক যে গ্রাম্য সমিতির উপর জমির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হইয়াছিল তাহা এক অত্যাচারী প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হইয়াছিল। গ্রামের কৃষকদের ভূসম্পত্তি সমগ্র গ্রামবাসীর যুগ্ম সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং প্রয়োজন হইলেও কোন কৃষক নিজ জমি বিক্রয় করিতে পারিত না। এই অসুবিধা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর দূর করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কৃষকদের সুবিধা না হইয়া বরঞ্চ অসুবিধাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অনেক কৃষকই স্বাধীনভাবে জমি চাষ করিতে সক্ষম হইল না, কেহ কেহ জমি বিক্রয় করিয়া দিল। এইভাবে কৃষকদের দুরবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(২) সামাজিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যাল্পতা—কৃষক শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য

(৩) অর্থ নৈতিক : কৃষক শ্রেণীর দুর্দশা

শ্রমজীবীদের অবস্থাও কৃষকদের অপেক্ষা মোটেই ভাল ছিল না। শিল্পোন্নতির আনুষঙ্গিক ফ্যাক্টরী-প্রথার যাবতীয় অসুবিধা তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইত। অত্যাচারী ও প্রাচীনপন্থী সরকারের অধীনে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির কোন আশা ছিল না। কোনপ্রকার ধর্মঘট করা বা ট্রেড্ ইউনিয়ন গঠন করা নিষিদ্ধ ছিল। বলপূর্বক বহু ট্রেড্ ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রমজীবিগণ এই অসহনীয় অবস্থায় নীরবে কালাতিপাত করিতেছিল। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও সাম্যবাদী প্রচার এইভাবে অত্যাচারিত

শ্রমজীবীদের দুরবস্থা

শ্রমিক সম্প্রদায়—সমাজতান্ত্রিক প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র

ও দুর্দশাগ্রস্ত পাঁচিশ লক্ষ রুশ মজুরের উপর স্বভাবতই গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের সময় রাশিয়ার মজুর সম্প্রদায় ধর্মঘট ইত্যাদি করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় দান করিয়াছিল। সরকারী অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া তাহারা মস্কো, সেণ্ট্-পিটার্সবার্গ প্রভৃতি বড় বড় শহরে ধর্মঘট ও মারামারি করিতে পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে রুশ শ্রমিক-সমাজ অধিকতর সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়া উঠে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে রুশ শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও রুশগণ ইওরোপের অপরাপর দেশ হইতে পশ্চাদ্‌পদ ছিল। কৃষক ও মজুর শ্রেণী-গঠিত রুশ জনসাধারণ ছিল অশিক্ষিত। সমগ্র ইওরোপের মধ্যে রাশিয়ায় অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। ভড্‌কা (Vodka) নামক একপ্রকার মদ সকলেই পান করিত। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মাদক পানীয় প্রভৃতির ফলে রুশ জনসাধারণ—অর্থাৎ কৃষক ও মজুর শ্রেণী—অতিশয় নিম্ন-স্তরের জীবন যাপন করিত। সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য স্বভাবতই তাহাদের মনোগ্রাহী হইল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'সোশিয়্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি' নামে এক রাজনৈতিক দল গঠিত হইলে ক্রমেই ইহার সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই দলের একাংশ বল্‌শেভিক্ নামে পরিচিত ছিল। 'বল্‌শেভিক্' (Bolshevik) কথাটির মূল অর্থ হইল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপর পক্ষে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দল 'মেন্‌শেভিক্' (Menshevik) নামে পরিচিত ছিল। এইভাবে রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল।

(৪) শিক্ষা-বিষয়ক ও সাংস্কৃতিক

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ থাকিলেই বিপ্লব সৃষ্টি হইবে এমন কোন কথা নাই! এই সকল অভাব-অভিযোগের উপর জনসাধারণের দৃষ্টি পতিত হওয়া চাই। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে যেমন ফরাসী দার্শনিকগণ বিপ্লবের মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছিলেন অনুরূপ মানসিক প্রস্তুতি বিপ্লব-মাত্রেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে। রাশিয়ার জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি সৃষ্টি করিলেন রুশ সাহিত্যসেবী গোর্কি, টলস্টয়, ডস্‌টয়েভ্‌স্কি, তুর্গেনিভ, আইভান প্যাভ্‌লভ্ প্রভৃতি। এই সকল সাহিত্যসেবীর রচনার প্রভাবে জনসাধারণের মানসিক চেতনা বৃদ্ধি

(৫) মানসিক: গোর্কি, টলস্টয়, তুর্গেনিভ্, আইভান প্যাভ্‌লভ্ ও ডস্‌টয়েভ্‌স্কির রচনা: বাকুনিন ও কার্ল মার্কসের প্রভাব

পাইবার ফলে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার প্রতি তাহাদের দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হইল। বাকুনিন ও কার্ল মার্কসের গ্রন্থপাঠের ফলে রাশিয়ার জনসাধারণ, এমন কি অভিজাত ও মালিক শ্রেণীর মধ্যেও অত্যাচারী জারতন্ত্রের অবসানের আগ্রহ দেখা দিল।

এইভাবে রুশ-বিপ্লবের প্রস্তুতি যখন প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিল তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় এবং যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হইয়া দাঁড়াইল। দেশের সর্বত্র জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষ এবং এই বিদ্বেষ ক্রমে প্রকাশ্য বিক্ষোভে পরিণত হইল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেট্রোগ্রাড্ শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে দাঙ্গা শুরু হইল। ক্রমে এই দাঙ্গা বিপ্লবে রূপলাভ করিল। শ্রমিকগণ কারখানার কাজ ত্যাগ করিয়া ধর্মঘট শুরু করিল। এই ব্যাপক দাঙ্গা ও ধর্মঘট দমনের জন্য সরকার সেনাবাহিনী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু সেনা-বাহিনী ধর্মঘটী শ্রমিক বা দাঙ্গাকারীদের দমন না করিয়া বিপ্লবাত্মক কার্যের সহায়তা করিতে লাগিল। এইভাবে জারতন্ত্রের অবসান যখন অবশ্যম্ভাবী তখন সৈনিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিগণ 'সোভিয়েট' নামে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই 'সোভিয়েট'-এর উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবকে সম্পূর্ণ-ভাবে জয়যুক্ত করিয়া দেশে কার্যকরী ও জনকল্যাণকর শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা। এই সময়ে অকর্মণ্য জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ডুমা বা পার্লামেণ্ট শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একটি অস্থায়ী সরকার স্থাপন করে। জারতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রুশ-বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়। শূন্য জারপদে কাহাকেও বসান হইল না, সুতরাং বাহ্যত রাশিয়া একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল।

(৬) প্রত্যক্ষ কারণ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশ পরাজয়—জনসাধারণের দুর্দশা

জারতন্ত্রের পতন : অস্থায়ী সরকার গঠন

অস্থায়ী সরকারের সমস্যা (Problems of the Provisional Government) : ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ফলে জনসাধারণের হাতে শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত হয় নাই। ইহার জন্য একটি দ্বিতীয় বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল।

অস্থায়ী সরকার পার্লামেণ্টের (ডুমা) সদস্যদের মধ্য হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছিল, বটে, কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা ছিল

সোভিয়েট-এর হস্তে। অস্থায়ী সরকারের নেতা অধ্যাপক মিলিন্‌কভ্‌ উদার-নৈতিক সংস্কারকার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি এই ঘোষণা করিলেন যে, জাতীয় সংবিধান সভা কর্তৃক রাশিয়ার নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করা হইবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতিতে যোগদানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হইল। কিন্তু এই সকল উদরনৈতিক সংস্কারের ফলেও দেশের কোন প্রকৃত উন্নতি ঘটিল না। ঐ সময়ের প্রধান প্রয়োজনই ছিল অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। অর্থনৈতিক কারণই ছিল রুশ-বিপ্লবের প্রধান কারণ, কিন্তু এবিষয়ে দ্রুত কোন উন্নতি সাধিত না হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল। ইহা ভিন্ন অস্থায়ী সরকার অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। অপর পক্ষে সোভিয়েট-এর সদস্যগণ ছিলেন প্রোলিট্যারিয়েট শ্রেণীভুক্ত। স্বভাবতই উদার এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে রুশ-বিপ্লবের অগ্রগতি সম্ভব হইল না। সোভিয়েট ও অস্থায়ী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য এই সরকারের পতন ঘটাইল। সরকার পক্ষ চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্ত্য দেশের ভূমি-সংক্রান্ত আইন-কানুন অনুকরণ করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-বিধান করিতে। অথচ জনসাধারণের দাবি ছিল 'শান্তি, খাদ্য ও জমি'। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের ফলে দেশে যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে দ্রুত উন্নতিসাধনের সুযোগ ছিল না। জনসাধারণেরও ধৈর্য ধরিয়া থাকিবার অবস্থা ছিল না। ফলে, ব্যাপকভাবে জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর সম্পত্তি লুণ্ঠন, ধর্মঘট, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-বাহিনীর যুদ্ধত্যাগ প্রভৃতি শুরু হইল। সমগ্র দেশে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিল। এই সুযোগে পোল ও ফিন্‌গণ রাশিয়ার রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ করিল।

অস্থায়ী সরকারের উদার নীতি; অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে বিলম্ব: জনসাধারণের অসন্তুষ্টি

ব্যাপক অরাজকতা: ফিন্‌ ও পোলদের রুশ রাষ্ট্রসংঘ ত্যাগ

এমন সময়ে মেন্‌শেভিক্‌ দলের নেতা কেরেন্‌স্কি শাসনব্যবস্থা হস্তগত করিলেন। তিনি চাহিয়াছিলেন শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্রবাদ স্থাপন ও গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করিতে। পররাষ্ট্রক্ষেত্রে যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু মেন্‌শেভিক্‌দের বিরোধী পক্ষ বল্‌শেভিক দলের নেতা লেনিন, ট্রট্‌স্কি প্রভৃতি যুদ্ধ পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন প্রচলিত শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া

মেন্‌শেভিক্‌ নেতা কেরেন্‌স্কি কর্তৃক শাসনব্যবস্থা হস্তগত

প্রোলিটারিয়েটদের শাসন স্থাপন করা। যাহা হউক কেরেন্স্কি সাময়িকভাবে সাফল্যের সহিতই আভ্যন্তরীণ শাসন এবং যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া চলিলেন। কিন্তু বল্‌শেভিক্‌দের প্রচারকার্যে প্রভাবিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ সেনাবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দেশের অভ্যন্তরেও প্রোলিটারিয়েট শাসন স্থাপনের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জনসাধারণের মধ্যে দেখা গেল। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা দিলে জার্মানবাহিনী সহজেই রুশ সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রিগা (Riga) নামক স্থানটি দখল করিয়া লইল। এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই কেরেন্স্কির জনপ্রিয়তা সমূলে বিনষ্ট হইল; বল্‌শেভিক্‌ দল এই সুযোগে দেশের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিল। এইভাবে রুশ-বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পন্ন হইল (নভেম্বর ৬, ৭, ১৯১৭)।

কেরেন্স্কির শাসন-ব্যবস্থার পতন: বল্‌শেভিক্‌ শাসন স্থাপন

বল্‌শেভিক শাসন (Bolshevik Government): বল্‌শেভিক্‌ সরকার শাসনভার গ্রহণ করিয়াই সম্মুখীন সমস্যা সমাধানে অগ্রসর হইলেন। ঐ সময়কার প্রধান সমস্যাগুলি ছিল: (১) বিপ্লবকে স্থায়ী করা এবং বিপ্লবের পশ্চাতে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করা, (২) মার্কসবাদকে কার্যকরী করা, (৩) বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান করা।

বল্‌শেভিক্‌ সরকারের সমস্যা

নব-প্রতিষ্ঠিত বল্‌শেভিক্‌ সরকারের নেতা ছিলেন ট্রট্স্কি ও লেনিন। তাঁহারা বিপ্লবের সুফলগুলি যাহাতে স্থায়ী হয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন, মানুষে মানুষে সমতা স্থাপন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য দূর করিবার জন্য জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান মাত্রেরই রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া ন্যায্য-বণ্টন (Fair Distribution) ব্যবস্থা প্রচলন করিতে তাঁহারা মনোযোগী হইলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া কাহারও কিছু রহিল না। সমষ্টির কল্যাণের জন্য সম্পত্তি মাত্রেরই জাতীয়করণ করা হইল। কারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতির কোনরূপ ক্ষতিপূরণ না দিয়াই জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইল। সরকারী ঋণ বাতিল করিয়া সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করা হইল। দেশে-শ্রমিক ও মূলধনীর মধ্যে কোন পার্থক্য রহিল না। প্রত্যেকের শ্রম করিয়া জীবিকা উপার্জন বাধ্যতামূলক করা হইল। সমগ্র

সম্পত্তি জাতীয়করণ

শ্রেণী ও শোষণমুক্ত সমাজ স্থাপন

রুশ জাতি হইল শ্রমিকের জাতি এবং রুশ রাষ্ট্র হইল শ্রমিকের নিয়োগ-কর্তা। এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা রাষ্ট্র-সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া শোষণমুক্ত শ্রেণীভেদহীন এক সমাজের স্থাপনা করা হইল। সর্বসাধারণ্যে বল্‌শেভিক্ সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইল।

বিদ্রোহ দমন: বহু ব্যক্তির প্রাণনাশ

কিন্তু সম্পত্তি জাতীয়করণের ফলে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহারা স্বভাবতই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহ বলপূর্বক দমন করা হইল। এই সূত্রে বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণনাশ করা হইয়াছিল। ভূতপূর্ব জার দ্বিতীয় নিকোলাসও ঐ সময়ে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

বৈদেশিক যুদ্ধের অবসান: ব্রেস্টলিট্-ভস্কের সন্ধি

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে বল্‌শেভিক্ সরকার শান্তিস্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপনই ছিল তখনকার সর্বপ্রধান সমস্যা। বৈদেশিক যুদ্ধে শক্তি এবং সামর্থ্য ব্যয় না করিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধানের জন্য বল্‌শেভিক্ সরকার জার্মানির সহিত ব্রেস্ট্-লিট্‌ভস্কের (Brest Litvosk) সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী রাশিয়াকে বহু স্থান ত্যাগ করিতে হইল, কিন্তু জাতির স্বার্থের খাতিরে বল্‌শেভিক্ সরকার সেই পন্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পিটার-দি-গ্রেটের পরবর্তী কালে যে সকল স্থান রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল তাহার প্রায় সব কিছুই এই সন্ধির শর্তানুসারে ফিরাইয়া দিতে হইল। বৈদেশিক যুদ্ধের এইভাবে অবসান ঘটাইয়া বল্‌শেভিক্ সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যে অধিকতর মনোযোগ দিতে সমর্থ হইলেন।

বল্‌শেভিক্‌দের আন্তর্জাতিক আবেদন: ইওরোপীয় শক্তিবর্গের ভীতি

কিন্তু বল্‌শেভিক্ সরকারের সর্বাপেক্ষা অধিক বিপদ আসিল বাহির হইতে। বল্‌শেভিক্‌গণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র স্থাপিত হউক এই ইচ্ছা করিত। তাহাদের প্রচারের আন্তর্জাতিক আবেদন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে এক দারুণ ভীতির সঞ্চার করিল। যুদ্ধের ফলে প্রত্যেক দেশেই তখন অর্থনৈতিক দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছিল। এমতাবস্থায় সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য এবং রাশিয়ার বল্‌শেভিক্ বিপ্লবের সাফল্য অপরাপর দেশের জনসাধারণকেও প্রভাবিত করা স্বাভাবিক ছিল। ইওরোপীয় শক্তিমাত্রই এই কারণে প্রমাদ গণিল। তাহারা রাশিয়ার অভ্যন্তরস্থ বিপ্লব-বিরোধী

দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার গোপন চেষ্টা করিতে লাগিল। এই বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কেরেন্‌স্কি, কর্নিলভ, ডেনিকিন্‌ ও র‍্যাঙ্গেল। ইংলণ্ড, জাপান ও ফ্রান্স রুশ-বিপ্লব দমন করিবার জন্য রাশিয়ায় সৈন্য পাঠাইতেও দ্বিধাবোধ করিল না। কিন্তু বল্‌শেভিক্‌ সরকারের পশ্চাতে জনগণের সমর্থন থাকায় এই অপচেষ্টায় রাশিয়ার কোন ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হইল না। রাশিয়ার কৃষক-মজুরদের সহায়তা এবং বিপ্লব-বিরোধী দলের মধ্যে ঐক্যের অভাব বল্‌শেভিক্‌ সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করিল। বিদেশী আক্রমণ স্বভাবতই বিফলতায় পর্যবসিত হইল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশকর্তৃক রুশ-বিপ্লব দমনের চেষ্টা ঐ সকল দেশের জনসাধারণ সমর্থন না করায় ক্রমেই সৈন্য পাঠাইয়া রুশ-বিপ্লব দমনের আগ্রহ হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। অবশেষে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশ নিজ নিজ সৈন্য রাশিয়া হইতে অপসারণ করিল। বল্‌শেভিক্‌ বিপ্লব-বিরোধী দলগুলিকে দমন করা বল্‌শেভিক্‌ সরকারের পক্ষে তখন আর কঠিন হইল না। ফলে রুশ-বিপ্লব স্থায়ী এবং সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইল। বিদেশী সরকারগুলি অবশ্য বল্‌শেভিক্‌ সরকারকে স্বীকার করিলেন না। ক্রমে পরিস্থিতির চাপে বল্‌শেভিক্‌ সরকার ইওরোপীয় শক্তিবর্গের স্বীকৃতি-লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপান কর্তৃক রুশবিপ্লব দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ

বৈদেশিক সৈন্যের অপসারণ : রুশবিপ্লবের জয়

লেনিন, ১৯১৭—'২৪ (Lenin) : ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌শেভিক্‌ দলের নেতা ট্রট্‌স্কি ও লেনিন কেরেন্‌স্কি শাসনের অবসান ঘটাইয়া বল্‌শেভিক্‌ বিপ্লব সম্পন্ন করেন।

ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ্‌ সর্বসাধারণ্যে লেনিন নামেই পরিচিত। তিনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে এপ্রিল কাজান প্রদেশের সিন্‌বির্‌স্ক্‌ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উহা বিপ্লবী পরিবার হিসাবে খ্যাত ছিল। লেনিনের ভ্রাতা আলেক্‌জাণ্ডার ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ জারকে হত্যা করিতে গিয়া ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার অপর এক ভ্রাতা ও দুই ভগিনী পুলিশের নজরবন্দী ছিলেন। লেনিন নিজেও পুলিশের নজর এড়াইতে পারেন নাই। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়া কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই এক ছাত্র-বিক্ষোভে অংশ

লেনিনের বাল্যজীবন ও শিক্ষা

গ্রহণের ফলে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পর অবশ্য তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আইন বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি মার্কস্-এর 'ক্যাপিট্যাল' পাঠ করিয়া একমাত্র সমাজতান্ত্রিক পন্থাতেই রুশ জাতির প্রকৃত মুক্তিসাধন সম্ভব, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। লেনিন একটি বিপ্লব দলের সভ্য হন এবং এই অপরাধে তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়।

নির্বাসন-দণ্ড ভোগের পর তিনি সুইট্জারল্যাণ্ডে গমন করেন। কেবলমাত্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক রুশ-বিপ্লবের সময়ে তিনি অল্পকালের জন্য রাশিয়ায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জার্মানি, ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া সেই সকল দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের সহিত পরিচিত হন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রুশ 'সোশিয়েলিস্ট্ ডিমোক্রেটিক' দলের এক অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনে লেনিন কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সুদৃঢ় সংগঠন এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রভাব-মুক্ত প্রোলিট্যারিয়েট-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। অপর এক দল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, এমন কি যে-কোন সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিকেই সোশিয়েলিস্ট্ ডিমোক্রেটিক দলের সভ্য করিবার যুক্তি দেখাইলেন। ভোটে লেনিনের মতই গৃহীত হইল। এই সময় হইতেই লেনিনের মতে বিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 'বল্‌শেভিক্' নামে পরিচিত হইল। বিরোধী পক্ষ 'মেন্‌শেভিক্' বা সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হিসাবে পরিচিতি লাভ করিল।*

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সোশিয়েলিস্ট্ ডিমোক্রেটিক দলের অধিবেশন: বল্‌শেভিক্ ও মেনশেভিক দলের উদ্ভব

লেনিন জীবনে দারিদ্র্যের কষ্ট কোনদিনই অনুভব করেন নাই, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় অতি সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত কর্মদক্ষতা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সুদৃঢ় সংকল্প তাঁহাকে বিপ্লবী দলের নেতৃপদের যোগ্য করিয়াছিল। তিনি নিজ নীতি অনুসরণে কোন বাধা-বিপত্তিই মানিতেন না, প্রয়োজনবোধে তিনি কূট কৌশলের সাহায্য গ্রহণেও দ্বিধাবোধ করিতেন না।

লেনিনের চরিত্র ও নীতি

* *Bolsheviki* from *bolshinstvo*, meaning 'majority'- *Mensheviki* from *menshinstvo*, meaning 'minority', vide Langsam, p. 542.

ধনতন্ত্র তাঁহার নিকট পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সর্বনাশাত্মক ব্যবস্থা বলিয়া মনে হইত। বিপ্লবের দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র ধনতন্ত্রের অবসান-সাধনই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবে জারতন্ত্রের পতন ঘটিলে জার্মান সরকারের সহায়তায় তিনি রাশিয়ায় ফিরিয়া আসেন। জার্মান সরকার লেনিনের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ তাঁহাকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন মনে করিলে ভুল হইবে।

লেনিনের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন (১৯১৭)

জার্মান সরকার চাহিয়াছিলেন যে, লেনিন স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু করিলে রাশিয়ার বিপ্লবী অস্থায়ী সরকারের দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানির জয়লাভের আশাও বৃদ্ধি পাইবে।

বল্‌শেভিক্ বিপ্লব

রাশিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া লেনিন কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর সহায়তায় অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া বল্‌শেভিক্ বিপ্লব সম্পূর্ণ করেন। এই বিপ্লবে টট্‌স্কি ছিলেন তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

বল্‌শেভিক্ সরকারের অর্থ নৈতিক সমস্যা

বল্‌শেভিক্ শাসনব্যবস্থার নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন লেনিন। তাঁহার আমলে রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বহুবিধ মৌলিক পরিবর্তন ঘটিল। সম্পত্তি জাতীয়করণ নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া বল্‌শেভিক্ সরকারকে এক দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। কৃষকগণ জমিদারদের সম্পত্তি দখল করিতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিল বটে, কিন্তু সেই জমি নিজ সম্পত্তি হিসাবে রাখিবার জন্যই তাহারা ব্যগ্র হইল। তাহারা নিজ নিজ জমি চাষ করিয়া প্রয়োজনের

কৃষির অবনতি

অতিরিক্ত উৎপন্ন ফসল নিজ হস্তে রাখিয়া নিজ নিজ সঞ্চয় ও আয় বৃদ্ধি করিতে চাহিল। উদ্‌বৃত্ত ফসল সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে তাহারা মোটেই রাজী হইল না। সরকার এ বিষয়ে জোর করিলে কৃষকগণ উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায়

দুর্ভিক্ষ

এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লক্ষ লক্ষ লোক খাদ্যাভাবে মারা গেল। ঐ সময়ে বৈদেশিক সাহায্য, বিশেষতঃ আমেরিকার সাহায্যে বহু লোকের প্রাণ বাঁচিল।

শিল্পক্ষেত্রেও একইরূপ দুরবস্থা দেখা দিল। বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জাতীয়করণ করা হইয়াছিল। শ্রমিক সম্প্রদায় তখন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির

দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রমিকদের সংগঠন ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার অভাবের ফলে শিল্পোৎপাদনে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। উৎপন্নের পরিমাণও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। এমতাবস্থায় শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীর দাম দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছিল।

শিল্পের অবনতি

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন এইরূপ তখন রেলপথও প্রায় অচল হইয়া পড়িতেছিল। রেল-ইঞ্জিনের শতকরা ৬০ ভাগ যুদ্ধকালীন পরিবহণের চাপে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ফলে, দেশের একস্থান হইতে উৎপন্ন খাদ্যশস্য বা শিল্প-সামগ্রী অপর স্থানে পরিবহণের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল। ফলে, জিনিসপত্রের দাম ভীষণভাবে বাড়িয়া গেল। এদিকে মুদ্রাস্ফীতির ফলেও মূল্যস্তর সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল। কৃষকগণ তাহাদের উদ্‌বৃত্ত শস্যের বিনিময়ে শিল্প-সামগ্রী অথবা ধাতু-নির্মিত মুদ্রা দাবি করিল। কাগজী মুদ্রা গ্রহণে তাহারা রাজী হইল না। সরকার আইনের বলে কৃষকদের নিকট হইতে উদ্‌বৃত্ত শস্য গ্রহণের চেষ্টা করিলে সরকারের প্রতি তিক্ততা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষি ও শিল্পের এইরূপ দুরবস্থায় জনসাধারণ স্বভাবতই বল্‌শেভিক্ শাসন-বিরোধী হইয়া উঠিল। 'সোভিয়েট সরকারের পতন হউক' এই ধ্বনি দেশের সর্বত্র উত্থিত হইল।*

পরিবহণ-ব্যবস্থা অচল

মূল্যস্তর বৃদ্ধি

লেনিন তাঁহার 'খাঁটি কমিউনিজম্' (Pure Communism)-পরীক্ষা তেমন সফল হইল না দেখিয়া এক নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা নীতি গ্রহণ করিলেন। ইহা ১৯২১ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। এই নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ('New Economic Policy', NEP 1921—1928) পরিস্থিতির খাতিরে যতদুর পর্যন্ত কমিউনিজম্ কার্যকরী রাখা সম্ভব হইল কেবলমাত্র ততটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।† এই নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের এক কার্যকরী সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে।

লেনিনের নূতন অর্থনৈতিক নীতি (NEP) গ্রহণ

* "Cries of 'Down with the Soviet Government', became more and more frequent and vehement in 1920 at the meetings of the workers and peasants". Langsam, p. 567.

† "As much communism as the exigencies of the situation would permit and no more." Lenin, vide Langsam, p. 568.

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় (১) কৃষকদের নিকট হইতে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর গ্রহণের নীতি অনুসরণ করা হয়। এই কর মিটাইবার পরও যদি কোন কৃষকের হাতে উদ্বৃত্ত শস্য রহিয়া যায় তাহা হইলে উহা খোলা বাজারে বিক্রয় করিবার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়। (২) ব্যক্তিগতভাবে খুচরা কারবার চালনার অসুবিধা দূর করা হয়। কয়েকটি বিশেষ নীতি মানিয়া চলিলে যে-কেহ এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। তবে মূল্যস্তর যাহাতে কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি করা না হয় সেজন্য সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ক্রেতাদের সমবায় সমিতি স্থাপনের উৎসাহ দেওয়া হয়। (৩) ২০ জন শ্রমিকের নিম্নসংখ্যক শ্রমিক যে-সকল কারখানায় কাজে খাটান হইত সেগুলিকে মালিকদের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। (৪) ব্যাঙ্ক ও অর্থ-সংক্রান্ত ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করা হয়। (৫) বিদেশী মূলধন আকর্ষণ করিবার জন্য বিদেশী মূলধনীদিগকে মুনাফা গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাহাদের মূলধনে গঠিত শিল্প নির্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয়করণ করা হইবে না এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। (৬) সরকারী খাদ্যভাণ্ডার হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয়ের পরও প্রয়োজনবোধে খোলা বাজার হইতে অধিক পরিমাণ শস্য-ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়। শ্রমিকদের মজুরী ক্রমবর্ধমান হারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। (৭) শ্রমিক মাত্রেরই বাধ্যতামূলকভাবে ট্রেড্ ইউনিয়নের সভ্য হওয়ার নীতি পরিত্যক্ত হয়। (৮) শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী সমিতি গঠন করা হয় এবং দেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সংযোগ ও সমবায়ের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়।

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (NEP) মূলনীতি

এই নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে কৃষি, শিল্প প্রভৃতির এক দ্রুত উন্নয়ন শুরু হইল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার আরও বেশী উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে জমি ভাড়া দেওয়া বা গ্রহণ করা এবং শ্রমিক নিয়োগ করা বৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ফলে, অনেকে অপরের জমি ভাড়া করিয়া ফসল উৎপাদন শুরু করিল। এই ব্যবস্থার ফলে পুনরায় কৃষকদের মধ্যে গরীব, সচ্ছল ও অর্থশালী এই তিন শ্রেণীর উৎপত্তি হইল। এই কারণে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার গরীব কৃষকদিগকে করদান হইতে অব্যাহতি দিলেন। মোট ৩৫% কৃষক

জাতীয় উন্নয়নে সরকারী উৎসাহ দান

ইহাতে করভার হইতে মুক্ত হইল। অপর ৫৩ ভাগের উপর অতি সামান্য পরিমাণ কর স্থাপন করা হইল। অবশিষ্ট ১২ ভাগের উপর অত্যধিক পরিমাণে করভার স্থাপন করা হইল। এই শেষোক্ত কৃষকগণ 'কুলাক্' (*Kulaks*) নামে পরিচিত ছিল। করভার পুনর্বণ্টনের ফলে কৃষকদের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য অনেকটা দূর হইল।

কৃষকদের আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ

নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা NEP গ্রহণের ফলে বল্‌শেভিক্‌ শাসনের প্রথম দিকে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল তাহা বহুপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি দ্রুত গড়িয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় এক শতেরও বেশি বিদেশী প্রতিষ্ঠান রাশিয়ায় শিল্পগঠনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইল। NEP যখন চালু ছিল তখন সরকারী ব্যুরো (Bureaus) মারফৎ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার এক পরিসংখ্যান (Statistics) গ্রহণ করা হইল। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রথম রুশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

NEP-এর সুফল

পররাষ্ট্রক্ষেত্রে লেনিন শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রেস্ট্-লিট্‌ভস্কের সন্ধি দ্বারা রাশিয়ার রাজ্য কতকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও দেশের ও জনগণের স্বার্থের খাতিরে তিনি তাহাও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

লেনিন বিশ্বগ্রাসী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'থার্ড ইন্টারন্যাশনাল' বা কমিণ্টার্ণ (The Third International or Comintern)-এর অধিবেশন আহ্বান করিলেন। এই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট্ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র হইল মস্কো। সোভিয়েট সরকার এবং কমিণ্টার্ণ ইওরোপীয় দেশগুলি হইতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য সচেষ্ট হইলেন, এমন কি পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্ট্ বিপ্লব সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। কমিউনিস্ট্ নীতি এবং কার্যের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে জারতন্ত্রের আমলে রাশিয়া তুরস্ক ও চীন দেশে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়াছিল তাহা সবই স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিল। রুশ সরকার এশিয়ার পরাধীন দেশগুলিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। পারস্য ও আফগানিস্তানে রুশ দূতগণ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবিরোধী প্রচারকার্য চালাইলে এক ব্রিটিশ মিশন রাশিয়ার নিকট পারস্য ও আফগানিস্তান হইতে রুশ দূতগণের অপসারণ দাবি

লেনিনের আমলে পররাষ্ট্রীয় সমস্যা

করিলেন।* ইহা ভিন্ন অপরাপর বহু দাবিও উত্থাপন করা হইয়াছিল। রুশ-বিপ্লবকে বিফলতায় পর্যবসিত করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশী সৈন্যগণ যখন রাশিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল তখন যে সকল ব্রিটিশ সৈন্য প্রাণ হারাইয়াছিল সেজন্যও ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইল। সোভিয়েট সরকার প্রত্যুত্তরে ককেশাস অঞ্চল, সুদূর প্রাচ্য (Far East), মধ্য-এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকারের সোভিয়েট-বিরোধী কার্যকলাপের কথা জানাইলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের দাবি প্রত্যাহার করিলেন।

ইংলণ্ডের সহিত মনোমালিন্য

সোভিয়েট সরকারের অপর সমস্যা ছিল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিলাভ। ইহারও সুযোগ আসিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনে 'লেবার পার্টি' (Labour Party) ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে ব্রিটিশ সরকারের রুশ-বিরোধী নীতি কতকটা হ্রাস পাইল। ঐ বৎসরই মুসোলিনি সোভিয়েট সরকারকে আইনত স্বীকার করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার সোভিয়েট সরকারকে আইনত স্বীকার করিলে ইতালি, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, গ্রীস, সুইডেন, সোভিয়েট, ডেনমার্ক, মেক্সিকো, হাঙ্গেরী ও ফ্রান্স সোভিয়েট সরকারকে স্বীকার করিয়া লইল। এই বৎসরই (১৯২৪) রুশ-বল্‌শেভিজমের জনক লেনিনের মৃত্যু হয়।

ইংলণ্ড, ইতালি, নরওয়ে, গ্রীস, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ কর্তৃক সোভিয়েট সরকার স্বীকৃত

লেনিনের মৃত্যুর পর বল্‌শেভিক্ বা কমিউনিস্ট্ পার্টির নেতৃত্ব লইয়া লিওন ট্রট্‌স্কি ও কমিউনিস্ট্ পার্টির সেক্রেটারী-জেনারেল যোসেফ স্টালিনের মধ্যে এক তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হইল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বল্‌শেভিক্ বিপ্লবে ট্রট্‌স্কির দান নেহাৎ কম ছিল না। তিনি ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাবান সংগঠক। লাল ফৌজ তাঁহারই চেষ্টায় এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনীতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ট্রট্‌স্কির মত ও কর্ম-

ট্রট্‌স্কি-স্টালিন বিরোধ

* "These included the withdrawal of the Soviet diplomatic representatives in Persia and Afghanistan, apologies from the Soviet Government for alleged anti-British activities by these representatives......" "The Soviet Government in reply pointed out the apocryphal character of the evidence quoted in the Note, and reminded the British Government that it had ample documentary evidence of anti-Soviet activities by British agents in the Caucasus, Central Asia and the Far East."

A History of the U. S. S. R, Rothstein, p. 161.

পন্থা লেনিনের মত ও কর্মপন্থা হইতে ভিন্ন ছিল। লেনিনের জীবদ্দশায়ই ট্রট্স্কির লেনিন-বিরোধী কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তর-সাধক স্টালিনের ও ট্রট্স্কির মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হইল।

ট্রট্স্কি রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপেক্ষা পৃথিবীব্যাপী কমিউনিস্ট্ বিপ্লব সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু স্টালিন দেখিলেন যে, ধনতান্ত্রিক ইওরোপীয় দেশগুলিতে কমিউনিজম্ স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা অপেক্ষা বলশেভিক্দলের সমগ্র শক্তি রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে নিয়োজিত করাই উচিত হইবে। ইহা ভিন্ন স্টালিন ছিলেন কৃষক পরিবার-সম্ভূত। তিনি কৃষকদিগকে কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাবান করিয়া তুলিবার জন্য NEP অর্থাৎ নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত ব্যক্তিগত মালিকানার সহিত সমাজতান্ত্রিকতার যোগাযোগ আরও কিছুকাল রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ট্রট্স্কি সাধারণ কৃষক বা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সেরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি কৃষক সম্প্রদায়কে কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাবান করা অপেক্ষা ইওরোপে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব-সৃষ্টি অধিকতর প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন। তিনি ব্যক্তিগত মালিকানা বা মূলধনী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলোপ করিতে মুহূর্তকালও বিলম্বের পক্ষপাতী ছিলেন না। স্টালিন বিদেশী মূলধনের সাহায্যে রাশিয়ার শিল্পের উন্নতিসাধনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু ট্রট্স্কি বিদেশী মূলধনীদের সহিত কোনপ্রকার সম্পর্কস্থাপন দেশদ্রোহিতা বলিয়া মনে করিতেন।

ট্রট্স্কি ও স্টালিনের মধ্যে মতের পার্থক্য

ক্যামেনেভ্ ও জিনোভিয়েভ্-এর সহায়তায় স্টালিন ট্রট্স্কিকে যুদ্ধমন্ত্রীর (Commissar for War) পদ হইতে অপসারিত করিলেন। কিন্তু স্টালিনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশী মূলধনীদের সহিত যে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইয়াছিল এবং কৃষকদের উন্নতিবিধানের জন্য যে-সকল সুযোগ-সুবিধা দানের প্রয়োজন ছিল তাহা কমিউনিজমের পরিপন্থী মনে করিয়া ক্যামেনেভ্, জিনোভিয়েভ্, বুখারিন্ প্রভৃতি স্টালিনের বিরোধিতা শুরু করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্টি কংগ্রেসের লেনিনপন্থী সংখ্যাধিক্যের সহায়তায় এই দুই বিরোধী নেতাকেও অপসারণ করা সম্ভব হইল। ক্রমে ট্রট্স্কিপন্থী সকলকেই কমিউনিস্ট্ পার্টি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ট্রট্স্কিকে রাশিয়া হইতে

ট্রট্স্কি, ক্যামেনেভ্ ও জিনোভিয়েভ্-এর পতন

নির্বাসিত করিয়া স্টালিন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। নির্বাসিত অবস্থায়ই ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রটস্কির মৃত্যু হয়।

যোসেফ স্টালিন ঃ (Joseph Stalin) ঃ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর টিফলিস্ প্রদেশের গোরি নামক শহরে যোসেফ স্টালিনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ভিসারিওন্ আইভানোভিচ্ যুগাশ্‌ভিলি ছিলেন কৃষক সম্প্রদায়-সম্ভূত। তিনি মুচির কাজ করিতেন। জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে দরিদ্র জনসাধারণ হইতেও ধর্মযাজক হওয়ার অধিকার স্বীকৃত হইলে স্টালিনের পিতা তাঁহাকে টিফলিসের এক ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই স্টালিন সোশিয়েল ডিমোক্রেটিক দলের সদস্য হিসাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়ায় তাঁহাকে ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। স্টালিনের অবশ্য যাজক হওয়ার আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল না। তিনি বাইবেল অপেক্ষা মার্কস্-এর গ্রন্থাদিই অধিক মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। সুতরাং ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে তাঁহার কোনো অসুবিধাই হইল না। তিনি সর্বান্তঃকরণে মার্কস্‌বাদ কিভাবে কার্যকরী করা যাইতে পারে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ঐ সময় শ্রমিক আন্দোলন সমাজতান্ত্রিক প্রভাবের ফলে অত্যধিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। স্টালিন এই সকল আন্দোলনের পশ্চাতে যেসব গোপন বিপ্লববাদী সমিতি ও দল ছিল সেগুলির দিকে আকৃষ্ট হইলেন। পনর বৎসর বয়সে তিনি বিপ্লবী দলের সদস্য হইলেন।

স্টালিনের বাল্যজীবন

স্টালিন ছিলেন নির্ভীক, গম্ভীরপ্রকৃতির দৃঢ়চেতা পুরুষ। নিজ আদর্শে পৌঁছিবার জন্য ন্যায়-অন্যায়ের বিচার তিনি করিতেন না। বিপজ্জনক কার্যাদি সম্পাদনে তাঁহার ন্যায় অপর কেহ এতটা পারদর্শী ছিল না। এজন্য বিপ্লবীদের মধ্যে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। 'স্টালিন' কথাটির অর্থ হইল 'ইস্পাত'—তাঁহার চরিত্রের সহিত তাঁহার এই নামের সামঞ্জস্য ছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে সকল সোশিয়েল ডিমোক্রেট লেনিনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্টালিন ছিলেন অন্যতম। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া লেনিনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি লেনিনের অনুগত সহচর ছিলেন।

চরিত্র

স্টালিন দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁহার জ্ঞান নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু

মার্কস্‌বাদী গ্রন্থাদি সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান ছিল অত্যন্ত গভীর। স্টালিন ছিলেন একজন প্রকৃত শিক্ষিত মার্কস্‌বাদী।* ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টিফলিসের রেলকর্মচারীদের শিক্ষাকেন্দ্র (Study Circle) পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিক্ষা

১৯০২ হইতে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্টালিন ছয় বার ধরা পড়িয়াছিলেন এবং ছয় বারই নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। পাঁচ বার তিনি নির্বাসন-কেন্দ্র হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু ষষ্ঠ বার তাঁহাকে আর্কটিক অঞ্চলে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জারতন্ত্রের পতনের পর তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

সরকার-হস্তে নির্যাতন

বল্‌শেভিক্ বিপ্লব সাধনে স্টালিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিপ্লবাত্মক প্রভাব বিস্তার ও বল্‌শেভিক্‌দলের সংগঠন সুদৃঢ় করিবার জন্য প্রচারপত্র-রচনা, অর্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন তখন পার্টির সেক্রেটারী-জেনারেল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর (৬, ৭) মাসের বল্‌শেভিক্ বিপ্লবে স্টালিন তাঁহার সামরিক ক্ষমতারও পরিচয় দান করিয়াছিলেন। নব-গঠিত শাসনব্যবস্থায় স্টালিন Commissar of Nationalities নিযুক্ত হইলেন। এই দায়িত্ব পালন করিতে গিয়াই তিনি ট্রান্‌স্-ককেশিয়ার রিপাব্লিকের ঐক্যসাধন এবং U.S.S.R.-এর সংগঠন সম্পন্ন করেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হয় সেই বিষয়েও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

স্টালিনের সংগঠন-ক্ষমতা

বল্‌শেভিক্ বিপ্লবকে বানচাল করিবার জন্য রাশিয়ায় বৈদেশিক সহায়তায় যে অন্তর্যুদ্ধের (Civil War) সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে লেনিন স্টালিনকে সর্বাপেক্ষা কঠোর এবং কঠিন সামরিক দায়িত্ব দান করিয়াছিলেন। যেখানেই জটিল সামরিক পরিস্থিতি উপস্থিত হইত সেখানেই স্টালিনকে প্রেরণ করা হইত।†

সামরিক দক্ষতা

* "Stalin became an educated Marxist", *A Short Biography of Stalin*: Foreign Languages Publication, Moscow, 1951 p. 8.

† "Whenever confusion and panic might at any moment develop into helplessness and catastrophe, there Comrade Stalin was always sure to appear".—Voroshilov, vide *Joseph Stalin*—A short Biography, pp. 68-69.

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কি, ক্যামেনেভ, জিনোভিয়েভ, বুখারিন্ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা দমন করিয়া স্টালিন লেনিন-প্রবর্তিত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পন্থা এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য গ্রহণের নীতি চালু রাখিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্টালিনের ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও পরিদর্শনাধীনে রাশিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। NEP-এর স্থলে এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাঁচ বৎসরের মধ্যে (১৯২৮-৩৩) নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছিয়া রুশ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করিতে সমর্থ হইল। গোস্প্ল্যান বা স্টেট্-প্ল্যানিং কমিশন (*Gosplan* or State Planning Commission) এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং উহা কার্যকরী করিবার দায়িত্বও এই কমিশনের উপর ছিল। উৎপাদন, উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন, মূলধনের ব্যবস্থা, শিল্প, কৃষি, পরিবহন সব কিছুই ছিল এই কমিশনের অনুমোদনসাপেক্ষ।

গোসপ্ল্যান বা স্টেট্ প্ল্যানিং কমিশন: প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯২৮-১৯৩৩)

এই পরিকল্পনা অনুসারে শতকরা ৫৫ ভাগ ফসল বৃদ্ধি করা, এবং এই কারণে সাড়ে পাঁচ কোটি একর জমি যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানগুলির অধীনে স্থাপন করা স্থির হইল। রাশিয়ার কৃষকদের অধীন মোট জমির এক-পঞ্চমাংশ এইভাবে যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের অধীনে আনিবার ব্যবস্থা হইল। কয়লা এবং তেলের উৎপাদন দ্বিগুণ করা বৈদ্যুতিক শক্তি অন্ততঃ তিনগুণ বৃদ্ধি করা এবং শিল্পোৎপাদন মোট চার গুণ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইল। শিল্পজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য টেক্‌নিক্যাল স্কুল স্থাপন, বিদেশী শিল্প-শিক্ষকদের আমন্ত্রণ, নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ, মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষ্টিমূলক আনন্দদানের জন্য প্রতি গ্রামে সঙ্গীত, অভিনয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠান স্থাপনও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম অংশ হিসাবে গৃহীত হইল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এই অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধন একমাত্র সর্বসাধারণের অক্লান্ত শ্রমের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল। সংবাদপত্র, বক্তৃতা, সিনেমা, রেডিও, শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে সমগ্র রুশ জাতির মধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ইচ্ছা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায়ই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে জনগণের আগ্রহ

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পাঁচ বৎসরের পূর্বেই সম্পন্ন করা হইল। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার ফলে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তুলনায় রাশিয়ার কয়লা ও খনিজ তৈলের উৎপাদন দ্বিগুণ হইল। লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদনও ঠিক অনুরূপ বৃদ্ধি পাইল। বৈদ্যুতিক শক্তি তিনগুণে পরিণত হইল। দেশের সর্বত্র বিশাল বিশাল শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন-প্রতিষ্ঠান, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, রেলইঞ্জিনের কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কারখানা, মোটরগাড়ী প্রস্তুতের কারখানা, ঔষধ প্রস্তুতের প্রতিষ্ঠান, নূতন নূতন কয়লার খনি, ট্রাক্টর প্রস্তুতের কারখানা প্রভৃতি গড়িয়া উঠিল। মানুষের শ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়নের এক চরম দৃষ্টান্ত রাশিয়া স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। পরিকল্পনা গ্রহণের দুই বৎসরের মধ্যে মোট এগার শত মাইল রেলপথ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুফল

কৃষির ক্ষেত্রেও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমভাবেই ফলপ্রসূ হইল। পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট কৃষি-জমির শতকরা ২০ ভাগ যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠানের অধীনে আনা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মোট ৬০% কৃষি-জমি এইরূপ প্রতিষ্ঠানের অধীনে আসিয়াছিল। রাষ্ট্র পরিচালিত বিরাট বিরাট কৃষিপ্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইয়াছিল। যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের ফলে কুলাক্ নামক বিত্তশালী কৃষকদের ব্যক্তিগত মালিকানা ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য নাশ হইয়াছিল। কৃষির উন্নতির জন্য সরকারী ঋণদান, করহ্রাস, পুরস্কার ইত্যাদি নানাপ্রকার উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল।

কৃষির উন্নতি : যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান স্থাপন

শিক্ষাবিস্তারের দিক দিয়াও প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ধনতান্ত্রিক শিক্ষার স্থলে সাম্যবাদী শিক্ষার বিস্তার-দ্বারা ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তি দূর করিবার জন্য কমিউনিস্ট্ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক শিশুর পক্ষে মোট সাত বৎসরের জন্য স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করা ছিল বাধ্যতামূলক। ফলে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৩ জন সেখানে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা মাত্র ১৯ জনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

শিক্ষার উন্নতি : রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা

জাতীয় জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে ধর্মের কোন স্থান আছে বলিয়া কমিউনিস্ট্‌গণ বিশ্বাসই করে না। মার্কস্‌বাদ বস্তুতান্ত্রিকতার উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দিয়াছে। ফলে, রাশিয়ার ধর্মবিষয়ে উৎসাহ দান দূরের কথা ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয় যাদুঘরে পরিণত করা হইয়াছিল। প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কমিউনিস্ট্‌ পার্টির সভ্যাদিগের চার্চে প্রার্থনায় যোগদান করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। জারতন্ত্রের প্রধান সহায়ক ছিল রুশ চার্চ ও যাজক সম্প্রদায়। এই কারণে চার্চের সম্পত্তি রাষ্ট্র আয়ত্তে আনা হইয়াছিল। কমিউনিজমের ধর্ম-বিরোধিতার প্রধান যুক্তি হইল এই যে, ধর্ম মানুষকে আফিংয়ের ন্যায় নির্জীব করিয়া রাখে। স্বর্গরাজ্যে ভগবানের নিকট হইতে যথাযথ পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া ইহজগতে মানুষকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিবার কথাই ধর্মে বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এই 'আফিংয়ের' নেশা ভাঙ্গিয়া দিলেই মানুষ নিজ অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইবে।* এই কারণেই রাশিয়ায় ধর্ম সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

চরম ধর্মনিরপেক্ষতা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য স্বভাবতই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের উৎসাহ সৃষ্টি করিল। কিন্তু এইবার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির গুণও যাহাতে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ সেগুলি যাহাতে প্রথম স্তরের সামগ্রী হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হইল। শিল্পজ্ঞান ও টেক্‌নিক্যাল জ্ঞানের দিক দিয়াও রাশিয়া যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে সেই চেষ্টাও করা হইল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (জানুয়ারি ১৯৩৩ হইতে ডিসেম্বর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) শিল্পোৎপাদন প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়াইবার চেষ্টা চলিল। কৃষির জন্য সার উৎপাদন দশগুণ, মোটর-গাড়ীর প্রস্তুতের সংখ্যা সাতগুণ, ইস্পাত ও কয়লা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইল। ইহা ভিন্ন টেক্‌নিক্যাল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ (৪৬½%), চিনি ও বস্ত্রশিল্প শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গৃহীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৩৩-১৯৩৭)

---

* "Religion is the opiate of the people".—*Lenin*.

মালিকানার অবসান, নিরক্ষরতা প্রভৃতির সম্পূর্ণ অবসান এবং বাধ্যতামূলকভাবে সকল শিশুকেই সাত বৎসরকাল পলিটেক্‌নিক্যাল শিক্ষা (Polytechnical education) দানের ব্যবস্থা করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা চলিল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৩৮-১৯৪২) কার্যকরী করা হইল। তৃতীয় পরিকল্পনাকাল অতীত হইলে রাশিয়া শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিম ইওরোপের সকল দেশ অপেক্ষাই অধিকতর ক্ষমতাশালী দেশে পরিণত হইয়াছিল।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৩৮-১৯৪২): প্রথম স্তরের শিল্পোৎপাদক দেশে পরিণত

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার সমস্যার অবসান, ব্যক্তিমাত্রেরই ক্রয়ক্ষমতা-বৃদ্ধি প্রভৃতি সাধিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। কৃষিপ্রধান দেশ রাশিয়া পৃথিবীর শিল্পোৎপাদক দেশের অন্যতম হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

স্টালিনের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy of Stalin): আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে স্টালিন শান্তি বজায় রাখিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

রাশিয়ার উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার নীতি

তাঁহার পরিকল্পিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি এবং বৈদেশিক সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং স্টালিন কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক প্রয়োগ-নীতি ত্যাগ করিয়া জাতীয় গণ্ডীর মধ্যেই উহা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহিলেন। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ উন্নতি-ই পৃথিবীর নিকট কমিউনিজমের সার্থকতা প্রমাণ হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের লেবার (Labour) মন্ত্রিসভার পতনের পর বল্‌ডুইন-এর রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার অধীনে ইঙ্গ-সোভিয়েট ঋণ-সংক্রান্ত চুক্তি

রাশিয়ার সহিত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মনোমালিন্য

সম্পাদনের আশা বিনষ্ট হইল। ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি বল্‌শেভিক্ দলের বিরোধিতায় বানচাল হইল। ফ্রান্সের সৌখীন সামগ্রী বল্‌শেভিক্ দল রাশিয়ায় আমদানি করিবার পক্ষপাতী ছিল না। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্নো চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়ায় এই ধারণার সৃষ্টি হইল যে, উহা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির

পূর্বাভাস মাত্র। এই কারণে রাশিয়া বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায়স্বরূপ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সহিত 'না-আক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact) স্বাক্ষর করিল। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ধর্মঘট দেখা দিলে রাশিয়ার বল্‌শেভিক্ ট্রেড্ ইউনিয়নগুলি ধর্মঘটী শ্রমিকদের অর্থ-সাহায্য দান করে। এই সূত্রে ক্রমে ইঙ্গ-সোভিয়েট মনোমালিন্য বৃদ্ধি পায় এবং ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক আদান-প্রদান (Diplomatic relations) বন্ধ করে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় লেবার পার্টি মন্ত্রিত্ব লাভ করিলে রাশিয়ার সহিত যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হয়।

তুরস্ক ও জার্মানির সহিত 'না আক্রমণ চুক্তি' স্বাক্ষরিত

ইংলণ্ডের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ নাশ (১৯২৭): কূটনৈতিক সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন (১৯২৯)

এদিকে ফ্রান্সের সহিতও রাশিয়ার মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইয়া চলিল। রাশিয়া ফ্রান্সের সৌখীন সামগ্রী ক্রয় না করায় এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-শত্রু জার্মানির সহিত রাশিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হওয়ায় ফ্রান্স ক্রমেই সোভিয়েট-বিরোধী হইয়া উঠিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী পোয়েনকেরি (Poincare) ফ্রান্স হইতে রুশদূতের অপসারণ দাবি করেন। ঐ বৎসরই চীন দেশের জাতীয়তাবাদী দল পেকিং-এর সোভিয়েট দূতাবাস আক্রমণ করে এবং পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট দূতকে হত্যা করা হয়। এই সকল ঘটনার ফলে স্বভাবতই রাশিয়ায় এক দারুণ ভীতির সঞ্চার হয়। রাশিয়া নিজ নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে পারস্য, ল্যাট্‌ভিয়া প্রভৃতি দেশের সহিত 'না-আক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact), কেলগ্ চুক্তি (Kellog Pact) প্রভৃতি স্বাক্ষর করে। তুরস্ক ও ইতালির দ্বন্দ্বে রাশিয়া মধ্যস্থতা করিয়া সেই মনোমালিন্য দূর করিতে সমর্থ হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জার্মানির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া জার্মানির নিকট হইতে এক বিরাট পরিমাণ ঋণগ্রহণের সুযোগ প্রাপ্ত হয়। সোভিয়েট-ইতালি-জার্মানি-তুরস্ক মৈত্রী বৃদ্ধি পাইলে ফ্রান্স ক্রমেই রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠে। ইহা ভিন্ন রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যের সুযোগ হইতেও ফ্রান্স বঞ্চিত

ফ্রান্সের সহিত মনোমালিন্য, চীনে সোভিয়েট দূতাবাস আক্রান্ত, পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট দূতকে হত্যা

রাশিয়ার ভীতি: পারস্য ও ল্যাট্‌ভিয়ার সহিত 'না-আক্রমণ চুক্তি', কেলগ্ চুক্তি, জার্মানির সহিত মৈত্রী

ফরাসী-ইংলণ্ড-আমেরিকার অর্থনৈতিক বিরোধিতা:

ছিল।* এই কারণে ফ্রান্স রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি ইওরোপীয় শক্তি-সংঘ গঠন করিতে সচেষ্ট হয়। রাশিয়া সস্তা দরের সামগ্রী দ্বারা ইওরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনাশের চেষ্টা করিতেছে এই অভিযোগ ফ্রান্স উত্থাপন করিলে আমেরিকা ও ব্রিটেন উহার সমর্থন করে। এই সকল দেশ রাশিয়া হইতে গম, তুলা ও কাঠ আমদানি বন্ধ করিবার জন্য আন্দোলন শুরু করিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই এই সকল দেশের নীতি পরিবর্তিত হইল। হিট্‌লারের অধীনে জার্মানি কমিউনিস্ট্‌ বিরোধী হইয়া উঠিলে এবং বিশেষত হিট্‌লার 'সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী' এই ঘোষণা করিলে সোভিয়েট-জার্মান মৈত্রী শিথিল হইয়া পড়িল। তদুপরি জার্মানির অর্থনৈতিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাইলে আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন রাশিয়া অধিকতর লাভজনক মনে করিল। অপর দিকে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশও রাশিয়ার ন্যায় শিল্পোন্নত দেশকে বাদ দিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য চালনার অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া রাশিয়ার সহিত নিছক আদর্শগত দ্বন্দ্বের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করিতে চাহিল না।

ইওরোপীয় দেশগুলির সোভিয়েট নীতির পরিবর্তন

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জেনিভা কন্‌ফারেন্স-এ ইওরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পরস্পর মৈত্রীর পথ আরও সহজ হইয়া উঠিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন মনোভাবের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় ফরাসী-সোভিয়েট 'না-আক্রমণ চুক্তি' সম্পাদনে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট্‌ রুজভেল্ট্‌ রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন। উভয় পক্ষে সরকারীভাবে যে সকল চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইল তাহাতে উভয় দেশই পরস্পর স্বার্থের হানি করিবে না এই প্রতিশ্রুতি দান করিল।

ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি, মার্কিন-সোভিয়েট মৈত্রী

জার্মানি ও জাপানের যুদ্ধপ্রস্তুতি রাশিয়ারও ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। রাশিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর শক্তিবৃদ্ধি স্বভাবতই কামনা করিত। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও জাপান লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ ত্যাগ করিলে পরবৎসরই রাশিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্য হিসাবে গৃহীত হয়। স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে তথাকার প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক

রাশিয়া লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য হিসাবে গৃহীত (১৯৩৪)

* "The Paris Government was alarmed at the growing Russian-German-Italian-Turkish friendship and disgruntled over France's inability to capture profitable Soviet foreign trade". Langsam, p. 594.

প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য রাশিয়া সাহায্য দান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় নাই। এদিকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিক চুক্তি দ্বারা ফ্রান্স ও ইংলণ্ড হিট্‌লারকে স্বদেতেনল্যাণ্ড দান করিলে রাশিয়া এককভাবে চেকো-স্লোভাকিয়ার সাহায্যার্থে অগ্রসর হয় নাই বটে, কিন্তু ঐ সময় হইতেই ইওরোপীয় শক্তিবর্গের প্রতি রাশিয়ার মনোভাব পরিবর্তিত হইতে থাকে। রাশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠে। রুশ পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী লিট্‌ভিনোভ্-এর পদত্যাগ এবং মলোটভ্-এর ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। লিট্‌ভিনোভ্ ছিলেন রুশ-ইঙ্গ-ফরাসী সমবায়ের মাধ্যমে ইওরোপীয় নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষপাতী। তাঁহার পদত্যাগের পর এই নীতি স্বভাবতই পরিত্যক্ত হইল। ইহার ফল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে সোভিয়েট-জার্মান 'না-আক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact)-তে পরিলক্ষিত হয়।

মিউনিক চুক্তি (১৯৩৮): রুশনীতির পরিবর্তন

সোভিয়েট-জার্মান 'না-আক্রমণ চুক্তি' (১৯৩৯)

জার্মানি (Germany)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানি: নাৎসি দলের উত্থান (Post-war Germany : Rise of Nazism): প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির চরম পরাজয়ের ফলে জার্মানির রাজ্যসীমা ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যই হ্রাস পাইল না, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে জার্মানির মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নাশ হইল। আভ্যন্তরীণ-ক্ষেত্রে এক গভীর হতাশা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখা দিল। এমতাবস্থায় শাসনব্যবস্থা ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িল। দেশে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিল। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম যুদ্ধে পরাজয়ের সময় হইতে ভীত, সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাইতেছিলেন। আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দেখা দিলে তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির রাজতন্ত্রের অবসান হইল। জার্মানি একটি প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইল। সাময়িকভাবে 'কাউন্সিল-অব-পিপল্‌স-

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির দুরবস্থা, কাইজারের পলায়ন—জার্মানি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত

কমিসার' (Council of People's Commissar) নামে এক কার্যনির্বাহক সমিতির উপর জার্মানির শাসনভার ন্যস্ত হইল। এই সমিতি প্রধানত সমাজতান্ত্রিক প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত ছিল। সমিতির যুগ্ম সভাপতি হইলেন ফ্রেডারিক ইবার্ট ও হ্যাসি। কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের আমলের বহু সরকারী কর্মচারী তখনও কাজে বহাল রহিলেন। একমাত্র কমিউনিস্ট্ দল এই নবগঠিত সরকারের সহিত সহযোগিতায় রাজী হইল না। জার্মানির কমিউনিস্ট্‌গণ 'স্পার্টাকাস্' (Spartacus) নামে পরিচিত ছিল। নবগঠিত সরকার জনসাধারণকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে এবং ধন-প্রাণের নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া চলিতে অনুরোধ জানাইলেন। দেশের স্থায়ী শাসনব্যবস্থা জাতীয় সংবিধান সভা কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে এই আশ্বাসও দেওয়া হইল। 'স্পার্টাকাস্' দল তাহাদের নেতা লাইবনেক্‌ট্ (Liebnecht)-এর অধীনে পূর্ণমাত্রায় কমিউনিজম্ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদসাধন করিতে চাহিলে ইবার্ট তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিলেন। লাইবনেক্‌ট্-এর প্রধান সহচর ছিলেন রোসা লাক্সেমবুর্গ। তাঁহারা এক সশস্ত্র আন্দোলন চালাইতে গিয়া পরাজিত এবং সরকার কর্তৃক ধৃত হইলেন এবং জেলখানায় লইয়া যাওয়ার পথে বিরোধী পক্ষের উত্তেজিত সমর্থকগণ কর্তৃক নিহত হইলেন। এইভাবে 'স্পার্টাকাস্' দল কর্তৃক ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা বিফল হইল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি এক সপ্তাহ গোলযোগের পর স্পার্টাকাস্‌দের পতন ঘটিলে ১৯শে তারিখ জাতীয়-সভার নির্বাচন সম্পন্ন হইল।

সমাজতান্ত্রিক শাসন স্থাপন

'স্পার্টাকাস্'

'স্পার্টাকাস্' দলের পতন

সমগ্র জার্মানি ভোটাধিকারপ্রাপ্ত মোট ৩২১/২ কোটি নাগরিকদের মধ্যে মোট ৩ কোটি স্ত্রী-পুরুষের ভোটে জাতীয় প্রতিনিধিগণ নির্বাচিত হইলেন। মোট ৪২১টি আসনের মধ্যে 'সোশিয়্যাল ডিমোক্রেটিক' ১৬৩টি আসন লাভ করিল, সেন্টিস্ট্ বা খ্রীষ্টান ডিমোক্র্যাট্‌স্ ৮৮, ডিমোক্রেটিক দল ৭৫, ন্যাশন্যালিস্ট্ দল ৪২, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট্ দল ২২ এবং পিপ্‌লস্ পার্টি ২১টি আসন প্রাপ্ত হইল। বাকী দশটি আসন অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের অধিকারে আসিল। স্পার্টাকাস্ দল নির্বাচনে অংশ-গ্রহণ করিল না।

জাতীয় সভার গঠন

এই জাতীয় সংবিধান সভা উইমার (Weimar) নামক স্থানে অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া জার্মানির জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গ্রহণ করিল। এই সংবিধান পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং উইমার অধিবেশনে উহা গৃহীত হইতে অধিক সময় লাগিল না। এই শাসনতন্ত্র বা সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ একজন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন স্থির হইল। একটি দুই কক্ষ-যুক্ত পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবে। উর্ধ্ব কক্ষের নাম হইল 'রাইক-স্ট্যাডাট্' (Reichs-tadt) এবং নিম্ন কক্ষের নাম হইল 'রাইক্স্ট্যাগ্' (Reichstag)। উর্ধ্ব কক্ষ জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত হইবে আর নিম্ন কক্ষের সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোটে নির্বাচিত হইবেন। ফ্রেডারিক ইবার্ট (Friedrich Ebert) এই শাসনব্যবস্থায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন।

উইমার সভার কার্যাদি :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গ্রহণ : ইবার্ট প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

উইমার জাতীয় সভার দ্বিতীয় সমস্যা ছিল মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি সম্পাদন। মিত্রপক্ষের চাপে জার্মানি ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উইমার সভা সন্ধির শর্তাদি অনুমোদন করিয়া মিত্রপক্ষের সহিত পুনরায় যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিয়াছিলেন।

ভার্সাই-এর সন্ধি স্থাপন

জাতীয় সভার অপর সমস্যা ছিল বিরোধী দলগুলিকে দমন। ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলির কঠোরতা এবং মিত্রপক্ষের হস্তে জার্মান জাতির অপমান জার্মানির সর্বত্র এক ব্যাপক বিদ্বেষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ সার উপত্যকা (Saar Valley) সাময়িকভাবে জার্মানির হস্তচ্যুত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। স্বভাবতই তাহারা ইবার্টের শাসনের প্রতি সন্দিগ্ধ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। জার্মানির দেশপ্রেমিক সৈনিক-সম্প্রদায় জার্মান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি সহ্য করিতে রাজী ছিল না। ফলে, নবগঠিত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটাইবার গোপন ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর উল্ফ্‌গ্যাং ক্যাপ্ (Dr. Wolfgang Kapp) এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লুডেনড্রফ্ (General Ludendroff) বলপূর্বক শাসন-

উলফ্‌গ্যাং ও লুডেন-ড্রফের বিফলতা

ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই উভয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহাত্মক কার্যাদি দমন ভিন্ন বিজেতা শক্তিবর্গ কর্তৃক জার্মানির উপর যে এক বিশাল ক্ষতিপূরণের ভার চাপান হইয়াছিল তাহার সংস্থান করা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল সন্দেহ নাই। জার্মানির উপর যুদ্ধ-সৃষ্টির অপরাধের শাস্তিস্বরূপ মোট ৬৬০ কোটি পাউণ্ড ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব চাপান হইয়াছিল। এইরূপ অভাবনীয় পরিমাণ ক্ষতিপূরণের অযৌক্তিকতা এবং উহা দিবার অক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাইয়াও জার্মানির কোন ফল হইল না। ফলে, সামান্য কিছু অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়ার পরই জার্মানি অক্ষমতা হেতু ক্ষতিপূরণ দেওয়া বন্ধ করিল। ফ্রান্স জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে জার্মানির রুহ্‌র (Ruhr) অঞ্চল দখল করিল। এই সূত্রে ঐ অঞ্চলে এক ব্যাপক ধর্মঘট ও অরাজকতার সৃষ্টি হইল। রুহ্‌র অঞ্চল ছিল জার্মানির সর্বাপেক্ষা অধিক শিল্পোন্নত অঞ্চল। ফ্রান্সের রুহ্‌র অঞ্চল দখলের প্রত্যুত্তর-স্বরূপ এই অঞ্চলের কারখানাসমূহ বন্ধ হইয়া গেলে জার্মানির জনসাধারণের দুর্দশা চরমে পৌঁছিল। এই জাতীয় সংকটে স্ট্রেসিম্যান (Stresemann) নামে একজন বিচক্ষণ জার্মান নেতা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি ধর্মঘট প্রভৃতি বন্ধ করিয়া কলকারখানা পুনরায় চালু করাইলেন। এদিকে জার্মানির নিকট হইতে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হইবে এবং কিভাবে তাহা আদায় করা হইবে সেই প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য ব্রিটিশ, ফরাসী, ইতালীয় ও বেলজিয়ান সরকার একটি 'ক্ষতিপূরণ কমিশন' (Reparation Commission) স্থাপন করিলেন। মার্কিন সরকারও এই কমিশনে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। চার্লস ডাওয়েস্ (Charles Dawes) নামে একজন মার্কিন অর্থনীতিক এই কমিশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। এই কমিশন 'ডাওয়েস্ প্ল্যান' (Dawes Plan) নামে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিল। ইহাতে দীর্ঘকাল ধরিয়া অল্প অল্প কিস্তিতে জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা

জার্মানির পক্ষে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দানের সমস্যা

ফ্রান্স কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল দখল

ক্ষতিপূরণ কমিশন: 'ডাওয়েস্ প্ল্যান'

রুহ্‌র হইতে ফরাসী সৈন্য অপসারণ

করা হইল। জার্মানি ডাওয়েস্ প্ল্যান গ্রহণ করিলে ফরাসী সৈন্য রুহ্‌র অঞ্চল ত্যাগ করিল।

জার্মানি ও বেলজিয়াম, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সীমা নির্ধারণ লইয়া তখনও আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। ফ্রান্স ভবিষ্যতে জার্মানির আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয় লইয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'লোকার্ণো চুক্তি' (Locarno Pact) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা জার্মানি ও বেলজিয়াম, জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। এই সমস্যার সমাধানের ফলে জার্মানি লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে॥ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেই জার্মান রাষ্ট্রপতি ইবার্টের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার স্থলে হিণ্ডেনবুর্গ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

লোকার্ণো চুক্তি : (১৯২৫) : জার্মানি-বেলজিয়াম, জার্মানি-ফ্রান্সের সীমা নির্ধারণ

রাজনৈতিক পরিস্থিতি কতকটা শান্ত হইলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জার্মানির অবস্থা দিন দিনই দুর্দশার চরমে পৌছিতেছিল। ডাওয়েস্ প্ল্যান অর্থনৈতিক বিষয়ে কতকটা সুবিধা করিয়া দিলেও ক্ষতিপূরণের মোট পরিমাণ জার্মানির অর্থনৈতিক সর্বনাশ সাধন না করিয়া আদায় করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই জার্মানি ক্ষতিপূরণের পরিমাণ-হ্রাসের দাবি জানাইল। মিত্রপক্ষ (The Allies) আওয়েন ইয়ং (Owen Young) নামে একজন অর্থনীতিকের সভাপতিত্বে পুনরায় একটি কমিশন নিযুক্ত করিল। এই কমিশনেরও দায়িত্ব ছিল জার্মানি হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের সমস্যার সমাধান করা। আওয়েন কমিশন ক্ষতিপূরণের পরিমাণকে (১) অবশ্য দেয় এবং (২) পরিস্থিতি বিবেচনায় স্থগিত রাখা যাইতে পারে—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন জার্মানিকে দীর্ঘ ৫৯ বৎসর ধরিয়া কিস্তি দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিবার সুযোগ দেওয়া হইল এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে জার্মানির উপর কোনপ্রকার বিদেশী পরিদর্শন-ব্যবস্থা থাকিবে না এই সুপারিশও করা হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইয়ং প্ল্যান কার্যকরী হইল এবং জার্মানি মার্কিন সরকারের নিকট হইতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণের কিস্তি দিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পৃথিবীর সর্বত্র এক ব্যাপক অর্থনৈতিক অবনতি

আওয়েন ইয়ং প্ল্যান

অর্থনৈতিক অবনতি : জার্মানির ক্ষতিপূরণ দান বন্ধ

(Economic depression) দেখা দিলে মার্কিন সরকার জার্মানিকে ঋণদানে অক্ষমতা জানাইলেন। ফলে, জার্মানির পক্ষে ক্ষতিপূরণ দেওয়াও অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই অর্থনৈতিক অক্ষমতার জন্য জার্মানির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হইল।

জার্মানির অর্থনৈতিক দুরবস্থা : নাৎসি দলের উত্থান (Economic prostration of Germany : Rise of Nazism) : প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর জার্মানির আর্থিক দুর্দশা অপরাপর দেশ অপেক্ষা বহুগুণে বেশি ছিল। মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম অসাধারণ-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশার সীমা ছিল না। এইরূপ অবস্থায় যে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। জনসাধারণের দুর্দশায় সুযোগে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্যের প্রভাব সহজেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই সময়ে এড্‌লফ্‌ হিট্‌লার নামক একজন প্রাক্তন সৈনিক ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্‌ বা নাৎসি (National Socialist or Nazi) নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। জনসাধারণের চরম দুর্দশার সুযোগ লইয়া হিট্‌লার ও তাঁহার অনুচরবর্গ সহজেই নাৎসি দলের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইলেম। জনসাধারণ তখন যে-কোন প্রচারকার্যেই কর্ণপাত করিতে প্রস্তুত ছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার লুডেনড্রফ্‌-এর সহযোগিতায় বলপূর্বক শাসনক্ষমতা হস্তগত করিতে অগ্রসর হন। তাঁহার এই চেষ্টা বিফল হয় এবং হিট্‌লার ও তাঁহার অনুচরদের অনেকে কারারুদ্ধ হন। কারাবাসেই হিট্‌লার তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেঁইন ক্যাম্ফ্‌' (Mein Kampf) রচনা করেন।

অর্থনৈতিক দুর্দশা : নাৎসিদলের সৃষ্টি

হিট্‌লারের শাসন-ক্ষমতা লাভের চেষ্টা ব্যর্থ

নাৎসি দলের সদস্য-সংখ্যা এদিকে দিন দিনই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নাৎসি দলের সমর্থক-সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে, ঐ বৎসরের সাধারণ নির্বাচনে নাৎসি দলের প্রতিনিধিগণ রাইক্‌স্ট্যাগ্‌-এ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হন। ফলে, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ হিট্‌লারকে চ্যান্সেলর বা প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হন। ইহার অল্পকাল পরে হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হইলে হিট্‌লার প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেণ্ট উভয় পদই স্বয়ং গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি ক্রমেই নিজ ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ ও

সর্বাত্মক করিয়া তুলিতে থাকেন। তিনি জাতির প্রতিনিধি-সভা রাইক্‌-স্ট্যাগ্‌কে শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিতে সম্মত করান। ফলে, হিট্‌লার জার্মানির শাসনব্যবস্থায় সর্বোচ্চ অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হইতে সমর্থ হন। তিনি জার্মানির 'ফুহ্‌রার' (Fuhrer) বা প্রধান নেতার উপাধি ধারণ করেন।

রাইকস্ট্যাগে নাৎসি দলের সংখ্যাধিক্য: হিট্‌লার চ্যান্সেলর-পদে নিযুক্ত

হিট্‌লারের সর্বাত্মক ক্ষমতা লাভ

হিট্‌লার ছিলেন ইহুদি ও কমিউনিস্ট্‌-বিরোধী। এই দুইয়ের উপর তিনি গোপনে নানাপ্রকার অকথ্য অত্যাচার চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচার-অবিচারে অতিষ্ঠ হইয়া বহু ইহুদি জার্মানি ত্যাগ করিয়া অপরাপর দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনও ইহুদি-বিতাড়নের বর্বরতা হইতে রক্ষা পান নাই। কমিউনিস্ট্‌-গণকেও অনুরূপ নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। হিট্‌লারের আদেশে জার্মানিতে মার্কস্‌বাদের প্রচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিতে হইয়াছিল, শ্রমিকদের ট্রেড্‌ ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং কমিউনিস্ট্‌-পন্থীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। দেশে নিজ ক্ষমতা নিরঙ্কুশ ও সর্বাত্মক করিয়া তুলিবার জন্য হিট্‌লার নিজ দলের মধ্যে যে-সকল ব্যক্তি ভিন্ন মত পোষণ করিতেন তাহাদিগকে হয় কয়েদ করিলেন নতুবা দেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন। এইভাবে তিনি নিজ ক্ষমতাকে জাতীয় জীবনের প্রতিস্তরে অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইলেন।

ইহুদি ও কমিউনিস্ট্‌ দলন

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে হিট্‌লার চাহিয়াছিলেন সমগ্র জার্মান জাতিকে অধিকতর সংহতসম্পন্ন করিয়া জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবন সাধন করিতে। এইজন্য তিনি প্রথমে প্রাদেশিক প্রতিনিধি-সভা বা ডায়েট (Diet) উঠাইয়া দিয়া শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করিলেন। সমগ্র দেশের শাসনভার নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া তিনি অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে মনোযোগ দিলেন। তিনি শিল্প, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষি প্রভৃতি সবকিছুর উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। কৃত্রিম উপায়ে পেট্রোল, পশম, রবার প্রভৃতি প্রস্তুতের বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় আবিষ্কৃত হইল। দেশের কাঁচামাল

দেশের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীকরণ

অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন

যাহাতে কোনভাবে নষ্ট না হইতে পারে সেজন্য কাঁচামালের রেশনিং (Rationing) ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনীর সংখ্যা বাড়াইয়া একদিকে যেমন দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হইল তেমনি অপরদিকে দেশের বেকার-সমস্যা বহু-পরিমাণে লাঘব করা হইল।

সামরিক শক্তি বৃদ্ধি

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া হিট্‌লার ভার্সাই-এর সন্ধিতে জার্মানির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন। জার্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলমাত্রকেই তিনি জার্মানির সহিত সংযুক্ত করিতে চাহিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি স্বাক্ষর করায় জার্মানিকে লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর সদস্য করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে Disarmament Conference হইতে জার্মানি বাহির হইয়া আসে এবং লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করে। Disarmament Conference-এ ফ্রান্স জার্মানির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জার্মানি অপেক্ষা অধিক সংখ্যক সৈন্য রাখিবার দাবি করে, অপর দিকে ফ্রান্সের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্য জার্মানি অন্তত ফ্রান্সের সমপরিমাণ সামরিক শক্তি রাখিতে চাহে। এই সূত্রে ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে জার্মানি এই সম্মেলনের অধিবেশন ত্যাগ করে। ইহার অব্যবহিত পরে লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া জার্মানি নিজ ইচ্ছামত সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। জার্মানিতে সামরিক বৃত্তি পুনরায় বাধ্যতামূলক করা হয়। এই সকল কার্য হইতেই জার্মানির ভবিষ্যৎ পন্থা কি হইবে ধারণা করা যায়।

জার্মানির Disarmament Conference ও লীগ-অব-ন্যাশনস্ ত্যাগ

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি অমান্য করিয়া রাইন অঞ্চলটি দখল করিয়া লইলেন। এইভাবে ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তভঙ্গের পরও ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের দিক হইতে কোন তীব্র প্রতিবাদ হইল না দেখিয়া হিট্‌লার তাঁহার রাজ্যগ্রাস নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

হিট্‌লার কর্তৃক রাইন অঞ্চল দখল (১৯৩৬)

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে কমিউনিস্ট্ প্রভাব-বৃদ্ধি প্রতিহত করিবার জন্য জেনারেল ফ্রাঙ্কো (General Franco) কমিউনিস্ট্-বিরোধী এক বিদ্রোহ সৃষ্টি

করেন। স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকার ছিলেন কমিউনিস্ট্-প্রভাবিত। সুতরাং কমিউনিস্ট্ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ ও ব্যক্তিমাত্রেই স্পেনীয় সরকারের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ফ্যাসিস্ট্ ইতালি ও নাৎসি জার্মানি জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো স্পেনীয় সরকারের বিরুদ্ধে অন্তর্যুদ্ধে জয়ী হইলেন। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ স্বৈরাচারী একক অধিনায়কত্ব ও গণতন্ত্র এই দুই রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্বস্বরূপ ছিল। এই দ্বন্দ্বে স্বৈরতন্ত্রের জয় হওয়ায় হিট্‌লার ও মুসোলিনির সমর্থক আর একটি তৃতীয় শক্তির সৃষ্টি হইল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঐ সময়ে মতানৈক্য থাকায় এই দুইয়ের কেহই স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে কোন পক্ষকেই সমর্থন করিল না।

স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ

হিট্‌লার ও মুসোলিনির নীতির জয়লাভ

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অপর একটি বিশেষ ঘটনা হইল জার্মানি ও জাপানের মধ্যে মিত্রতা-স্থাপন। জার্মানি জাপানের সহিত এক কমিউনিস্ট্-বিরোধী চুক্তি (Anti-Comintern Pact) স্বাক্ষর করে। পর বৎসর (১৯৩৭) ইতালি এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিলে জার্মানি-জাপান-ইতালি এই তিন দেশের মধ্যে এক মৈত্রী স্থাপিত হইল। বিরুদ্ধ পক্ষ তখন ছিল ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংলণ্ড।

জার্মানি-জাপান-ইতালি মৈত্রী

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার জার্মানির সামরিক শক্তির সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করিলেন। সুতরাং জার্মানির শক্তি-শকট চালনায় তাঁহার আর কোন প্রতিবন্ধক রহিল না। সামরিক নেতৃবৃন্দমাত্রেরই তাঁহার প্রাধান্যাধীনে স্থাপিত হওয়ায় তাঁহার ইচ্ছামত রাজ্যগ্রাস নীতি অনুসৃত হইতে লাগিল। ঐ বৎসরই হিট্‌লারের ইঙ্গিতে অস্ট্রিয়ার নাৎসি দলভুক্ত ব্যক্তিগণ এক দারুণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে হিট্‌লার অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর সুচ্‌নিগ্ (Schuschnigg)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে নাৎসি দলভুক্ত অস্ট্রিয়ানদের মধ্য হইতে কয়েকজন মন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। সুচ্‌নিগ্ হিট্‌লারের প্রস্তাবে রাজী হইলেন, কিন্তু অস্ট্রিয়া তাহাতেও জার্মান আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইল না। অল্পকালের মধ্যেই হিট্‌লার সৈন্য প্রেরণ করিয়া অস্ট্রিয়া দখল করিয়া লইলেন। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধের কালে হিট্‌লার ইঙ্গ-ফরাসী দুর্বলতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। এই কারণেই তিনি ভার্সাই-এর শর্ত ভঙ্গ করিয়া অস্ট্রিয়া দখল করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

হিট্‌লার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল

অস্ট্রিয়ার পর হিট্‌লারের দৃষ্টি পড়িল চেকোস্লোভাকিয়ার উপর। চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল ছিল জার্মান-অধ্যুষিত। হিট্‌লার ঐ অঞ্চলে তাঁহার 'পঞ্চম-বাহিনী' (Fifth column) অর্থাৎ অর্থভোগী গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে জার্মানির সহিত সংযুক্তির এক দারুণ আন্দোলন শুরু করাইলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে হিট্‌লার সুদেতেন অঞ্চল (Sudeten land) জার্মানির সহিত সংযুক্তি দাবি করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়ার বিপত্তি আরও দুই দিক হইতে আসিল। দানিউব নদীর তীরবর্তী দশ লক্ষ ম্যাগিয়ার হাঙ্গেরীর সহিত সংযুক্ত হইতে চাহিল। পূর্বদিকে পোল্যাণ্ড চেকোস্লোভাকিয়ার নিকট হইতে টেশেন (Teschen) দাবি করিল। এমতাবস্থায় হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার সীমায় সৈন্য সমাবেশ করিতে আরম্ভ করিলে চেকোস্লোভাকিয়া সরকার ফ্রান্সের সহায়তা চাহিলেন। ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয় দেশই প্রয়োজনবোধে চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্যদানে প্রস্তুত হইলে এক বিরাট যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিলি চেম্বারলেন (Neville Chamberlain) ইওরোপে শান্তিরক্ষার্থে জার্মানির মিউনিক্ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া হিট্‌লারের সহিত সুদেতেন সমস্যা সম্পর্কে আপোষের আলোচনা করিলেন। চেম্বারলেন লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ার (Daladiar) তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন। উভয় প্রধানমন্ত্রী চেকোস্লোভাকিয়া সরকারকে সুদেতেন অঞ্চল জার্মানির নিকট ত্যাগ করিতে সম্মত করাইলেন।* ইঙ্গ-ফরাসী এই তোষণ নীতি হিট্‌লারের দাবি আরও বাড়াইয়া দিল। তিনি সুদেতেন অঞ্চল পাইয়া-ই সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না। এই অবস্থায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্থির করিল যে, জার্মানি চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করিলে তাহারা চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্যদান করিবে। চেম্বারলেন শান্তিরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে মুসোলিনির নিকট মধ্যস্থতার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। মুসোলিনির চেষ্টায় হিট্‌লার, চেম্বারলেন,

হিট্‌লার কর্তৃক সুদেতেন অঞ্চল দাবি

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের শান্তি-প্রচেষ্টা

হিট্‌লারের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা

* "This involved cession of a considerable area inhabited by Sudeten Germans which Chamberlain described later as a drastic but necessary surgical operation." International Relation between the two World Wars, E. H. Carr, P. 270.

দালাদিয়ার ও মুসোলিনির এক বৈঠক বসিল। এই বৈঠকে চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগ্য নিরূপণ করা হইতেছিল বটে, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়া সরকারের কোন প্রতিনিধিকে উহাতে আমন্ত্রণ জানান হয় নাই। হিট্‌লার সুদেতেন অঞ্চল পাইয়া-ই সন্তুষ্ট থাকিবেন এই প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। এই বৈঠকের মীমাংসা-সম্বলিত একটি দলিলও প্রস্তুত হইল। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ার ইওরোপে শান্তিরক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদসহ নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। ফলে, চেকোস্লোভাকিয়া সুদেতেন অঞ্চল জার্মানির নিকট ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ড কর্তৃক টেশেন দাবিও চেকোস্লোভাকিয়াকে মানিতে হইল। দক্ষিণ দিকে ম্যাগিয়ার-অধ্যুষিত অঞ্চলটিও হাঙ্গেরীর সহিত সংযুক্ত হইল। এইভাবে চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্য বহু পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

মুসোলিনির মধ্যস্থতায় মিউনিক্ চুক্তি (১৯৩৮)

চেকোস্লোভাকিয়ার বিপত্তি

মিউনিক্ চুক্তিকে (Munich Pact) ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক পরাজয় ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। আর এই চুক্তি দ্বারা সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়াকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এই চুক্তির একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, সাময়িকভাবে যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সামরিক প্রস্তুতির সময়লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

মিউনিক্ চুক্তি : ইঙ্গ-ফরাসী কূটনৈতিক পরাজয়

মিউনিক্ চুক্তি মানিয়া চলা হিট্‌লারের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি চেক্-শাসনাধীন অবশিষ্ট প্রায় আড়াই লক্ষ জার্মানদের নিরাপত্তার অজুহাতে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট হাচা (Hacha)-কে এক বৈঠকে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া তিনি হাচা-কে বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়া নামক প্রদেশ দুইটি, অর্থাৎ চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ, জার্মানির রক্ষণাধীনে স্থাপন করিতে বাধ্য করিলেন। চেকোস্লোভাকিয়া এইভাবে জার্মানির কবলে আসিল।

চেকোস্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশের উপর প্রাধান্য বিস্তার

হিট্‌লার চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্র্যাগে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করিয়া লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে মেমেল (Memel) দখল করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে ডান্‌জিগ্ বন্দরটি দাবি করিলেন। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির

মেমেল দখল, পোল্যাণ্ড হইতে ডান্‌জিগ্ ও একখণ্ড সংযোজক ভূমি দাবি

অবশিষ্টাংশের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য একখণ্ড জমি (Corridor) দাবি করিলেন।

হিট্‌লারের মিউনিক্‌ চুক্তি-ভঙ্গ এবং তাহার অপরিতৃপ্ত রাজ্যলিপ্সা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে হিট্‌লার-তোষণ নীতি পরিত্যাগে বাধ্য করিল। পোল্যাণ্ড জার্মানি কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিবে স্থির হইল। পোল্যাণ্ড হিট্‌লারের দাবি অগ্রাহ্য করিলে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

পোল্যাণ্ড কর্তৃক হিট্‌লারের দাবি অগ্রাহ্য: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

স্পেন (Spain)

স্পেনঃ একক অধিনায়কত্বের উত্থান (Spain: Rise of Dictatorship): সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেনের ভাগ্যরবি অস্তমিত হইলে স্পেনের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক ব্যাপক অরাজকতা, দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা দেখা দিল। নিত্যব্যবহারের জিনিসপত্রের দাম জনসাধারণের ক্রম-ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠিল। তদুপরি অন্যায়ভাবে করভার-বণ্টনের ফলে সাধারণ শ্রেণীর লোকের দুরবস্থা চরমে পৌঁছিল। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য সরকারের একদেশদর্শিতা রাজনৈতিক অবস্থারও চরম অবনতি ঘটাইল।

স্পেনের দুরবস্থা

এইরূপ অবস্থায় ক্রমেই স্পেন যখন অতিশয় দুর্বল দেশে পরিণত তখন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার হস্তে পরাজিত হইয়া আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলিও স্পেন হারাইল। ১৮৯৮ হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কয়েক বৎসর স্পেনের জাতীয় জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অরাজকতা, ধর্মাধিষ্ঠানের উপর আক্রমণ, পুলিশের অত্যাচার, ধর্মঘট, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ব্যাপকভাবে দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্পেন কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে তাহা লইয়া স্পেনীয়দের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। ত্রয়োদশ আল্‌ফোন্‌সো (Alfonso XIII) তখন স্পেনের রাজা (১৮৮৬-১৯৩১)। আল্‌ফোন্‌সোর মাতা ছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান

আমেরিকার হস্তে স্পেনের পরাজয় (১৮৯৮)

রাজকন্যা, অপর দিকে, তাঁহার স্ত্রী ছিলেন ইংরেজ রমণী। এমতাবস্থায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা উচিত সে বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আল্‌ফোন্‌সোর পক্ষে সহজ ছিল না। রক্ষণশীল ও জাতীয়তাবাদী স্পেনীয়গণ মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া-জার্মানির পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল। ইংলণ্ড কর্তৃক জিব্রাল্টার অধিকার করিয়া রাখা স্পেনীয়দের ইংরেজ বিদ্বেষের প্রকৃত কারণ ছিল। অপরাপর অনেকে মিত্রপক্ষে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল। এইভাবে মতানৈক্য দেখা দিলে স্পেনীয় পার্লামেণ্ট যুদ্ধে (Cortes) নিরপেক্ষ থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। নিরপেক্ষ থাকিবার ফলে যুদ্ধরত শক্তিবর্গ নানাপ্রকার যুদ্ধসামগ্রী স্পেন হইতে ক্রয় করিতে লাগিল এবং যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যেই স্পেনের রপ্তানি-বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধিত হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্পেনের নিরপেক্ষতা অবলম্বন: অর্থনৈতিক উন্নতি

কিন্তু স্পেনের রাজনৈতিকক্ষেত্রে বিভেদ তখনও লাগিয়া রহিল। ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের ফলে দেশের শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। যুদ্ধোত্তর পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট দশটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল এবং দশটিরই পতন ঘটিয়াছিল। এই শাসনতান্ত্রিক অবস্থার মূল কারণ ছিল: (১) শ্রমিক সম্প্রদায়ের প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের ইচ্ছা, (২) শাসনব্যস্থায় সামরিক নেতৃবর্গের হস্তক্ষেপ, (৩) স্পেনীয় মরোক্কো-র বিদ্রোহ এবং (৪) বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের স্থানীয় স্বাধীনতা লাভের মনোবৃত্তি। ক্যাটালোনিয়া নামক স্থানে এই মনোবৃত্তি সর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হয়।

রাজনৈতিক অব্যবস্থা

ক্যাটালোনিয়াবাসিগণের স্বাধীনতা-দাবি এবং স্পেনীয় মরক্কোতে বিদ্রোহীদের হস্তে স্পেনীয় সৈন্যের পরাজয় ক্রমেই স্পেনীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতিসহ বার হাজার স্পেনীয় সৈন্য মরক্কো-র বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণ হারাইলে স্পেনে এক গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। স্পেনীয় পার্লামেণ্ট মরক্কোতে স্পেনীয় সৈন্যের ব্যাপক হত্যা সম্পর্কে এক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু এই কমিশনের রিপোর্ট দাখিল করা হইলে সরকার ইহা প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিলেন। পার্লামেণ্ট ও স্পেনের সংবাদপত্রগুলি রিপোর্ট প্রকাশের দাবি

মরক্কোয় বার হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ: ব্যাপক বিক্ষোভ

করিলে সরকার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিলেন। নূতন নির্বাচনের ফলে গঠিত পার্লামেণ্ট পূর্বেকার পার্লামেণ্ট-এর ন্যায়ই সরকার-বিরোধী মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিল। এমন সময় স্পেনে ধর্মঘট, প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি দেখা দিলে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর ক্যাপ্টেন-জেনারেল প্রিমো-ডি-রিভেরা (Captain General Primo de Rivera) স্পেনের শাসন-ব্যবস্থা বলপূর্বক হস্তগত করিলেন। আটজন জেনারেল, একজন এ্যাডমিরাল ও নিজে—এই দশজন সদস্যের একটি ডিরেক্টরী তিনি স্থাপন করিলেন। রাজা আল্‌ফোন্‌সোর অনুমতিক্রমেই এই সামরিক Coup d'etat সম্পাদন করা হইয়াছিল।

প্রিমো-ডি-রিভেরা কর্তৃক শাসনক্ষমতা অধিকার

প্রিমো-ডি-রিভেরার একক-অধিনায়কত্ব (Dictatorship of Primo de Rivera)ঃ ১৯২৩-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রিমো-ডি-রিভেরা স্পেনের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই তিনি স্পেনীয় পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরির সাহায্যে বিচার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি সব কিছু তিনি উঠাইয়া দিয়া এক কঠোর শাসন-ব্যবস্থা চালু করিলেন। সরকারী বণ্ড বিক্রয় করিয়া তিনি অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার শাসননীতির মূল কথা ছিলঃ 'দেশ, রাজতন্ত্র ও ধর্ম, ('Country, Monarchy, Religion')। স্পেনীয় জনসাধারণ রিভেরা-প্রবর্তিত একক-অধিনায়কত্বের (Dictatorship) প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল না। তাহারা এই একক-অধিনায়কত্ব এবং রাজতন্ত্র উভয়েরই অবসানের জন্য আন্দোলন শুরু করিলে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রিভেরা জনমতের সমর্থন লাভের জন্য সামরিক আইনের (Martial Law) প্রয়োগ উঠাইয়া দিলেন। তিনি সমুদ্রবাহী বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য-পোত নির্মাণের জন্য সরকারী সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। শিল্পের উন্নতির জন্য প্রাচীন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি-বিধান, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি নানাপ্রকার উন্নয়নমূলক কার্যেরও তিনি উৎসাহ দিলেন। শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ ও ধর্মঘট ইত্যাদির মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা হইল। ক্যাটালোনিয়াবাসীদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদের উৎপাদিত শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিদেশী আমদানির উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইল। ১৯২৭

রিভেরার নীতি: 'দেশ, রাজতন্ত্র ও ধর্ম'

রিভেরা সরকারের কার্যাদি

খ্রীষ্টাব্দে তিনি ন্যাশনাল এ্যাডভাইসরী এ্যাসেম্বলী (National Advisory Assembly) নামে একটি জাতীয় সভা স্থাপন করিলেন।

রিভেরার পররাষ্ট্রীয় নীতির সাফল্য

পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও দৃঢ় ও মর্যাদাপূর্ণ নীতি অবলম্বন করা হইল। (১) ইতালির সহিত ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে এক মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদন করা হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে স্পেন ও ইতালির মধ্যে যে-কোন একটি তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর শক্তি সাহায্যমূলক নিরপেক্ষতা (benevolent neutrality) অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইল। (২) স্পেনকে লীগ-অব-ন্যাশনসের কাউন্সিল-এ স্থায়ী সদস্যপদ না দেওয়ায় স্পেন লীগ-অব-ন্যাশনস্ ত্যাগ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। (৩) মরক্কো পরিস্থিতিও আয়ত্তাধীনে আসিল।

রিভেরার পদত্যাগ

কিন্তু উপরোক্ত দক্ষতা প্রদর্শন করিলেও রিভেরার শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ হ্রাস পাইল না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে গোলন্দাজবাহিনী বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ঐ বৎসরই ক্যাটালোনিয়ায় এক স্বাধীন সরকার স্থাপনের চেষ্টা চলিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রিভেরাকে পদচ্যুত করিবার এক ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাইল। ইহার পর হইতে গোলন্দাজ-বাহিনীর বিদ্রোহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন, ব্যাপক অরাজকতা. প্রভৃতির ফলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রিমো-ডি-রিভেরা পদত্যাগ করিলেন।

রাজা আল্‌ফোন্‌সো কর্তৃক জাতীয় সমর্থন লাভের চেষ্টা

রাজা আল্‌ফোন্‌সো ও তাঁহার নবগঠিত মন্ত্রিসভা স্পেনবাসীর সমর্থন লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ন্যাশনাল এ্যাডভাইসরী এ্যাসেম্বলী ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় পার্লামেন্টের নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হইল। রিভেরার আমলে যে সকল অন্যায়-অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিকার করা হইল। কিন্তু এই সকলের ফলেও দেশে প্রজাতান্ত্রিক মনোবৃত্তির উপশম হইল না। 'রাজতন্ত্রের পতন হউক!' ধ্বনি দেশের সর্বত্র উত্থিত হইতে লাগিল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রাধান্য : আল্‌ফোন-সোর পদত্যাগ

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে রাজতন্ত্র সেনাবাহিনীর অধিকাংশের আনুগত্য, জমিদার শ্রেণীর সহায়তা, ক্যাথলিক চার্চের সহায়তা এবং প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষপাতী দলের আভ্যন্তরীণ বিভেদের দরুণই কোনক্রমে রক্ষা পাইল। কিন্তু পর বৎসর (১৯৩১ খ্রীঃ) সাধারণ নির্বাচনে প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধিগণ প্রায় সর্বত্রই জয়ী হইলেন। ইহা ভিন্ন সমাজতান্ত্রিক

দলও প্রতিনিধি-নির্বাচনে সাফল্য লাভ করিল। ফলে, প্রজাতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। কিন্তু এই বৎসরই আকস্মিকভাবে রাজা আল্‌ফোন্‌সোকে বিদ্রোহের ভয় দেখাইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল। ফলে স্পেনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইল।

নূতন অস্থায়ী সরকার (Provisional Govt.) ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার, সংবিধান সভার মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, চার্চের সংস্কার প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

অস্থায়ী সরকারের কার্যকলাপ

দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই নূতন সরকারকে শাসন-পরিচালনার সুযোগ দিতে স্বীকৃত হইল। কেবল মাত্র প্রজাতন্ত্র-বিরোধী রাজতন্ত্রীদল এবং কমিউনিস্ট্‌গণ অরাজকতার সৃষ্টি করিতে চাহিলে সরকার বলপূর্বক ইহাদের দমন করিলেন।

সংবিধান সভার নির্বাচনে রাজতন্ত্রের পরাজয়

অপর দিকে ক্যাটালোনিয়াবাসীদিগকে জাতীয় ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে এইরূপ কোন কিছু না করিতে অনুরোধ জানান হইল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে-ই সংবিধান সভা তথা পার্লামেণ্টের নির্বাচন হইল। রাজতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট্‌ প্রভৃতি পঁচিশটি ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিল। কিন্তু নির্বাচনে প্রজাতান্ত্রিক প্রতিনিধিগণই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেন এবং রাজতান্ত্রিকগণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন।

অস্থায়ী সরকারের পরিচালক নিসেটো জামোরা (Niceto Zamora) স্পেনের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন। এই প্রজাতান্ত্রিক সরকার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ, সরকারী কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। ধর্মবিষয়ে স্পেনীয় সংবিধান সভা জেসুইট্‌ যাজকদের বহিষ্কার, রাষ্ট্রীয় ধর্মের (State religion) অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র এই নীতির অবসান করিলে জামোরা প্রেসিডেণ্ট-পদ ত্যাগ করেন। ইহার পর ম্যানুয়েল আজানা (Manuel Azana) প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন।

সংবিধান সভার কার্যাদি

পার্লামেণ্ট ভূতপূর্ব রাজা আল্‌ফোন্‌সোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিল এবং তাঁহার স্পেনে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে বৃহৎ বৃহৎ ভূসম্পত্তি, শিল্প প্রভৃতি রাষ্ট্র-আয়ত্তে আনা হইল। ক্ষতিপূরণ দান করিয়া যে-কোন সম্পত্তি

রাষ্ট্রায়ত্ত করা যাইবে এই নীতি গ্রহণ করা হইল। সমাজের ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রম অবশ্য করণীয় এই ধারণার সৃষ্টি করা হইল। শ্রমিক, কৃষক, মৎস্যজীবী সকলকেই রাষ্ট্র রক্ষা করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এইভাবে স্পেন ক্রমেই এক সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইতে চলিল: স্পেনীয় সংবিধান সভা নিসেটো জামোরা (Niceto Zamora)-কে পুনরায় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিল। ম্যানুয়েল আজানা হইলেন প্রধানমন্ত্রী। সংবিধান সভা-ই স্পেনের পার্লামেণ্টে পরিণত হইল। স্পেনীয় পার্লামেণ্টের সাধারণ পরিদর্শনাধীনে ক্যাটালোনিয়াকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা এবং নিজস্ব প্রেসিডেণ্ট ও পার্লামেণ্ট স্থাপনের অধিকার দেওয়া হইল।

জামোরা প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকিলেও রাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট্, ফ্যাসিস্ট্ প্রভৃতি বিভিন্ন দল সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ বা খণ্ডযুদ্ধ শুরু করিতে নিরস্ত হইল না। ক্যাটালোনিয়াও স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং বাস্ক্ প্রদেশ স্পেন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করিল। স্পেনীয় সরকার সামরিক সাহায্যে বহু রক্তপাতের এবং অর্থব্যয়ের ফলে সাময়িকভাবে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইলেন। ক্যাটালোনিয়ার স্বায়ত্তশাসনাধিকার বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। এই সময়ে আলেজাণ্ড্রো লেরোক্স্ (Alejandro Lerroux) ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিসভার দুর্বলতা এবং মন্ত্রিগণের ঘন ঘন পরিবর্তন কোন স্থায়ী শাসননীতি গ্রহণের পরিপন্থী বিবেচনা করিয়া প্রেসিডেণ্ট জামোরা পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলেন (১৯৩৫) এবং এক নূতন সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দিলেন।

১৯৩৩-৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যবস্থা

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সাধারণ নির্বাচন

নূতন পার্লামেণ্টে বামপন্থী দলগুলির প্রাধান্য স্থাপিত হইল। আজানা এই বামপন্থীদের সম্মিলিত দলের প্রতিনিধি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হইলেন। আজানা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং ক্যাটালোনিয়ায় স্বায়ত্তশাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সত্তর হাজার কৃষককে জমির মালিকানা দেওয়া হইল; কিন্তু অবশিষ্ট কৃষকগণ আর ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে রাজী হইল না। তাহারা বলপূর্বক জমিদারের ভূসম্পত্তি দখল করিতে লাগিল। উগ্র বামপন্থিগণ

নূতন পার্লামেণ্টে বামপন্থীদের প্রাধান্য: জামোরার অপসারণ

রাজতান্ত্রিকদের সম্পত্তি, চার্চ কন্‌ভেণ্ট্‌ প্রভৃতি আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিতে লাগিল। এই সময়ে প্রেসিডেণ্ট জামোরাকে বামপন্থী-বিরোধী মনোভাবের জন্য অপসারণ করা হইল। আজানা প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন আর ক্যাসারে কুইরোগা (Casares Quiroga) প্রধানমন্ত্রী হইলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই (১৯৩৬) স্পেনে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে এক দারুণ বিদ্বেষ দেখা দিল। বামপন্থী সরকার পক্ষ ফ্যাসিস্ট্‌বাদে বিশ্বাসী অনেককে কয়েদ করিলেন। ক্রমে সামরিক বাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজনীতিতে কোনপ্রকার অংশ গ্রহণকারী সামরিক কর্মচারিগণকে সরকার অবসর গ্রহণে বাধ্য করিলেন। ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মচারী যাঁহারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইল নতুবা কোন দূরবর্তী স্থানে বদলী করা হইল। জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করা হইল। জুলাই মাসের ১২ই তারিখে মাদ্রিদের একজন পুলিশ সার্জেণ্ট—যোসিডেল ক্যাস্টিলো (Josedel Castillo)-কে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব সরকারের উপর আরোপ করা হইলে ১৭ই জুলাই মরক্কোয় অবস্থিত স্পেনীয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সেই সঙ্গে স্পেনে এক দীর্ঘ অন্তর্যুদ্ধের (১৯৩৬-৩৯) সূচনা হয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্যানারী দ্বীপ হইতে মরক্কোয় উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

আজানা প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত: ক্যাসারে কুইরোগা প্রধানমন্ত্রী

ক্যাস্টিলোর হত্যা

মরক্কোয় অবস্থিত স্পেনীয় বাহিনীর বিদ্রোহ

স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক এবং কমিউনিস্ট্‌ দেশগুলি স্পেনীয় সরকারকে সহায়তা দান করে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধ সম্পর্কে মধ্যপন্থা অবলম্বন করিল। উভয় পক্ষই কোনপ্রকার সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত হইল না। জার্মানির হিট্‌লার ও ইতালির মুসোলিনি ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য-সহায়তা দানে ত্রুটি করিলেন না। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে প্রেসিডেণ্ট আজানা পদত্যাগ করিলেন। ফ্রাঙ্কো স্পেনের শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। হিট্‌লার ও মুসোলিনির সমপর্যায়ের একটি একক-অধিনায়কত্ব স্পেনেও স্থাপিত হইল।

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সাফল্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩৯-'৪৫ (World War II): ১৯১৯

খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসের সম্মেলন প্রকৃত শান্তি না আনিয়া কেবলমাত্র যুদ্ধবিরতি সাধন করিয়াছিল। পরবর্তী কুড়ি বৎসর সেইহেতু শান্তির যুগ অপেক্ষা যুদ্ধবিরতির যুগ হিসাবেই বিবেচ্য। এই কয়েক বৎসরের পৃথিবীর তথা ইওরোপীয় ঘটনাবলী এক অধিকতর সর্বনাশাত্মক যুদ্ধের দিকে পৃথিবীকে আগাইয়া দিল।

১৯১৯—১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ যুদ্ধবিরতির যুগ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতের উপশম হইবার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হইল। অচিরে অগণিত নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ ও সৈনিকের রক্তে পৃথিবী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধের বীভৎসতার দ্বিতীয় পরিচয় লাভ করিল।

প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালের ঘটনাবলী প্রধানত ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ ভার্সাই-এর সন্ধিতেই খুঁজিতে হইবে।

(১) (ক) ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষরকালে জার্মান প্রতিনিধিবর্গের প্রতি মিত্রপক্ষের অন্যায় আচরণ, তাঁহাদের প্রতি অযথা অপমানজনক ব্যবস্থা-অবলম্বন প্রকৃত শান্তি-নীতির পরিপন্থী ছিল। জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে অপরাধীর ন্যায় সামরিক প্রহরাধীনে সভাকক্ষে উপস্থিত করা এবং সভাকক্ষ হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়ার মধ্যে বিজেতা শক্তিগুলির ঔদ্ধত্যের এবং যুদ্ধজয়-জনিত অহঙ্কারের পরিচয় পাওয়া গেলেও বিজিতের প্রতি সহানুভূতি এবং উপযুক্ত মর্যাদা দানের দূরদর্শিতার পরিচয় ছিল না। (খ) ইহা ভিন্ন জার্মান প্রতিনিধিগণকে মিত্রপক্ষ-রচিত ভার্সাই-এর সন্ধি শর্তাদি সম্পর্কে কেবলমাত্র একবার মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ দিয়া এবং তাঁহাদের মতামতের প্রায় সব কিছু অগ্রাহ্য করিয়া স্থায়ী শান্তিস্থাপনের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছিল। জার্মান প্রতিনিধিবর্গকে কোন মন্তব্য করিবার দ্বিতীয় সুযোগ না দিয়া এবং মিত্রপক্ষ-রচিত সন্ধি গ্রহণ না করিলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করিবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া জার্মানির উপর ভার্সাই-এর সন্ধি চাপান হইয়াছিল। ফলে, জার্মান জাতির মধ্যে ভার্সাই-এর সন্ধি একটি 'Dictated peace' —এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। প্রথম হইতেই এই সন্ধি ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা

ভার্সাই-এর সন্ধির ত্রুটি : (ক) জার্মানির প্রতি অযথা অপমানজনক ব্যবস্থা অবলম্বন

(খ) জার্মান প্রতিনিধিবর্গের মতামত দানের স্বাধীনতা অস্বীকার 'Dictated peace'

জার্মান জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য স্থায়ী শান্তিস্থাপনের পক্ষে এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল না। (গ) প্যারিস সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধি মাত্রেই ন্যায্য এবং নিরপেক্ষভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রশ্ন মীমাংসা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও কেবলমাত্র জার্মানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যই হরণ করিয়াছিলেন। নিজ নিজ সাম্রাজ্য কেহই ত্যাগ করিবার মত উদারতা দেখান নাই। সামরিক নিরস্ত্রীকরণ নীতির ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র পরাজিত জার্মানি ও অপরাপর দেশের সামরিক শক্তি হ্রাস করিয়াই মিত্রপক্ষ ক্ষান্ত রহিলেন। এই সকল কারণে মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে জার্মানি অসৎ উদ্দেশ্যের অভিযোগ আনিতে পারিত, ইহা অনস্বীকার্য।

(গ) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য হ্রাস ও নিরস্ত্রীকরণ নীতির ক্ষেত্রে জার্মানির প্রতি অবিচার

(ঘ) ক্ষতিপূরণের পরিমাণের বিশালতাই উহা আদায়ের পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। জার্মানির সম্পূর্ণ সর্বনাশ সাধন না করিয়া এই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই ভার্সাই-এর সন্ধি নাকচ করা জার্মানি ও জার্মান জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন ছিল।

(ঘ) ক্ষতিপূরণের বিশালতা—ভার্সাই-এর সন্ধিভঙ্গের ইঙ্গিত

(২) ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তগুলি যাহাতে বজায় থাকে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা ব্রিটিশ ও ফরাসী স্বার্থের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৎসরগুলিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতির বৈষম্য দিন দিনই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছিল। ভার্সাই-এর সন্ধি সম্পাদনকালে ব্রিটেন ও আমেরিকা ফরাসী নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মার্কিন সরকার কর্তৃক ভার্সাই-এর সন্ধি অনুমোদিত না হইলে ফ্রান্স ইংলণ্ডের নিকট ফরাসী রাজ্যের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ড এককভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হয়। বেলজিয়াম ভবিষ্যৎ যুদ্ধ-বিগ্রহে নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন নীতি অনুসরণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করে।

ইঙ্গ-ফরাসী অনৈক্য

জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের শক্তিসঞ্চয়ের চেষ্টা

এইভাবে মিত্রপক্ষের পররাষ্ট্র-নীতির ঐক্য যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হইল, ফ্রান্সের নিরাপত্তার প্রশ্নও তেমনি জটিল হইয়া উঠিল। মিত্রপক্ষের পররাষ্ট্র-নীতির বৈষম্য জার্মানির শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করিল, ফলে ফ্রান্সের ভীতি দিন দিনই

মিত্রশক্তির মধ্যে পররাষ্ট্র-নীতির অনৈক্য

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমতাবস্থায় ফ্রান্স নিজ নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে লোকার্ণো চুক্তি (Locarno Pact) স্বাক্ষরিত হইলে জার্মানি ও ফ্রান্স এবং জার্মানি ও বেলজিয়ামের মধ্যবর্তী সীমার নিরাপত্তা রক্ষা করিতে ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও ইতালি স্বীকৃত হইল। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে জার্মানিকে লীগ-অব-ন্যাশনসের কাউন্সিলের স্থায়ী সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইহাতেই ফ্রান্স ও জার্মানির পরস্পর বিরোধের শান্তি হইল না। ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্সে (Disarmament Conference) ফ্রান্স জার্মানির ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার জন্য জার্মানি অপেক্ষা অধিক সামরিক শক্তি রাখিবার দাবি করে। অপর পক্ষে জার্মানি অন্ততপক্ষে ফরাসী সামরিক শক্তির সমপরিমাণ সামরিক শক্তি রাখিবার দাবি করে। এই সূত্রে জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইলে জার্মান প্রতিনিধি নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইহার অব্যবহিত পরে জার্মানি লীগ-অব-ন্যাশনসের সদস্য পদ ত্যাগ করে এবং ভার্সাই-এর সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সামরিক শক্তিবৃদ্ধিতে মনোযোগী হয়। বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক-বৃত্তি গ্রহণ নীতি জার্মানিতে পুনরায় গৃহীত হয়। এই সময় হইতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামরিক প্রস্তুতি শুরু হয়।

লোকার্ণো চুক্তি (১৯২৫)

নিরস্ত্রীকরণ কন্‌ফারেন্স (১৯৩২-৩৩)

জার্মানির লীগ ত্যাগ : সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে মনোযোগী

(৩) সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া জার্মানি ভার্সাই-এর সন্ধি দ্বারা যে সকল স্থান হারাইয়াছিল সেই সকল স্থান পুনরায় দখলে আনিয়া এবং জার্মান জাতির সকল লোককে ঐক্যবদ্ধ করিয়া এক শক্তিশালী জার্মান সাম্রাজ্য গঠনে জার্মান ফুহ্‌রার হিট্‌লার আত্মনিয়োগ করেন। (ক) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি রাইন সীমায় নিরপেক্ষ অঞ্চল দখল করে। (খ) ইহা ভিন্ন জাপানের সহিত কমিউনিস্ট্-বিরোধী (Anti-Comintern Pact) স্বাক্ষর করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করে। অল্পকাল পরে ইতালি এই চুক্তি গ্রহণ করিলে বার্লিন-টোকিও-রোম এক্‌সিস্ (Berlin-Tokyo-Rome Axis) গঠিত হয়। (গ) ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দান করিয়া জয়ী করিলে একদিকে

ভার্সাই-এর সন্ধির শর্ত নাকচ :

(ক) রাইন অঞ্চল দখল

(খ) বার্লিন-টোকিও-রোম এক্‌সিস্ গঠন

যেমন হিট্‌লার-মুসোলিনির একক-অধিনায়কত্বের জয় হইল অপর দিকে তেমনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের দুর্বলতাও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইল। ফলে, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে হিট্‌লারের স্বৈরাচার আরও বৃদ্ধি পাইল। স্পেনের অন্তর্যুদ্ধ জার্মানির ভবিষ্যৎ সামরিক দক্ষতার মহড়ার কাজ করিল। জার্মান জাতির মধ্যেও এক গভীর আত্মপ্রত্যয় জন্মিল।

(গ) স্পেনের অন্তর্যুদ্ধে জার্মানি কর্তৃক ফ্রাঙ্কোর সহায়তা

(৪) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আসন্ন কারণ জার্মানির নেতা হিট্‌লারের রাজ্যগ্রাস নীতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে। (ক) ভার্সাই-এর সন্ধির সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করিয়া হিট্‌লার অস্ট্রিয়া দখল করিলেন। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তথা অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গের এবিষয়ে নির্লিপ্ততা হিট্‌লারের ঔদ্ধত্য অসাধারণভাবে বৃদ্ধি করিল। মুসোলিনি জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া-গ্রাসের প্রতিবাদ করিলেন না, কারণ তিনি আবিসিনিয়া দখলে হিট্‌লারের নৈতিক সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। (খ) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিট্‌লার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন অঞ্চল দাবি করিলেন। এই অঞ্চলের অধিকাংশই ছিল জার্মান জাতির লোক। ঐ বৎসর মিউনিক্ চুক্তি (Munich Pact) দ্বারা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালি সুদেতেন অঞ্চল জার্মানিকে দান করিতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সম্মত করাইল। জার্মানি কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রান্ত হইলে রাশিয়া ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ার রক্ষার্থে অগ্রসর হইতে রাজী ছিল। কিন্তু মিউনিক চুক্তিতে ইঙ্গ-ফরাসীয় জার্মান-তোষণ নীতিতে রাশিয়া স্বভাবতই সন্দিহান হইয়া উঠে। (গ) সুদেতেন অঞ্চল দখলের ছয় মাসের মধ্যেই হিট্‌লার চেকোশ্লোভাকিয়ার অবশিষ্ট অংশের উপরও আধিপত্য বিস্তার করেন। এইভাবে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের দুর্বলতার সুযোগে হিট্‌লারের রাজ্যলিপ্সা দিন দিনই বাড়িয়া চলে। তিনি লিথুয়ানিয়ার নিকট হইতে মেমেল (Memel) দখল করিলেন। (ঘ) তিনি পোল্যাণ্ডের ডান্‌জিগ্ বন্দরটি এবং পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অন্য অংশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একখণ্ড সংযোগ-ভূমি (corridor) দাবি করেন। এই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ড,

হিট্‌লারের রাজ্য-গ্রাস নীতি: যুদ্ধের আসন্ন কারণ

(ক) অস্ট্রিয়া দখল

(খ) মিউনিক্ চুক্তি—সুদেতেন অঞ্চল দখল

(গ) চেকোশ্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশের উপর আধিপত্য বিস্তার, লিথুয়ানিয়া হইতে মেমেল দখল

(ঘ) পোল্যাণ্ড হইতে ডান্‌জিগ্ ওসংযোগ-ভূমি (corridor) দাবি

পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একটি আত্মরক্ষামূলক পরস্পর সামরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন করে। মিউনিক্ চুক্তির সময় হইতে সন্দিগ্ধ রাশিয়া ঐ সময়ে জার্মানির সহিত এক 'না-আক্রমণ চুক্তি' (Non-aggression Pact) স্বাক্ষর করে। জার্মানির পক্ষে এই চুক্তি যেমন কূটনৈতিক সাফল্যের পরিচায়ক অপরপক্ষে ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রপক্ষের দিক হইতে ইহা ছিল তেমনি এক চরম কূটনৈতিক পরাজয়।

ইঙ্গ-ফরাসী-পোল চুক্তি

রুশ-জার্মান 'না-আক্রমণ চুক্তি'

এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জার্মানি পোল্যাণ্ডের উপর দাবি পূরণের জন্য চাপ দেয়। পোল্যাণ্ড এই সকল দাবি পূরণে অস্বীকৃত হইলে হিট্‌লার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই যুদ্ধের অবসান ঘটে।

হিট্‌লার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ: ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

দশম অধ্যায়

মধ্য-প্রাচ্য

(The Middle East)

ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষের (বর্তমানে পাকিস্তানের) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত যাবতীয় দেশগুলির মধ্য-প্রাচ্য নামকরণ করা হইয়াছে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালেই এই নামের ব্যবহার শুরু হইয়াছে। মিশর উপরোক্ত সংজ্ঞার আওতায় ঠিক না পড়িলেও মধ্য-প্রাচ্য নামের ব্যবহারে মিশর দেশকেও যোগ করা হইয়া থাকে। এই সকল দেশে ১৯১৯ হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের ঐতিহাসিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল দেশের ইতিহাসের মোটামুটি আলোচনা করা হইল।

মধ্য-প্রাচ্য বলিতে কোন্ কোন্ দেশ বুঝায়?

তুরস্ক (Turkey): প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির মিত্রশক্তি হিসাবে তুরস্কের পরাজয়ের ফলে তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেভ্রে (Sevres)-এর সন্ধি দ্বারা (১৯২০) মিত্রপক্ষ ওটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যকে এক অতি ক্ষুদ্র মরুভূমি ও পার্বত্য অঞ্চল-সম্বলিত রাজ্যে পরিণত করিয়াছিল। এই চুক্তি তুরস্ক গ্রহণ করিলে তুরস্ক সাম্রাজ্যের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তুর্কী সুলতান ষষ্ঠ মোহম্মদ হয়ত এই চুক্তি অনুমোদন-ই করিতেন, কিন্তু নেহাৎ ভাগ্যের জোরেই মুস্তাফা কামাল নামে দেশপ্রেমিক রাজকর্মচারীর উত্থানে মিত্রপক্ষ সেভ্রে-এর সন্ধি তুরস্কের উপর চাপাইতে সক্ষম হইল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের ক্ষতি : কামাল আতাতুর্কের দান

মুস্তাফা কামাল (Mustapha Kemal): মুস্তাফা কামাল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সালোনিকার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মণ্টাসির নামক স্থানে স্কুল-শিক্ষা কৃতিত্বের সহিত সমাপন করিয়া তিনি কনস্টান্টিনোপলের সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে 'কামাল' অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিহীন (Perfect) উপাধি দান করিয়াছিলেন। মুস্তাফা সাধারণ্যে 'কামাল' নামেই সমধিক পরিচিত।

কামালের জন্ম ও প্রথম জীবন

সামরিক শিক্ষা গ্রহণকালেই তিনি ফরাসী বিপ্লব-সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তকাদি পাঠ করিয়া অন্তরে অন্তরে বিপ্লবী হইয়া উঠেন। তুর্কী সরকার তাঁহার শিক্ষা সমাপনের পর তাঁহাকে রাজধানীর নিকটবর্তী কোন স্থানে রাখা নিরাপদ নহে মনে করিয়া দূরবর্তী দামাস্কাস এর এক অশ্বারোহী বাহিনীতে নিযুক্ত করিলেন। সেখানে কামাল 'বতন' অর্থাৎ পিতৃভূমি (*Vatan* = Fatherland) নামে এক গোপন সমিতি স্থাপন করিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল তুর্কী শাসনব্যবস্থার অকর্মণ্যতা দূর করিয়া দেশ ও দেশবাসীর উন্নতি সাধন।

'বতন' নামক গোপন সমিতি স্থাপন

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে 'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনের সময় কামাল সেনাপতি সেভ্কেত-এর সহিত কনস্টান্টিনোপলে সৈন্যসহ প্রবেশ করিয়া তুর্কী সুলতান আবদুল হামিদকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারসাধনে বাধ্য করিয়াছিলেন। তরুণ আন্দোলনের বিশৃঙ্খলায় হতাশ হইয়া কামাল রাজনীতি ত্যাগ করেন।

'তরুণ তুর্কী' আন্দোলনে যোগদান : রাজনীতি ত্যাগ

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্ম তাঁহাকে ফ্রান্সে প্রেরণ করা হইল। সেখানকার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় তুরস্ক যে কত পশ্চাদ্‌পদ তাহা তিনি তখন উপলব্ধি করিলেন। ফরাসী স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা, প্রগতিশীল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তাঁহাকে চমৎকৃত করিল।*

ফ্রান্সে গমন : পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় তুরস্কের পশ্চাদ্‌পদতা উপলব্ধি

১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দের তুর্কী-ইতালীয় যুদ্ধে কামাল ট্রিপোলিটানিয়ায় তাঁহার সামরিক প্রতিভার পরিচয় দান করেন। ১৯১২ এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের বলকান যুদ্ধে তিনি তুরস্কের শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্যালিপলির যুদ্ধে (১৯১৫) কামাল মিত্রপক্ষকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া সামরিক প্রতিভার চরম পরিচয় দান করেন।

কামালের সামরিক প্রতিভা ও খ্যাতি

মুস্তাফা কামালের স্থায় সামরিক প্রতিভা এবং দেশাত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে মিত্রপক্ষ তুরস্কের উপর যে সন্ধির শর্ত চাপাইয়াছিল তাহা মোটেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি তুর্কী সরকারকে এই চুক্তিগ্রহণে বাধা দিবার জন্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তুর্কী সরকারের আদেশে তখন তাঁহাকে আনাটোলিয়ায় যাইতে হইল। এই সময় তিনি 'তুর্কী জাতীয়তাবাদী দল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের সাহায্যে তিনি একটি সামরিক বাহিনীও গঠন করিয়াছিলেন। ক্রমে কামাল তুরস্কের সর্বত্র এই জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তুর্কী পার্লামেণ্টের নির্বাচনে কামালের জাতীয়তাবাদী দলের সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইলেন। এই পার্লামেণ্ট ছয়টি শর্ত-সম্বলিত একটি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করিল

মুস্তাফা কামালের জাতীয়তাবাদী দল ও সেনাবাহিনী গঠন

তুর্কী পার্লামেণ্টে জাতীয়তাবাদী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা (১৯১৯)

* "On his return he stopped for a while in Paris and was deeply struck by the contrasts of West and East. He seemed to have been especially impressed by the relatively free position of women, the progressive civil and commercial life and the general prevalence of literacy." Langsam, p. 631.

এবং এই শর্তগুলি না মানিলে মিত্রপক্ষের সহিত সন্ধি স্থাপন অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করিল। এই শর্তগুলির প্রথম তিনটি দ্বারা তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে যে সকল স্থান মিত্রপক্ষ বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল সেই সকল স্থানের স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকার করিতে হইবে তাহা বলা হইল। চতুর্থ শর্তে কন্‌স্টান্‌টিনোপলের নিরাপত্তা রক্ষা করা হইবে এই প্রতিশ্রুতি দাবি করা হইল, অবশ্য দার্দানেলিস্ ও বস্‌ফোরাস্ প্রণালী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। পঞ্চম শর্তে তুরস্কের সাম্রাজ্যাধীন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাত্রেরই অধিকার মানিয়া চলিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল এবং ষষ্ঠ শর্তে বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক তুরস্কের জাতীয় জীবনের কোন স্তরেই কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করা চলিবে না, এই কথা বলা হইল। এই শর্তটি যে তুরস্কের স্বাধীন দেশ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, এই কথাও বলা হইল।

মিত্রপক্ষের সহিত ছয়টি শর্ত-সম্বলিত চুক্তি গৃহীত

তুর্কী পার্লামেণ্ট উপরোক্ত চুক্তির শর্তাদি গ্রহণ করিলে একজন ব্রিটিশ জেনারেল-এর অধীনে এক বিশাল ইংরেজ সেনাবাহিনী কন্‌স্টান্‌টিনোপলে উপস্থিত হইয়া সেখানে সামরিক আইন জারী করিল এবং বহু জাতীয়তাবাদী সদস্যকে গ্রেপ্তার করিল। ইঁহাদের অনেককে আবার দেশের বাহিরে অন্যত্র প্রেরণ করা হইল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের অনেকে কন্‌স্টান্‌টিনোপল হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা এঙ্গোরা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানে পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন শুরু করিলেন। কন্‌স্টান্‌টিনোপলে জাতীয়তাবাদী সদস্য ভিন্ন অপরাপর সদস্যদের লইয়া পুরাতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিল। এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট ও কন্‌স্টান্‌টিনোপল পার্লামেণ্ট নামে দুইটি পার্লামেণ্ট যেমন অধিবেশনে বসিল, তেমনি তুরস্ক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট মুস্তাফা কামালকে ইহার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন করিল এবং জাতীয়তা-বাদী সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করিল (১৯২০)। পর বৎসর (১৯২১) এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট 'মূল গঠনতন্ত্রের আইন' (Law of Fundameutal Organisation) নামে এক আইন পাস করিয়া তুর্কী শাসনতন্ত্র মূলত কিরূপ হইবে তাহা নির্ধারণ করিল। এই আইনকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া

ব্রিটিশ সৈন্যের কন্‌স্টান্‌টিনোপল দখল

এঙ্গোরা পার্লামেণ্ট

পরবর্তী সময়ে তুরস্কের শাসনতন্ত্রে পরিণত করা হইয়াছিল। এই আইন দ্বারা তুর্কী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব তুরস্কের জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল এবং এঙ্গোরা পার্লামেণ্টকেই তুর্কী জাতীয় প্রতিনিধি-সভা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এই পার্লামেণ্টের কার্যকাল ছিল চার বৎসর। আঠারো বৎসর বয়স্ক সকল পুরুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছিল।* রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহক ক্ষমতা একজন প্রেসিডেণ্ট ও একটি দায়িত্বমূলক মন্ত্রিসভার হস্তে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত বিচারপতি লইয়া একটি স্বাধীন বিচারালয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

তুর্কী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারিত

আভ্যন্তরীণ শাসনপদ্ধতি স্থিরীকৃত হইলে কামাল রাশিয়ার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং তারপর কার্স ও আর্দান হইতে বিদেশী সৈন্য বিতাড়িত করিয়া ঐ দুইস্থান তুরস্কের সহিত সংযুক্ত করিলেন। সেভ্রে-এর সন্ধির শর্তানুযায়ী প্রাপ্ত তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত স্থানগুলি দখলের জন্য গ্রীস তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে ফ্রান্স ও ইতালি নিজ নিজ স্বার্থের কারণে গ্রীসকে কোনপ্রকার সাহায্য দান করিল না। ক্রমে ব্রিটিশ সাহায্যও হ্রাস পাইতে লাগিল। এমন সময়ে (১৯২১) লণ্ডনের এক বৈঠকে সেভ্রে-এর সন্ধির শর্তগুলির পরিবর্তনের এক চেষ্টা করা হইল, কিন্তু গ্রীস ইহা মানিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মিত্রপক্ষ ঘোষণা করিল যে, গ্রীস-তুরস্কের যুদ্ধে মিত্রপক্ষ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে (মে, ১৯২১)। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে তুরস্কের খুবই সুবিধা হইল।

বিদেশী সৈন্য অপসারণ ও তুরস্ক সাম্রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য কামালের যুদ্ধ

তুরস্ক আক্রমণ করিয়া গ্রীস প্রথমে সাফল্য লাভ করিল। কিন্তু সাখারিয়া (Sakharia)-এর যুদ্ধে কামালের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনীর হস্তে পরাজিত হইয়া গ্রীকবাহিনী পশ্চাৎ অপসরণ করিতে বাধ্য হইল। তথাপি এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশ তাহারা অধিকার করিয়া রাখিল, কিন্তু পর বৎসর তাহারা তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। গ্রীকবাহিনী বিতাড়ন-কালে ব্রিটিশবাহিনীর সহিত কামালের সংঘর্ষ উপস্থিত

সাখারিয়ার যুদ্ধে গ্রীক বাহিনীর পরাজয়

তুর্কী-ফরাসী-ইতালির মৈত্রী

*১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভোটদানের ন্যূনতম বয়স ২১ বৎসর করা হয়।

হইলে কামাল ফ্রান্স ও ইতালির সহিত মৈত্রী স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধবিরতির নূতন চুক্তি সম্পাদন

সুতরাং একমাত্র বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। এই সময়ে একজন ব্রিটিশ সেনাপতির মধ্যস্থতায় কামালের সহিত এক নূতন যুদ্ধবিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল।

ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইতালি, রুমানিয়া, রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, জাপান, গ্রীস ও তুরস্কের প্রতিনিধিবর্গ ল্যসেন (Lausanne) নামক স্থানে

ল্যসেনের সন্ধি (১৯২৩)

এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া সেভ্রে-এর সন্ধি পরিবর্তন করিলেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ল্যসেনের সন্ধি দ্বারা তুর্কী জাতীয়তাবাদী পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ছয় শর্ত-সম্বলিত চুক্তি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হইল। ব্রিটিশের ম্যাণ্ডেট ইরাক ও তুরস্কের সীমায় মসুল (Mosul) সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা তখন অবলম্বন করা সম্ভব হইল না। এইভাবে একমাত্র মুস্তাফা কামালের একনিষ্ঠ দেশাত্মবোধ ও অক্লান্ত শ্রমে তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইল।

ইতিমধ্যে (১৯২২, ১লা নভেম্বর) তুর্কী জাতীয় পার্লামেণ্ট সুলতান

তুরস্ক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত : কামাল সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত

ষষ্ঠ মোহাম্মদকে পদচ্যুত করিল এবং পরবৎসর (২৯শে অক্টোবর, ১৯২৩) তুরস্ককে প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। মুস্তাফা কামাল তুর্কী প্রজাতন্ত্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন।

ল্যসেন-এর সন্ধি (Treaty of Lausanne) : এই সন্ধি দ্বারা তুরস্ক ম্যারিৎসা (Maritsa) নদীর তীর পর্যন্ত থ্রেসের সকল স্থান ও

শর্তাদি

আড্রিয়ানোপ্‌ল পুনরায় লাভ করিল। গ্রীসের আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে কারাগাচ্ (Karagach) রেলনির্মাণ-কেন্দ্র তুরস্ক দখল করিল। কন্‌স্টান্‌টিনোপল তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। বস্‌ফোরাস্ ও দার্দানেলিস্ শান্তি বা যুদ্ধের সময়ে সকল দেশের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল। কেবলমাত্র তুরস্কের শত্রুশক্তির জাহাজ যুদ্ধকালে এই দুই প্রণালী ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইজিয়ান্ সাগরস্থ ইম্‌ব্রস্ (Imbros), টেনেডস্ (Tenedos) ও র‍্যাবিট্ দ্বীপপুঞ্জ (Rabbit Islands) তুরস্ককে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। অপরাপর দ্বীপগুলি ইতালি ও গ্রীসকে দেওয়া হইল। সীরিয়ার সীমা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের

তুর্কী-ফরাসী চুক্তির শর্তানুযায়ী অনুমোদিত হইল। লিবিয়া, মিশর, সুদান, প্যালেস্টাইন, ইরাক, সীরিয়া ও আরবীয় রাজ্যগুলির উপর তুরস্ক যাবতীয় দাবি ত্যাগ করিল। ইংলণ্ড কর্তৃক সাইপ্রাস দখল স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের উপর যে ক্ষতিপূরণ চাপান হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং তুর্কী সামরিক শক্তির পরিমাণ নির্ধারণের প্রশ্নও বাতিল করা হইল। এইভাবে সেভ্রে-এর সন্ধির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল।

মুস্তাফা কামালের আমলে তুর্কী পুনরুজ্জীবন (Turkish reviva l under Kemal): প্রগতিশীল দেশপ্রেমিক মুস্তাফা কামাল তুরস্ককে একটি আধুনিক দেশে পরিণত করিতে চাহিলেন। তুরস্কের প্রাচীনপন্থী যাবতীয় বিষয়ের পরিবর্তন সাধন করিয়া উহাকে তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তাঁহার সংস্কার-নীতির মূলসূত্রই ছিল তুর্কী সমাজ, শাসন, অর্থনীতি ও ধর্ম সর্বক্ষেত্রে এক আধুনিক বিজ্ঞান ও রুচিসম্মত পুনরুজ্জীবন সাধন এবং এইজন্য এক সময়ে একসঙ্গে একটি মাত্র সংস্কারে ব্রতী হওয়া। কামালের সংস্কার-নীতির সাফল্যের মূল কারণই ছিল এই যে, তিনি একসঙ্গে একাধিক সংস্কার-কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই।*

কামালের সংস্কার-নীতি : আভ্যন্তরীণ সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবন, এক সময়ে একটিমাত্র সংস্কারে হস্তক্ষেপ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের তুর্কী জাতীয় পার্লামেণ্ট সুলতান-পদ উঠাইয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু সুলতানের খলিফা-পদ অর্থাৎ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের নেতৃত্বের অধিকার তখনও বাতিল করা হয় নাই। ষষ্ঠ মোহাম্মদ সুলতান-পদ হইতে অপসারিত হওয়ার পরও খলিফা-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু দেশ হইতে পলায়ন করিলে ঐ পদে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল মজিদকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী খলিফা-পদও উঠাইয়া দেওয়া হয়।

তুরস্কে খলিফা-পদের অবসান

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের শাসনতন্ত্রে ইসলাম ধর্মকে জাতীয় ধর্ম বলিয়া উল্লেখ

* "One of the chief reasons for Kemal's success was the fact that he customarily took just one big step in advance at a time."
—Langsam, p. 637.

করা হইয়াছিল। পরবৎসর (১৯২৫) শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহাতেও ইসলাম ধর্ম জাতীয় ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত ছিল। প্রগতিশীল তুর্কী শাসনাধীনে ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের ধারণা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট শাসনতন্ত্র হইতে 'ইসলাম ধর্ম জাতীয় ধর্ম' এই কথাটি উঠাইয়া দিয়া তুরস্ককে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করে। সকল ধর্মকেই রাষ্ট্র সমভাবে রক্ষা করিবে এবং পরধর্ম-সহিষ্ণুতাই রাষ্ট্রের মূলনীতি বলিয়া বিবেচিত হইবে, স্থির হয়। ধর্মের ভিত্তিতে কোন বিশেষ সুবিধা কাহাকেও দেওয়া হইবে না, এই ঘোষণা করা হয়। ঐ সময়ে ইস্‌লাম ধর্মপালন-ব্যাপারে গোঁড়ামিও কতক পরিমাণে হ্রাস করা হয়।

তুরস্ক ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত (১৯২৮)

তুর্কী স্ত্রীলোকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি কামালের সংস্কারের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন পাস করিয়া বহু-বিবাহ-প্রথা রদ করা হয়। রেজিস্ট্রি বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দেশীয় সকল প্রকার বিবাহ-সংক্রান্ত আইন-কানুনের প্রচলন করিয়া স্ত্রীলোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৭ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৮ বৎসর করা হয়। স্ত্রীলোকগণ ইচ্ছামত পাশ্চাত্ত্য পোশাক পরিধান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। বোরখা পরিধান করা-না-করা ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।* ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। উপযুক্ত স্ত্রীলোকদিগকে জজ, অধ্যাপিকা হিসাবেও নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের নির্বাচনে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই সমপর্যায়ে স্থাপিত হয়। স্বাধীন তুর্কী নারীজাতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ছিলেন হালিদি এদিব। ইনি ছিলেন প্রথম তুর্কী নারী-গ্র্যাজুয়েট। ইনি ইস্তানবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ্চাত্ত্য ভাষার অধ্যাপিকা হইয়াছিলেন।

স্ত্রীজাতির মর্যাদা-বৃদ্ধি: স্ত্রীজাতির পুরুষের সমমর্যাদা লাভ

* "The Turkish ladies unless they themselves so wished no longer needed to resemble 'coffin-shaped bundles of white linens."—Vide, Langsam, p. 611.

পূর্বে তুরস্কের আইন-কানুন 'সরিয়াৎ' (Sheriat)-এর উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছিল। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে এইরূপ আইন-কানুনের পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। এইজন্য ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইট্জারল্যাণ্ড, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বাণিজ্যিক আইন-কানুনের অনুকরণে তুরস্কেরও আইন-কানুনের সংস্কার সাধন করা হয়।

পাশ্চাত্ত্য দেশের অনুকরণে তুর্কী দেওয়ানী, ফৌজদারী ও বাণিজ্যিক আইন সংস্কার

নিরক্ষরতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সাত বৎসর হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার স্কুলে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিরক্ষরতা শতকরা ৮২ জন হইতে ৪২ জনে নামিয়া আসিয়াছিল। স্কুল-কলেজে ধর্মপ্রচার বা ধর্ম-শিক্ষা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। বর্ষপঞ্জীর সংস্কার, আর্‌বী অক্ষরের পরিবর্তে রোমান অক্ষরের ব্যবহার, দশমিক মুদ্রা প্রচলন প্রভৃতি নানা-বিধ সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। সরকারী, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক কর্মচারীদিগকে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য সরকারী শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করিতে হইত। নাগরিক অধিকার লাভ করিতে হইলে স্কুলের সার্টিফিকেট দেখাইতে হইত।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি

তুর্কী জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিন্তাধারা এবং সমাজজীবনে যে এক নবচেতনা ও স্বাধীনতা আসিয়াছিল, তাহার প্রতীক হিসাবে পুরাতন অর্থহীন রীতিনীতি পরিত্যক্ত হইল। ফেজ টুপি বা পাগড়ী মাথায় দেওয়া নিষিদ্ধ হইল। নামের শেষে পদবীর পর্যন্ত পরিবর্তন সাধিত হইল। কামাল স্বয়ং জাতীয় পার্লামেন্টের ইচ্ছাক্রমে 'আতাতুর্ক' বা 'জাতির জনক' উপাধি গ্রহণ করিলেন।

অপরাপর সংস্কার

পূর্বে তুর্কী জাতি ব্যবসায়-বাণিজ্যে কোনপ্রকার অংশ গ্রহণ করিত না। তুরস্কের ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল গ্রীক, ইহুদী, আর্মেনিয়ান প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় বণিকদের হস্তে। কিন্তু কামাল আতাতুর্কের আমলে তুর্কী জাতি ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি সব দিক দিয়া উন্নত হইয়া উঠিল।* সরকারী কৃষিকেন্দ্র স্থাপন করিয়া এবং আনাটোলিয়ার কৃষকদিগকে কৃষিকার্যে পারদর্শী করিয়া কৃষির ক্ষেত্রে এক

শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান

*"A Bulgarian diplomat is reported to have said, "They are working as we never thought the Turks could work." Vide, Langsam, p. 643.

যুগান্তর আনা হইল। আতাতুর্ক নিজেই একটি আদর্শ কৃষিকেন্দ্র পরিচালনা করিতেন। নৌ-নির্মাণ-শিল্প ও অন্যান্য শিল্প-গঠনের উৎসাহ এবং সেজন্য সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা হইল। বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়া তুরস্কের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা হইল। কৃষকদের করভার লাঘব করিয়া এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার কাল হ্রাস করিয়া কৃষির উৎসাহ দান করা হইল। ইহা ভিন্ন রাস্তাঘাট, সেচ-ব্যবস্থা, জমি-উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজেও হস্তক্ষেপ করা হইল। চিনি ও বস্ত্রশিল্প ঐ সময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিল। খনিজ দ্রব্যাদির মধ্যে কয়লা, তামা, এন্টিমনি, পেট্রোল, দস্তা প্রভৃতির উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন এবং সরকারী ও বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান-স্থাপন, খনিজ দ্রব্যাদির উৎপাদন-বৃদ্ধি প্রভৃতির জন্য এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। কামাল আতাতুর্ক এঙ্গোরার নাম পরিবর্তন করিয়া 'আঙ্কারা' রাখিলেন এবং ইহাকে তুরস্কের নূতন রাজধানীতে পরিণত করিলেন। রেল ও সমুদ্র পথ দ্বারা এই নূতন রাজধানীর যোগাযোগ স্থাপন করা হইল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ (১৯৩৪)

কামাল আতাতুর্কের পররাষ্ট্র-নীতি (Foreign Policy of Kemal Atatrk) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রপক্ষ তুরস্কের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল তাহার ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি সম্পর্কে তুরস্ক স্বভাবতই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় রুশ-তুরস্ক মৈত্রীতে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কমিউনিজমের প্রভাব তুরস্কে বিস্তার লাভ করিতে থাকিলে তুর্কী সরকার ক্রমে রুশমৈত্রীর প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল রহিলেন না। অপরদিকে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির তুরস্কের প্রতি মনোভাবের পরিবর্তন, ফরাসী জাহাজ 'লোটাস' (Lotus) তুর্কী জাহাজের সহিত ধাক্কা লাগিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক তুরস্ককে ক্ষতিপূরণ দানের আদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনা পাশ্চাত্ত্য দেশের সহিত তুরস্কের মৈত্রীর পথ প্রস্তুত করিল। ফলে ইতালি-তুরস্ক মৈত্রী স্বাক্ষরিত হইল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সীরিয়ার সীমা-সংক্রান্ত তুর্কী-ফরাসী দ্বন্দ্ব তুরস্কের স্বপক্ষে মীমাংসিত হইলে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির প্রতি সন্দেহ দূর হইলে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক লীগ-অব-

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির প্রতি তুরস্কের সন্দেহ : রুশমৈত্রী

ইতালি-তুরস্ক মৈত্রী

তুরস্ক কর্তৃক লীগ-অব ন্যাশনসের সদস্য-পদ গ্রহণ

স্থাশনসের সদস্য হইল। আমেরিকা ও তুরস্কের মধ্যেও একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ল্যাসেন-এর সন্ধির শর্তগুলির কতক পরিবর্তন দাবি করিল। ঐ বৎসর মুসোলিনি আবিসিনিয়া দখল করিলে মিত্রপক্ষ তুরস্কের শক্তি বৃদ্ধির জন্য এবং দার্দানেলিস্ ও বস্-ফোরাসের নিরাপত্তার জন্য ঐ সকল অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার লাভ করিল এবং যুদ্ধের সময় লীগ-অব-ন্যাশনসের কর্তৃত্বাধীনে যে সকল শক্তি যুদ্ধ করিবে কেবলমাত্র সেগুলির নিকট এই দুই প্রণালী উন্মুক্ত থাকিবে বলিয়া স্থির হইল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটি পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি (Eastern Pact) দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না করিবার প্রতিশ্রুতি দান করে। ইহার পূর্বে (১৯৩৪) তুরস্ক, গ্রীস, রুমানিয়া ও যুগো-স্লাভিয়ার মধ্যে বলকান আঁতাঁত নামে অপর এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই দুই চুক্তির দ্বারা তুরস্কের শক্তি এবং নিরাপত্তা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চাদপদ তুরস্ক রাজ্যকে একটি প্রগতিশীল ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়া কামাল আতাতুর্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

দার্দানেলিস্ ও বস্-ফোরাস্ প্রণালীর সামরিক নিরাপত্তা বিধান

বলকান আঁতাঁত, পূর্বাঞ্চলীয় চুক্তি

কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু (১৯৩৮)

পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট ইস্‌মেৎ ইনমু আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মূলত কামাল আতাতুর্কের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেও কামালের আমলে যে-সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, সেদিকেও তিনি মনোযোগ দিতে ত্রুটি করিলেন না। পররাষ্ট্র-নীতিতেও তাঁহার নীতি ছিল যেমন সুস্পষ্ট তেমনি স্বাদেশিকতা-পূর্ণ। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক ইওরোপীয় দেশগুলির আর 'ইওরোপের রোগগ্রস্ত ব্যক্তি' (Sick man of Europe) রহিল না। তুর্কী মৈত্রী তখন সকলের নিকটই কাম্য হইয়া উঠিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের সহিত পরস্পর সামরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর করিল।

নূতন প্রেসিডেণ্ট ইস্‌মেৎ ইনমু

আরব জাতীয়তাবাদ (Arab Nationalism): মধ্য-প্রাচ্যের আরবীয় দেশ ইরাক, সিরিয়া, আরব ও প্যালেস্টাইন প্রভৃতি তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রদেশ ছিল। দীর্ঘকাল তুরস্ক সাম্রাজ্যাধীনে থাকিয়াও আরব জাতি তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা ভুলিতে পারে নাই। তুর্কী শাসনের প্রতি তাহারা

যেমন ছিল বিদ্বেষভাবাপন্ন তেমনি তুর্কী সুলতানের 'খলিফা'-পদ গ্রহণের ফলে ধর্মের ব্যাপারে তাহারা ছিল তুর্কী জাতি ও সুলতানের প্রতিদ্বন্দ্বী। মক্কার আরব বংশোদ্ভূত হুসেনকে তাহারা মোহম্মদের প্রকৃত বংশধর বলিয়া মনে করিত এবং তুর্কী সুলতানের খলিফা-পদ গ্রহণ ন্যায় এবং ধর্মের দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য মনে করিত না।

আরব-তুর্কী বিদ্বেষ

আরব ও তুর্কীদের এই স্বাভাবিক বিদ্বেষভাব ব্রিটিশ রাজনীতির ফলে আরও বৃদ্ধি পাইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার তুরস্ককে দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে আরবদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। এই উদ্দেশ্যে একদল ইংরাজ কর্মচারীকে আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইল; ইহাদের মধ্য কর্ণেল লরেন্স্ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হইলেও আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ক্রমেই এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত হইতে চলিল। কর্ণেল লরেন্স্ও আরবদের খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। হুসেনের পুত্র ফৈসল-এর সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হইল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুর্কী সরকারের দুর্বলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার হুসেনের মাধ্যমে এক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিলেন (১৯১৬)। হুসেনের অধীন হেজ্জাজ্ প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দিলে সমগ্র আরব জাতির মধ্যে এক উৎকট জাতীয়তাবোধের প্রকাশ দেখা গেল। ইহার অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্য তুর্কীবাহিনীকে পরাজিত করিয়া জেরুজালেম দখল করিলে হুসেনের পুত্র ফৈসল কর্ণেল লরেন্সের সাহায্যে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস দখল করিলেন (১৯১৮)। এইভাবে আরবদের জাতীয়তাবাদ যখন আরব-স্বাধীনতার পথে ধাবিত হইতেছিল তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। মিত্রশক্তি আরবদের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া আরব দেশগুলিকে 'ম্যাণ্ডেট্' (Mandates)-এ পরিণত করিল। ব্রিটিশ সরকারের চেষ্টায় হুসেনের পুত্র ফৈসলকে ইরাকের রাজা এবং অপর পুত্র আবদুল্লাকে ট্রান্স্জর্ডানের আমীরপদে স্থাপন করা হইল। হুসেনকে হেজ্জাজের স্বাধীন আরব রাজা বলিয়া স্বীকার করা হইল। তথাপি প্যালেস্টাইন ও ইরাক ব্রিটিশের অধীনে এবং

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের আরব জাতীয়তাবাদের সহায়তা

হুসেনের বিদ্রোহ

আরবীয় দেশগুলির 'ম্যাণ্ডেট'-এ পরিণতি

ফৈসলকে ইরাক, আবদুল্লাকে ট্রান্স্জর্ডান এবং হুসেনকে হেজ্জাজের রাজা বলিয়া স্বীকার

সিরিয়া ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপন করায় আরবদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। আরবদের অতৃপ্ত জাতীয়তাবোধ হইতে ক্রমে আরব-ব্রিটিশ, আরব-ফরাসী গোলযোগ উপস্থিত হইল।* ঐ সকল অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরও আক্রমণ চলিল।

অতৃপ্ত জাতীয়তাবোধ ব্রিটিশ ও ফরাসী বিদ্বেষে পরিণত

ইরাক (Iraq) ঃ ইরাকের রাজা ফৈসল ছিলেন সুদক্ষ শাসক ও সুচতুর কূটনৈতিক। তিনি ইরাকের আরবদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট্-এর অবসান ঘটাইলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদ চুক্তি দ্বারা ইরাকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল। ব্রিটেন ও ইরাকের মধ্যে একটি পারস্পরিক সামরিক সাহায্য-সহায়তার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহা ভিন্ন ইরাকে ব্রিটিশ সরকারকে কতকগুলি বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হইল।

ইরাকের স্বাধীনতা-লাভ (১৯৩২)

ট্রান্স্‌জর্ডান (Transjordan) ঃ ট্রান্স্‌জর্ডান-এর আমীর আবদুল্লা ফৈসলের ন্যায় ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে সমর্থন হইলেন না। ফলে, তিনি ক্রমেই ব্রিটিশ সাহায্যের উপর অধিকতরভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন। স্বভাবতই তাঁহার রাজ্যের পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন খুব মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ট্রান্স্‌জর্ডানের ব্রিটিশ নির্ভরশীলতা

হেজ্জাজ ঃ সউদি আরব (Hedjaj : Saudi Arab) ঃ হেজ্জাজের রাজা হুসেন প্রথমদিকে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মর্যাদা সহকারেই রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহারই এক পুত্র ফৈসল ছিলেন ইরাকের রাজা, অপর পুত্র আবদুল্লা ছিলেন ট্রান্স্‌জর্ডানের আমীর। হুসেন স্বয়ং খলিফা উপাধি ধারণ করিয়া মুসলমান জগতের নেতৃপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ সহায়তায় তাঁহার ভাগ্যোন্নতি ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি ব্রিটিশ সরকারের একপ্রকার তাঁবেদার হইয়া পড়িলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ আরবজাতি ইহাকে ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারিল না। হুসেন ক্রমেই জনগণের অত্যন্ত অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া

হুসেনের রাজত্বকাল : জনসাধারণের অশ্রদ্ধা

ইব্‌ন সউদ কর্তৃক ক্ষমতা গ্রহণ (১৯২৫)

* "(But) Arab nationalism, deliberately fostered by the Allies during the war for the discomfiture of the Turk on many occasions after the war brought Arab peoples into conflict both with the Mandatory Powers and with non-Arab minorities living in their midst". Vide, E. H. Carr, p. 234.

উঠিলেন। এই সুযোগে ইব্‌ন সউদ নামে একজন ওহাবি-নেতা হুসেনকে পদচ্যুত করিয়া হেজ্জাজের রাজা হইলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন সউদ মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিয়া নিজেকে হেজ্জাজের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হুসেন ইতিপূর্বেই জেরুজালেমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সউদি আরবের জন্ম

রাজা ইব্‌ন সউদ পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র স্বায়ত্তশাসিত রাজগণকে পরাজিত করিয়া আরব উপদ্বীপের সমগ্র স্থানের উপরই নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারেই হেজ্জাজের নাম হইল সউদি আরব (Saudi Arabia)। রাজা ইব্‌ন সউদ খুব ক্ষমতাবান শাসক ছিলেন। তাঁহার সামরিক ক্ষমতার বলে যেমন সমগ্র আরব উপদ্বীপ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার সুশাসনে দীর্ঘ দিনের অব্যবস্থা দূর হইয়া আরব রাজ্যে এক প্রগতিশীল সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইব্‌ন সউদ নিজ

ইব্‌ন সউদের শাসন-দক্ষতা

রাজ্যের পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং বিদেশীদের বিশেষ সুবিধা যাহা হুসেন দান করিয়াছিলেন, তাহা নাকচ করিয়া আরবদের মধ্যে এক নব জাগরণ আনয়ন করেন। তিনি ইরাক ও ট্রান্‌স্‌জর্ডানের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজ রাজ্যের নিরাপত্তা ও শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার বংশধর-ই বর্তমানে সউদি আরবে রাজত্ব করিতেছেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সউদি আরব,

আরব লীগ (১৯৪৫)

ট্রান্‌স্‌জর্ডান, ইরাক, মিশর, লেবানন ও ইয়েমেন প্রভৃতি আরব জাতি-অধ্যুষিত দেশগুলির মধ্যে 'আরব লীগ' (The Arab League) নামে এক মিত্রসংঘ স্থাপিত হয়। এই মিত্রসংঘের মূল শর্ত হইল এই যে, প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এই সকল দেশ পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যদানে প্রস্তুত থাকিবে।

প্যালেস্টাইন (Palestine)ঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস-সম্মেলন যখন প্যালেস্টাইন দেশটি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' (Mandate) হিসাবে স্থাপন করে তখন উহার অধিবাসীদের প্রায় সকলেই আরবজাতির লোক ছিল।

ইহুদি ও আরবের নিকট ব্রিটিশ সরকারের পরস্পর-বিরোধী প্রতিশ্রুতিদান

মোট সাত লক্ষ অধিবাসীর অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক তখন ছিল ইহুদি। কিন্তু ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আর্থার বেলফার (Arthur Belfour) ইহুদিদের স্বপক্ষে টানিবার জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধাবসানে প্যালেস্টাইনে পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। অপর দিকে তুরস্কের বিরুদ্ধে আরবদের

সহায়তা লাভের জন্য আরব-নেতা হেজ্জাজের হুসেনকে আরব স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাণ্ডেট্ ব্যবস্থার দ্বারা আরবদের স্বাধীনতার বদলে তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল মাত্র। অবশ্য 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপিত হইলেও অদূর-ভবিষ্যতে আরবদের স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ছিল। কিন্তু প্যালেস্টাইন সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী প্রতিশ্রুতি দানের ফলে এক অতিশয় জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের আগমন

প্যারিস-সম্মেলন প্যালেস্টাইনকে 'ম্যাণ্ডেট্' হিসাবে স্থাপন করিবার কালে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিবার এবং সেখানকার অপরাপর বাসিন্দাদের ধর্মনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি অধিকার রক্ষা করিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারকে দিয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের শাসনভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ইহুদি সেখানে বসবাসের জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল।

অপর দিকে হেজ্জাজের হুসেনের নিকট আরব সহায়তার বিনিময়ে আরব স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকার দান করিয়াছিলেন, আরব-অধ্যুষিত প্যালেস্টাইনও স্বভাবতই সেই সকল সুযোগ প্রত্যাশা করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের চৌদ্দ দফা শর্তাবলীতে সন্নিবিষ্ট স্বায়ত্তশাসন অধিকারের নীতির উপর নির্ভর করিয়াই প্যালেস্টাইনের আরবগণ স্বাধীনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। ব্রিটিশ সরকার অবশ্য হুসেনের সহিত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ম্যাক্‌মাহন (Macmahon যে চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিলেন উহাতে প্যালেস্টাইনের উল্লেখ ছিল না এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্যালেস্টাইনবাসী আরবদের স্বাধীনতার প্রশ্ন এড়াইয়া চলিলেন।

আরবদের জাতীয়তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট

যাহা হউক, ইহুদিদের দলবদ্ধভাবে প্যালেস্টাইন আগমনে আরব জাতীয়তাবোধ আরও উগ্র হইয়া উঠিল। আরবগণ নীতির দিক দিয়াই প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের পুনর্বাসনের দাবি স্বীকার করিত না। ইহা ভিন্ন বিত্তশালী ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত ইহুদিগণকে প্যালেস্টাইনে জমি কিনিবার অধিকার দান করিবার ফলে আরবগণ ক্রমেই প্যালেস্টাইনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ইহুদিগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দরিদ্র আরবদের ভূসম্পত্তি

আরব-ইহুদি সংঘর্ষ

ক্রয় করিয়া লইতেছিল। আরবদের কমলা লেবুর চাষ ও অপরাপর ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমেই ইহুদিদের হাতে চলিয়া যাইতেছিল। আরবগণ নিজ দেশেই বিদেশীতে পরিণত হইতে লাগিলে তাহারা ইহুদিগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। ১৯২১, ১৯২৯ এবং ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহুদিদের উপর ব্যাপক আক্রমণ করা হইল। আরব-ইহুদি দ্বন্দ্বে ব্রিটিশ পুলিশ শান্তি রক্ষা করিতে অনেক সময়েই সক্ষম হইত না। ফলে, উভয় পক্ষেরই হতাহতের সংখ্যা হইত খুব বেশি। এই কারণে প্রায়ই ব্রিটিশ সরকারকে সামরিক সাহায্যে আরব-ইহুদি হানাহানি বন্ধ করিতে হইত।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি রয়েল কমিশন (Royal Commission) নিয়োগ করিলেন এবং এই কমিশনের উপর আরব-ইহুদি দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার ও তদনুযায়ী সুপারিশ করিবার ভার দিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই কমিশন তাঁহাদের সুপারিশে প্যালেস্টাইনকে আরব অঞ্চল, ইহুদি অঞ্চল এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত জেরুজালেম—এই তিন ভাগে বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা পেশ করিলেন। এই পরিকল্পনা ইহুদি বা আরব কোন পক্ষই সমর্থন করিল না। ক্রমেই আরব-ইহুদি দ্বন্দ্ব অধিকতর তীব্র হইয়া উঠিল। ইহুদি স্বার্থ, আরব জাতীয়তাবোধ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আবর্তে পড়িয়া প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানের বাহিরে চলিয়া গেল। প্যালেস্টাইনের বিমান ঘাঁটি ব্রিটিশ স্বার্থের জন্য দখলে রাখা প্রয়োজনীয় ছিল, ইহা ভিন্ন মসুলের খনিজ তেলের পাইপ প্যালেস্টাইনে আসিয়া শেষ হইয়াছিল। সেজন্য তেলের বণ্টন-ব্যাপারেও প্রাধান্যলাভের সুযোগ ছিল। ইতালি হইতে উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া আরবগণ ইহুদি এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইল। এমন কি যে-সকল আরব ইহুদিদের সহিত মীমাংসার পক্ষপাতী ছিল তাহাদিগকেও আক্রমণ করা হইল। একজন বিটিশ কমিশনার এই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে প্রাণ হারাইলে আরবদের উপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চলিল। জেরুজালেমের মুফ্‌তি আমিন এল-হুসেনি প্যালেস্টাইনে ইহুদি পুনর্বাসন বন্ধ করিবার এবং অপরাপর আরব রাজ্যগুলির সমপর্যায়ে প্যালেস্টাইনকে স্থাপনের দাবি করিলেন।

রয়েল কমিশন : প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা

আরব-ইহুদি সংঘর্ষ বৃদ্ধি : ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার একটি দ্বিতীয় কমিশন নিয়োগ করিলেন। এই কমিশনের সুপারিশক্রমে প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা ত্যাগ করা হইল। ইহুদি ও আরব প্রতিনিধি-বর্গকে লণ্ডনে এক বৈঠকে আহ্বান করা হইল (১৯৩৯)। তাঁহাদিগকে আলাদাভাবে নিজ নিজ অভিযোগ ব্রিটিশ পক্ষকে জানাইবার কথা বলা হইল এবং যদি আপোষ-মীমাংসা সম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে উভয় পক্ষের যুগ্ম বৈঠক বসিবে স্থির হইল। কিন্তু এইবারও কোন মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইল না। এমতাবস্থায় ব্রিটিশ সরকার নিজ হইতেই একটি মীমাংসা-পরিকল্পনা কার্যকরী করিলেন। পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য বৎসরে দশ হাজারের বেশি ইহুদি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করিতে পারিবে না এই নীতি গৃহীত হইল। ইহা ভিন্ন কঠোর সামরিক পরিদর্শন দ্বারা শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে আরব-ইহুদি প্রশ্নের কোন স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হইল না।

দ্বিতীয় কমিশন : প্যালেস্টাইন বিভাগের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত

আরব-ইহুদি সমস্যা সমাধানে ব্রিটিশ প্রচেষ্টা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—সমাধানের প্রশ্ন স্থগিত

ইয়েমেন (Yemen) : আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইয়েমেন রাজ্য অবস্থিত। ইহার মোট আয়তন মাত্র ৭৪ হাজার বর্গমাইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়েমেনবাসীরা তুর্কী আধিপত্য অবসানের জন্য বিদ্রোহ শুরু করে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই রাজ্যে একাধিক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই সময়ে ইতালি ও তুরস্কের মধ্যে যুদ্ধের সুযোগ লইয়া সৈয়দ মোহম্মদ-ইবন্-অল্-ইদ্রিস্ ইতালির সাহায্যে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ইয়েমেনকে এক-প্রকার স্বাধীন করিতে সমর্থ হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে এই স্বাধীনতা দৃঢ়তর হয় এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের সহিত মিত্রপক্ষের যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে ইয়েমেনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে ইয়েমেনের স্বাধীনতা-স্পৃহা : ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতালাভ

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়েমেন রাশিয়ার সহিত, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের সহিত, ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও আমেরিকার সহিত মিত্রতাসূচক চুক্তি স্বাক্ষর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়েমেন নিরপেক্ষ থাকে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের চাপে ইতালীয় মেডিকেল মিশনকে ইয়েমেন হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে

স্বাধীন ইয়েমেনের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ

ইয়েমেন আরব লীগের এবং ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ (United Nations)-এর সভ্য হয়।

সিরিয়া ও লেবানন (Syria & Lebanon): ইরাক প্যালেস্টাইন ভিন্ন আরব জাতীয়তাবাদের অপর কেন্দ্র ছিল সিরিয়া। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সের অধীনে 'ম্যাণ্ডেট্' Mandate) হিসাবে স্থাপিত হয়। ফরাসী সরকার সিরিয়ার সংখ্যালঘু জাতি-অধ্যুষিত তিনটি অঞ্চলকে আরব-প্রধান অঞ্চল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। উপকূল অঞ্চলের লাটাকিয়া (Latakia) এবং জেবেল ড্রুস্ (Jebel Druse) অঞ্চল ফরাসী সরকারের শাসনাধীনে স্থাপন করা হইল, উত্তর দিকে আলেকজান্দ্রেতা (Alexandretta) তুর্কীজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল বলিয়া উহাকে সিরিয়ার অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হইল। আলেকজান্দ্রেতার অধিকাংশই অবশ্য ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ককে প্রত্যর্পণ করা হয়।

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতি

ফরাসী সরকার কর্তৃক সিরিয়ার বিচ্ছিন্নীকরণ-নীতি আরবদের বিদ্বেষের কারণ হইল। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ আরবগণ নিজ দেশের সংহতি-নাশ সহ্য করিল না। তাহারা প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ফরাসীদের আক্রমণ করিতে লাগিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের বিদ্রোহ এক দারুণ আকার ধারণ করিলে ফরাসী সরকার কামান ব্যবহার করিয়া দামাস্কাস নগরীতে নিজ আধিপত্য-রক্ষায় সমর্থ হইলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার সিরিয়ার শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে নাকচ করিয়া দিয়া ফরাসী শাসন স্থাপন করিলেন। এই সকল কার্যের ফলে সামরিক ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা যেটুকু শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ততটুকুই হইল, কিন্তু আরবগণের সন্তুষ্টিবিধান করা সম্ভব হইল না। বরঞ্চ আরবগণ পূর্বাপেক্ষা অধিক জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। লেবাননেও ফরাসী সরকার মারো নাইটস্ (Maro Nites) নামক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আরবদের বিরুদ্ধে উস্কাইতে লাগিলেন।

আরবদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার আরবদের সহিত মীমাংসার জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন সাফল্য লাভ সম্ভব হয় নাই। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের

ফ্রান্স ও সিরিয়া এবং লেবাননের চুক্তি (১৯৩৬)

আপোষ-মীমাংসার আলোচনা-ফলে ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তির অনুকরণে ফ্রান্স ও সিরিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে সিরিয়ার সরকারের হস্তে সম্পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা ত্যাগ, আলওয়াই ও দ্রুজ অঞ্চলের সিরিয়ার সহিত সংযুক্তি এবং ফরাসী সরকারের সহিত এক ভিন্ন চুক্তির দ্বারা ফরাসী সৈন্য সিরিয়াতে স্থাপন করা স্থির হইল। লেবাননের সহিতও অনুরূপ এক চুক্তি সম্পাদন করা হইল।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুমোদনে ফ্রান্সের বিলম্ব
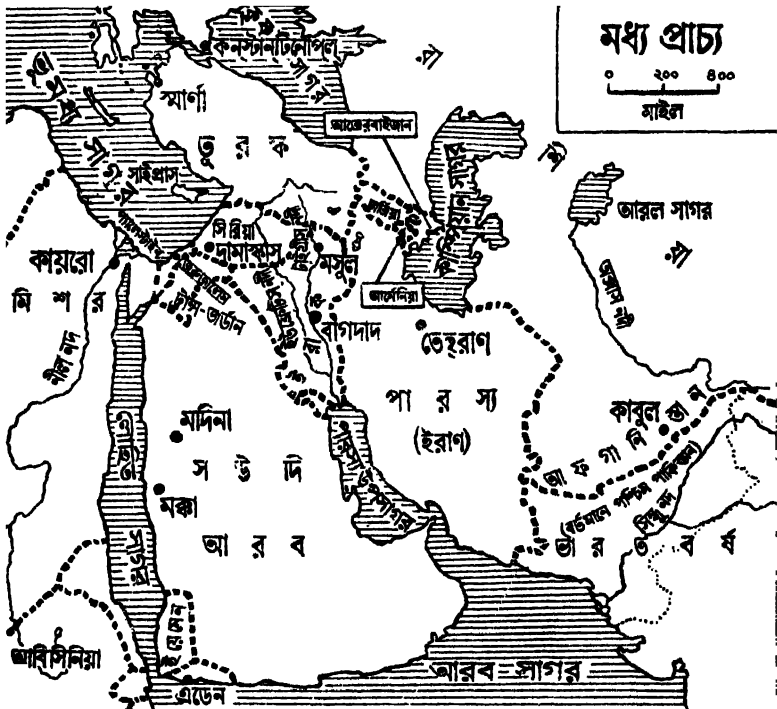
এই চুক্তি অনুযায়ী সিরিয়ায় এক জাতীয় সরকার গঠিত হইল। কিন্তু ফরাসী সরকার সিরিয়ার সহিত স্বাক্ষরিত ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদনে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন লাটাকিয়া, দ্রুজ, স্থেবেল প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী কর্মচারীদের উস্কানির ফলে স্ব-স্ব প্রাধান্যের এক মনোবৃত্তি দেখা দিল। ইহা ভিন্ন ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রেতার

সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত (১৯৩৯)।

অধিকাংশ ফরাসী সরকার তুরস্ককে দান করিলেন। এই সকল কারণে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার জাতীয় সরকার পদত্যাগ করিলেন। এই সুযোগে ফরাসী সরকার পুনরায় সিরিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসী শাসন চালু রহিল। হিট্‌লারের হস্তে ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রপক্ষের সৈন্য সিরিয়া ও লেবানন দখল করিল। ঐ বৎসরই (১৯৪১) ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি দ্বারা (Lytlleton-de-Gaulle Agreement) সিরিয়া ও লেবাননকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা-লাভ (১৯৪১)

মিশর ঃ (Egypt) [আদি সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল মিশর দীর্ঘ তিন হাজার বৎসরেরও অধিককাল ফ্যারাওদের অধীন ছিল। ক্রমে ক্রমে ত্রিশটি ফ্যারাও বংশ মিশরে রাজত্ব করিয়া ৫২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পারস্যের অধীন হয়। পারসিক প্রাধান্যের আমলেও মিশরে ফ্যারাও বংশই রাজত্ব করিতেন। ৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে পারসিক প্রাধান্যের অবসান করিয়া গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার মিশর দখল করিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া নামে তাঁহার এক নূতন রাজধানী মিশর দেশে স্থাপন করিলেন। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিদের অন্যতম টলেমি মিশরের অধিকার প্রাপ্ত হন। টলেমির বংশ রাণী ক্লিওপাট্রার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে (৩০ খ্রীঃ পূঃ) লুপ্ত হয়। ক্লিওপাট্রার মৃত্যুর সময় হইতে মিশর রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। প্রথমে রোমান সাম্রাজ্য এবং পরে বাইজান্টাইন বা পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে মিশর দেশ দীর্ঘকাল থাকে এবং ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে আরব জাতির অধিকারে আসে। আরবদের অধীনে ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত থাকিবার পর মিশর ঐ বৎসর তুর্কী সুলতান সেলিম কর্তৃক বিজিত হয়। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মিশর আইনত তুরস্ক সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ বলিয়াই বিবেচিত হইত। প্রকৃত শাসনব্যাপারে অবশ্য এই দীর্ঘকালের মধ্যে নানাপ্রকার পরিস্থিতির মধ্য দিয়া মিশরকে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।]

পূর্বকথা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৯৮) নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ব্রিটিশ-ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যে মিশর জয় করেন। পিরামিডের যুদ্ধে মিশর জয় করিলেও ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-তুর্কী যুগ্মবাহিনী মিশর হইতে ফরাসী আধিপত্যের অবসান ঘটায়। আলবানিয়া-বাসী এক দুর্ধর্ষ সামরিক নেতা মোহম্মদ আলি ফরাসী অধিকার হইতে মিশর দেশকে মুক্ত করিতে তুরস্ক সরকারকে সাহায্য করেন।

ফরাসী-অধিকৃত মিশর (১৭৯৮-১৮০১)

ইহা ভিন্ন তিনি মিশরের আভ্যন্তরীণ গোলযোগেও তুর্কী সুলতানের স্বার্থ রক্ষা করেন। ফলে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকেই তুর্কী সুলতান মিশরের পাশা (Viceroy) পদে নিযুক্ত করেন। মোহম্মদ আলি মামলুক নামক এক বিদেশী ক্রীত-দাস-উদ্ভূত সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার হইতে মিশর দেশকে রক্ষা করেন। মোহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশা আরবের ওহাবি বংশের হাত হইতে বহুস্থান জয় করেন। ইহা ভিন্ন ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুদান জয় করেন এবং ব্লু-নাইল নদীর তীরস্থ সেনার (Sennar) নামক স্থান পর্যন্ত নিজ সৈন্য মোতায়েন করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানকে গ্রীক স্বাধীনতা-আন্দোলন দমনে তিনি সাহায্য দান করেন।

মোহম্মদ আলি মিশরের পাশা নিযুক্ত

মিশর-তুরস্ক দ্বন্দ্ব

কিন্তু ইহার কিছুকালের মধ্যেই মোহম্মদ আলির সহিত তুর্কী সুলতানের মনো-মালিন্য ঘটে। এই সূত্রে মিশর-তুরস্ক যুদ্ধ আরম্ভ হইলে মোহম্মদ আলির পুত্র ইব্রাহিম পাশা প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি তুরস্ক সাম্রাজ্য-ভুক্ত স্থানসমূহ দখল করিয়া কনস্টান্টিনোপলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যস্থতায় মোহম্মদ আলি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আনাটোলিয়া প্রভৃতি স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু এই সকল স্থান ত্যাগ করিলেও ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতান মোহম্মদ আলিকে বংশপরম্পরায় মিশরের শাসনাধিকার দান করিলেন; ইহা ভিন্ন তাঁহাকে নিউবিয়া, সেনার, দারফুর ও কর্‌ডোফান্ প্রভৃতি কয়েকটি স্থানেরও গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন।

মোহম্মদের দীর্ঘ ৪৪ বৎসরের রাজত্বকালে (১৮০৫—'৪৯) আধুনিক মিশরের গোড়াপত্তন হইয়াছিল। শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা মোহম্মদ মিশর দেশকে একটি প্রগতিশীল রাজ্যে পরিণত করেন। সুদক্ষ সামরিক বাহিনী, মেডিকেল স্কুল, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, বন্দর, নৌ-নির্মাণ-কেন্দ্র প্রভৃতি গঠন করিয়া তিনি মিশর দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই মিশরে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার (Long-staple cotton) চাষ আরম্ভ হয় এবং সেচকার্যের সুবিধার জন্য কাইরো বাঁধ (Cairo Barrage) নির্মিত হয়।

মোহম্মদ আলির পর যথাক্রমে প্রথম আব্বাস্ (৮৪৯—'৫৪), সৈয়দ (১৮৫৪—'৬৩) ও ইস্‌মাইল (১৮৬৩—'৭০) মিশরের পাশা পদে

ছিলেন। সৈয়দের শাসনকালেই সুয়েজ খাল খনন শুরু হয় এবং ইস্‌মাইলের আমলে তাহা শেষ হয় (১৮৬৯)।* ইস্‌মাইল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী সুলতানের নিকট হইতে 'খেদিভ্' (Khedive) উপাধি প্রাপ্ত হন।

---

* **সুয়েজ খাল** : প্রাচীন মিশরের কার্ণাক-মন্দির-গাত্রের লিপিতে ফ্যারাও প্রথম সেটি (১৩৮০ খ্রীঃ পূঃ)-এর আমলে সুয়েজ খালের স্থানে একটি অপ্রশস্ত খাল নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে উহা মজিয়া যায়। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক উত্তমাশা অন্তরীপের পথে প্রাচ্যদেশে যাতায়াতের সমুদ্র-পথ আবিষ্কৃত হইলে প্রথমে ভেনিসবাসী এবং পরে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই (১৬৪৩—১৭১৫) ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের মধ্যে খাল খনন করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইংরেজ কবি ও নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার *Tamberlaine*-এর দ্বারা এই উক্তি করাইয়াছিলেন :

—"here not far from Alexandria,
Whereas the Terrene and red sea meet
Being distant less than full a hundred leagues
I meant to cut a channel to them both
That men might quickly sail to India"—

—Marlowe's *Tamberlaine*

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি মিশর জয় করিবার পর তাঁহার ইঞ্জিনীয়ারদের বহুকাল-পরিকল্পিত এই খাল খনন করা যায় কিনা সেই বিষয়ে প্রাথমিক জরীপ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইঞ্জিনীয়ারগণ ভুলবশত ভূমধ্যসাগর ও লোহিতসাগরের জলের উচ্চতায় ২৯ ফুটের ব্যবধান আছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় এই পরিকল্পনা তখন পরিত্যক্ত হয়। ১৮৪৬—'৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জরীপের ফলে নেপোলিয়নের ইঞ্জিনীয়ারদের ভুল ধরা পড়ে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপস্ (Ferdinand-de-Lesseps) নামে একজন ফরাসী উদ্যোক্তা সৈয়দ পাশার নিকট হইতে ৯৯ বৎসরের চুক্তিতে সুয়েজ খাল খননের অধিকার লাভ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই ৯৯ বৎসর অতিবাহিত হইলে খালটি সম্পূর্ণভাবে মিশরের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে স্থির হয়। Compaignie Universelle du Canal Maritime নামে একটি কোম্পানী স্থাপন করিয়া (১৮৫৮) উহার শেয়ার বিক্রয় করা হয়। অর্ধেকেরও বেশি শেয়ার (২ লক্ষ) ফ্রান্সে বিক্রয় হয় ৯৬ হাজার শেয়ার তুরস্কে বিক্রয় হয়; অবশিষ্ট ৮৫,৫০৬টি শেয়ার মিশরের খেদিভের নিজস্ব থাকে। মোট ২০ কোটি ফ্রাঙ্ক খরচে এই খালটি খনন করা হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে খালটির খনন-কার্য শেষ হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ফরাসী সম্রাজ্ঞী (তৃতীয় নেপোলিয়নের পত্নী) ইউজিনী উহার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের খেদিভের মোট শেয়ার-সংখ্যা ১,৭৬,৬০২তে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অর্থাভাবে খেদিভ্ এই মোট শেয়ার ব্রিটিশ প্রধান-মন্ত্রী ডিজরেইলির আগ্রহে ব্রিটিশ সরকারের নিকট মোট ৩৯,৭৬,৫৮২ পাউণ্ডে বিক্রয় করেন।

খেদিভ্ ইস্‌মাইল তাঁহার পিতামহ মোহম্মদ আলির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দেশের উন্নতিমূলক কার্যাদি চালাইলেন। তিনি ডাক-বিভাগ, শুল্ক-ব্যবস্থা, রেলপথ, বন্দর, ইক্ষু-চাষ প্রভৃতির উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতা, রাজ্যবিস্তার-নীতি প্রভৃতির ফলে তিনি দিন দিনই ঋণগ্রস্ত হইতে থাকিলেন। অবশেষে এক আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে ইস্‌মাইল ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ দুই দেশ নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ মিশরের আভ্যন্তরীণ শাসনের উপর এক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা স্থাপন করিল। ফলে, মিশরীয় সরকার ইঙ্গ-ফরাসী দ্বৈত প্রভাবাধীন হইল।

মিশরের অর্থনৈতিক বিপর্যয় : ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃত্ব স্থাপন

পরবর্তী পাশা তওফিক্-এর আমলে আহ্‌মদ আরবী পাশা নামে একজন দেশপ্রেমিক দেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করেন। এই সূত্রে

প্রথমে সুয়েজ খালের শেয়ার হইতে কোন লাভ না হইলেও ১৯২০-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার শেয়ার-মূল্যের ৮ গুণ অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯,৭৬,৫৮২ পাউণ্ডের ঐ সকল শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৩১০ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছিল।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর সুয়েজ ক্যানাল কনভেনশন (Suez Canal Convention নামে এক আন্তর্জাতিক চুক্তি ব্রিটেন ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, স্পেন, ইতালি, নেদারল্যাণ্ড, রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা সুয়েজ খাল 'যুদ্ধ ও শান্তির কালে সকল দেশের যুদ্ধ-জাহাজ ও বাণিজ্য-জাহাজের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে' এই শর্ত গৃহীত হয়। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানী উহার কার্যকাল ৯৯ বৎসরের অধিক কাল বাড়াইবার আবেদন করিলে মিশর উহা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে, ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানীর মেয়াদ শেষ হইবার কথা। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি দ্বারা ক্যানাল কোম্পানীর আয় হইতে মোট ৩ লক্ষ ইজিপশিয়ান পাউণ্ড মিশর সরকারকে দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইতিপূর্বে মিশর সরকার সুয়েজ খালের আয়ের কোন অংশ পাইতেন না। ইহা ভিন্ন ক্যানাল কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ডে মিশরীয়দেরও স্থান দেওয়া হয় এবং শতকরা ৩৩ জন কর্মচারী মিশরীয়দের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইবে এই নীতি গৃহীত হয়। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানী মিশরের আইন অনুযায়ী মিশরীয় কোম্পানী হিসাবে মিশর দেশে রেজিস্ট্রি করা হইয়াছিল।*

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে মিশরীয় সরকার সুয়েজ খাল কোম্পানীর জাতীয়করণ করিয়াছেন। এই সূত্রে মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী সশস্ত্র আক্রমণ হয়। ইউ. এন. ও. (U.N.O.) এবং পৃথিবীর জনগণের তীব্র প্রতিবাদে ইঙ্গ-ফরাসী সেনাবাহিনী মিশর ত্যাগে বাধ্য হইয়াছে।

*Vide, *The Middle East* Royal Institute of International Affairs, pp. 146-48, 153.

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশসৈন্য কায়রো দখল করে। ঐ সময় হইতেই মিশরে ব্রিটিশ সামরিক শাসন স্থাপিত হয়। লর্ড ক্রোমার ছিলেন প্রথম ব্রিটিশ এজেন্ট ও কন্সাল-জেনারেল। ঐ সময়ে মাহাদি নামে একজন নেতার অধীনে সুদান মিশরের অকর্মণ্য শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া পড়িলে জেনারেল গর্ডনকে বিদ্রোহ দমনের কার্যে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গর্ডন খার্টুম-এ প্রবেশ করিলে মাহাদির সেনাবাহিনী তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া খার্টুম দখল করে এবং গর্ডন স্বয়ং ও তাঁহার সেনাবাহিনীর বহু সংখ্যক লোক প্রাণ হারান। কাইরো হইতে গর্ডনকে সামরিক সহায়তা পাঠাইতে বিলম্ব হওয়ার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছিল। পরবর্তী তের বৎসর মাহাদি স্বাধীনভাবে সুদানে রাজত্ব করেন। ১৮৯৬-'৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুদান পুনরায় মিশরীয় অধিকারে আসে এবং সুদানের উপর ইঙ্গ-মিশরীয় যুগ্ম শাসন স্থাপিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ফ্যাসোডা নামক স্থানটি দখল করে। এই স্থানটি ব্রিটিশ আওতার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া এই ব্যাপার লইয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে। অবশেষে ফরাসী সৈন্য ফ্যাসোডা হইতে অপসারিত হইলে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে এক মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স মিশরের উপর ব্রিটিশ অধিকার স্বীকার করিয়া লয় এবং ব্রিটেনও মরক্কোর উপর ফরাসী প্রাধান্য স্বীকার করে। ঐ বৎসর মিশরের উপর হইতে বিদেশী অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ দূরীভূত হয়।

লর্ড ক্রোমারের অর্থ-নৈতিক পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা

গর্ডনের হত্যা

'ফ্যাসোডা' সংঘর্ষ

লর্ড ক্রোমারের দক্ষতার ফলে মিশরের অর্থ নৈতিক অব্যবস্থা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই দেখা দিল। মুস্তাফা কামিল নামে একজন নেতার নাম এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে ক্রোমার অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থলে সার এলডন্ গর্স্ট্ (Eldon Gorst, 1907-'11) এবং তাঁহার পর লর্ড কিচেনার (১৯১১-'১৪)-এর আমলে মিশরীয়গণ শাসন-ব্যবস্থায় কতক পরিমাণ স্বাধিকার লাভ করে। লর্ড কিচেনার পুর্বেকার দুই-কক্ষযুক্ত পার্লামেণ্টের স্থলে এক-কক্ষযুক্ত পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া ইহার ক্ষমতা কতক পরিমাণে বৃদ্ধি করেন।

মিশরীয়দের শাসন-তান্ত্রিক অধিকার লাভ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ইংলণ্ডের বিপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলে ব্রিটেন মিশর দেশকে ব্রিটিশ-'সংরক্ষিত দেশ' (Protectorate) বলিয়া ঘোষণা করে। প্রধানত সুয়েজ খালের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইয়াছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে মিশরের জাতীয়তাবাদী দল ওয়াফ্‌দ (Wafdists) মিশরের স্বাধীনতার প্রশ্ন আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনের সম্মুখে উত্থাপন করিতে চাহিলে বলপূর্বক তাহাদিগকে বাধা দেওয়া হইল। 'ওয়াফ্‌দ' দলের নেতা জগ্‌লুল পাশা কাইরোতে অবস্থিত ব্রিটিশ প্রতিনিধিবর্গের সহিত এই বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ না হইয়া সরাসরি শান্তি-সম্মেলনে একটি প্রতিনিধি-দলসহ উপস্থিত হইবেন স্থির করিলেন। ব্রিটিশ সরকার জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার তিন জন প্রধান অনুচরকে গ্রেপ্তার করিলেন এবং মাণ্টায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ফলে, সমগ্র মিশর দেশে এক ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হইল। ব্রিটিশ সরকার দমন-নীতি অনুসরণ করিয়া এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করিলেন। অল্পকাল পরেই লর্ড এলেন্‌বি মিশরের হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়া আসিলে জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার সহচরদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল। জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার সহচরগণ প্যারিসে গমন করিলেন, কিন্তু প্যারিস সম্মেলনে তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিবার কোন সুযোগ তাঁহারা পাইলেন না। ইহার ফলেও মিশরে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ব্রিটিশ সরকার এইবার বাধ্য হইয়াই মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। লর্ড মিল্‌নার (Sord Milner) ছিলেন এই কমিশনের সভাপতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ: মিশর ব্রিটিশ-সংরক্ষিত দেশ বলিয়া ঘোষিত

ওয়াফ্‌দ দলের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

লর্ড মিল্‌নার মিশন আলাপ-আলোচনার পরও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের প্রধানমন্ত্রী আদ্‌লি যগন পাশাকে ব্রিটিশ সরকার আমন্ত্রণ জানাইলেন। এইবারও আলাপ-আলোচনার পর কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইল না। আদ্‌লি মিশরে ফিরিয়া আসিয়া প্রধান-মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেন। ইহার ফলে পুনরায় মিশরে এক আন্দোলন শুরু হইল। জগ্‌লুল পাশা ও তাঁহার সহকারী পাঁচ জন নেতাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইল।

ইঙ্গ-মিশরীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করিতে না পারিয়া এক ঘোষণার দ্বারা মিশরের উপর হইতে ব্রিটিশ 'সংরক্ষণের' (Protectorate)-এর অবসান করিলেন। সামরিক আইন উঠাইয়া দেওয়া হইল কিন্তু সুদান ও মিশরের সামরিক নিরাপত্তা, মিশরস্থ বিদেশীদের স্বার্থ প্রভৃতি রক্ষার ভার ব্রিটিশদের হস্তেই রাখা হইল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ সুলতান ফুয়াদ (Sultan Fuad) মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। পর বৎসর মিশরে এক নূতন শাসনতন্ত্র চালু করা হইল এবং এই নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী (ঐ বৎসরই ১৯২৩) সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। পার্লামেন্টে জগ্‌লুল পাশার নেতৃত্বে ওয়াফ্‌দ দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। জগ্‌লুল পাশা প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সহিত সাক্ষাৎভাবে আলাপ-আলোচনার জন্য লণ্ডনে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি লণ্ডন হইতে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে মিশরে এক গোলযোগের সৃষ্টি হইল।

মিশরের উপর হইতে ব্রিটিশ 'সংরক্ষণের' অবসান—ফুয়াদ মিশরের রাজপদে অধিষ্ঠিত (১৯২২)

জাতীয়তাবাদী আশা আকাঙ্ক্ষা: ব্রিটিশ সরকারের সহিত আপোষের ব্যর্থ চেষ্টা

এই সময়ে সুদানের ব্রিটিশ গবর্ণর-জেনারেল সার লী স্ট্যাক্ (Sir Lee Stack) ও মিশরীয় সেনাবাহিনীর সর্দারকে কাইরোর রাজপথে হত্যা করা হইল। ফলে, পরবর্তী কয়েক বৎসর মিশরের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে জগ্‌লুল পাশার মৃত্যু হইলে নাহাস্ পাশা প্রধানমন্ত্রী হইলেন। কিন্তু রাজা ফুয়াদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হওয়ায় কয়েক মাসের মধ্যে রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং মিশরীয় শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নূতন নির্বাচনে নাহাস্ পাশা পুনরায় শাসন ক্ষমতা লাভ করিলেন। তিনি শাসনতন্ত্র পুনঃস্থাপন করিলেন এবং রাজক্ষমতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে আইন পাস করিলেন। রাজা অবশ্য এই আইন অনুমোদন করিলেন না। ফলে নাহাস্ পাশা পদত্যাগ করিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা নিজ সমর্থক প্রধানমন্ত্রী সিদ্‌কি পাশার সাহায্যে শাসন চালাইলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাহাস্ পাশা পুনরায় মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া পূর্বেকার শাসনতন্ত্র পুনঃস্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মিশরীয় সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু

মিশরের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস

১৯২৭ ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের উভয় চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নাহাস্ পাশার আমলে তৃতীয়বার চেষ্টা চলিল, কিন্তু তাহাতেও প্রথমে কোন ফল হইল না। ১৯৩৫-'৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনি কর্তৃক আবিসিনিয়া দখল ব্রিটিশ সরকারের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং ঐ বৎসরই (১৯৩৬) শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড ও মিশরের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে মিশরে ব্রিটিশের সামরিক শাসনের সমাপ্তি ঘটে, কেবলমাত্র সুয়েজ খাল অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্য রাখিবার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ট্রিও (Montreux) চুক্তি দ্বারা ব্রিটিশ ও অপরাপর বিদেশীদের বিচারালয়, বিশেষ ক্ষমতা প্রভৃতি পরিত্যক্ত হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মিশর লীগ-অব-ন্যাশন্সের সদস্যপদ লাভ করে।

ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি (১৯৩৬)

মণ্ট্রিও চুক্তি (১৯৩৭)

মিশরের লীগ-অব-ন্যাশন্সের সদস্যপদ লাভ

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে-ই রাজা ফুয়াদের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার নাবালক পুত্র ফারুক্ মিশরের রাজা হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই।

ফারুক-এর সিংহাসন লাভ

এদিকে নূতন রাজা ফারুকের সহিত নাহাস্ পাশার মতানৈক্য দেখা দিলে নাহাস্ পাশার স্থলে আলি মাহির পাশা প্রধানমন্ত্রী হইলেন, ইহা ভিন্ন নাহাস্ পাশার 'ওয়াফ্দ' দলেও বিভেদ দেখা দিল। আহম্মদ পাশা ও নক্রাশি পাশা 'সা'দ' (Sa'dist) দল নামে এক নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান মিশরের নিরাপত্তার সমস্যা বৃদ্ধি করিলে মিশরীয় পার্লামেণ্ট নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিল। ১৯৪০ হইতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশরের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ নানাপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যুদ্ধাবসানে (১৯৪৬) মিশর সরকারের চাপে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ বেভিন কাইরোতে আসিলেন এবং উভয় পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা (১) ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কাইরো, আলেকজাণ্ড্রিয়া ও নীল নদের মোহনা হইতে অপসারণ সম্পূর্ণ করা হইবে এবং ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সমগ্র মিশর

আভ্যন্তরীণ ইতিহাস

ইঙ্গ-মিশরীয় চুক্তি (১৯৪৬)

হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত হইবে স্থির হইল। মিশর ও মিশরের নিকটবর্তী ব্রিটিশ স্বার্থ-জড়িত স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মিশর ও ব্রিটিশ সরকার যুগ্মভাবে চেষ্টা করিবেন এবং সুদানের শাসন-ব্যাপারে উভয় সরকার যুগ্মভাবে নীতি নির্ধারণ করিবেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সুদান মিশরের রাজার অধীনে থাকিবে—এই সকল শর্তও ঐ চুক্তিতে সন্নিবিষ্ট হইল। কিন্তু এই চুক্তির ব্যাখ্যা লইয়া ব্রিটিশ ও মিশরীয় সরকারের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে ব্রিটিশ সৈন্যাপসারণের প্রশ্ন ইউ. এন. ও. তে উত্থাপন করা হইল। অপর দিকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের জন্য মিশরে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি হইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে ব্রিটিশ সৈন্য মিশরের অপরাপর সকল স্থান ত্যাগ করিলেও সুয়েজ খালের নিরাপত্তার অজুহাতে ফইদ্ (Fayyid) নামক স্থানে মোতায়েন করা হইল। ইউ. এন. ও.-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলে অবশ্য এই প্রশ্নের কোন মীমাংসা হইল না। ইতিমধ্যে মিশরের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লবে রাজা ফারুক্ সিংহাসনচ্যুত হইলেন। নগুইব ও নাসের ছিলেন এই বিপ্লবের নেতা। নূতন জাতীয় সরকারের চাপে ব্রিটিশ সরকার সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য হইয়াছেন। মিশরে এক নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র কার্যকরী করা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ সর্বাঙ্গীণ পুনরুজ্জীবনের কার্যও ব্যাপক উৎসাহ সহকারে গৃহীত

ইউ. এন. ও. এবং মিশরীয় সমস্যা

ব্রিটিশ সৈন্যাপসারণ

প্রজাতান্ত্রিক শাসন স্থাপন

পারস্য বা ইরান (Persia or Iran): খনিজ তৈল-সম্পদে সম্পদশালী পারস্যদেশ বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বিদেশী স্বার্থপরতার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ব্রিটেন ও রাশিয়া পারস্যের প্রাকৃতিক সম্পদ আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে পারসিক অর্থাৎ ইরানীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধের সৃষ্টি করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন ও রাশিয়া যুগ্মভাবে পারস্যের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের উদ্দেশ্যে পরস্পর বিবাদ মিটাইয়া ফেলে। ঐ বৎসর ইঙ্গ-রুশ-চুক্তি দ্বারা পারস্যের উত্তর অংশ রাশিয়ার প্রভাবাধীন (under the sphere of influence) বলিয়া স্বীকৃত হয়। পারস্য উপসাগর ও দক্ষিণ-পূর্বাংশে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। পারস্য উপসাগর অঞ্চলে প্রাধান্য বজায় রাখা ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের

রাশিয়া ও ইংলণ্ড কর্তৃক শোষণ

নিরাপত্তার দিক দিয়া প্রয়োজন ছিল। সুতরাং রাশিয়া ও ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য পারস্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বহুপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইল।

ইরানীদের জাতীয় মর্যাদা ইঙ্গ-রুশ নীতির ফলে ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তাহাদের মধ্যে এক ব্যাপক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শুরু হয়। এই সূত্রে প্রথমে পারস্যের শাহ্কে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র স্থাপনে বাধ্য করা হয় এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে রুশ সেনাবাহিনী পারস্যের উত্তরাংশ সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া লয়। এমন কি পারস্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কার্যে রুশগণ বাধা দান করে। তাহাদের চাপে পারস্য সরকার নিজ অর্থনৈতিক উপদেষ্টাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন। ইনি ছিলেন একজন আমেরিকাবাসী অর্থনীতিক।

ইরানী জাতীয়তাবাদ : রাশিয়া কর্তৃক পারস্যের উত্তরাংশ দখল

এইভাবে বিদেশী স্বার্থপরতার বিষময় ফল যখন ইরানীরা ভোগ করিতেছিল, তখন শুরু হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। রুশ-তুর্কী-ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পারস্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অবমাননা করিয়া পারস্যের সীমার অভ্যন্তরে পরস্পর যুদ্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করিল না। দুর্বল পারস্য সরকার বিদেশীদের হাত হইতে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। ইহা ভিন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে পারস্য সরকার ব্রিটিশ সরকারের তাঁবেদার রাজ্য হিসাবে পরিণত হইবার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইলেন। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ পারসিকগণ সরকারের এই আত্মঘাতী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রেজাখান পহ্লভি নামক একজন সামরিক নেতা বলপূর্বক অকর্মণ্য সরকারকে পদচ্যুত করিয়া এক জাতীয়তাবাদী সরকার গঠন করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পারসিক 'মজ্লিস্' অর্থাৎ পার্লামেণ্ট রেজাখানকে পারস্যের সিংহাসনে স্থাপন করিল। তিনি রেজাশাহ্ পহ্লভি উপাধি ধারণ করিয়া পারস্যের রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : রেজাখান পহ্লভির বলপূর্বক শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ

রেজাখান পারস্যের শাহ্পদে অধিষ্ঠিত

রেজাশাহ্ ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক এবং ক্ষমতাশালী সেনানায়ক। দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিসাধন করা-ই হইল তাঁহার রাজত্বের মূল নীতি। তিনি তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের ন্যায়-ই জনকল্যাণকর কার্যের দ্বারা তাঁহার ক্ষমতালাভের সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছিলেন।

রেজাশাহের শাসনে জনকল্যাণ সাধন

তিনি প্রথমে পারস্য রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করিলেন। বিভিন্ন অংশের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করিয়া তিনি এক-কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত করিলেন। বিদেশী প্রভাব মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে বিদেশীদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তিনি বন্ধ করিলেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে তিনি বিদেশী অর্থনীতিকদের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এ্যাংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানীকে তিনি নূতন শর্তে চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করিলেন। পরিবহণের সুবিধা-বৃদ্ধির জন্য রাস্তা ও রেলপথ তিনি প্রস্তুত করাইলেন এবং দেশরক্ষার্থে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। একটি নৌবাহিনীও তিনি গঠন করিলেন। সমাজে নারীজাতীর মর্যাদা-বৃদ্ধি, রাজনৈতিকক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা স্থাপন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রভৃতি নানা কিছু করিয়া দেশের মধ্যে তিনি এক নবযুগের সূচনা করিলেন। দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রীতি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পারস্য' নামের পরিবর্তে ইরানী জাতির নামের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দেশের নামকরণ করা হইল ইরান।

রেজাশাহের কার্যাদি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেজাশাহ্ জার্মান-প্রীতি প্রদর্শন করিলে ইঙ্গ-রুশ সৈন্য ইরানে প্রবেশ করিয়া খনিজ তৈলের উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি দখল করিল। অবশেষে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতির চাপে রেজাশাহ্ নিজ পুত্র মোহম্মদ রেজার পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিলে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ রেজাশাহের পদত্যাগ (১৯৪১)

একাদশ অধ্যায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

(The United States of America)

স্বাধীন আমেরিকার সমস্যা (Problems of Independent America) ঃ ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার মাত্র ছয় দিন পূর্বে (এপ্রিল ৩০, ১৭৮৯) আমেরিকার বিপ্লব সাফল্যের সহিত নিষ্পন্ন হইল। ঐ দিন মার্কিন যক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৮৯-'৯৭)

স্বাধীন আমেরিকার উত্তরোত্তর উন্নতির ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ঐতিহাসিক কেটেল্‌বি বলেন ঃ 'আমেরিকা যেন একশত বৎসরের মধ্যে ইওরোপীয় অপরাপর দেশের হাজার বৎসরের ইতিহাসের বিবর্তন সম্পন্ন করিয়াছে।'* এই অসাধারণ দ্রুত উন্নয়নের পশ্চাতে কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল সন্দেহ নাই। (১) ইওরোপ হইতে আমেরিকার দূরত্ব, (২) ইওরোপীয় রাজনীতির জটিলতা হইতে আমেরিকার স্বেচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততা, (৩) সামরিক নিরাপত্তার জটিলতা-হীনতা প্রভৃতি কারণে আমেরিকা তাহার সম্পূর্ণ শক্তি নিজ ভাগ্যোন্নতিতে নিয়োজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই সকল কারণ ভিন্ন অপর একটি কারণও আমেরিকার স্বপক্ষে ছিল। (৪) ইওরোপীয় দেশগুলির ন্যায় আমেরিকাকে দীর্ঘকাল-প্রচলিত কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ঐতিহ্য, বাধা-বিপত্তি কোন কিছুরই সম্মুখীন হইতে হয় নাই। পুরাতন শহরের নাগরিক জীবনকে ব্যাহত না করিয়া শহরের সংস্কার সাধন এবং একেবারে নূতন স্থানে নূতন নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী শহর-স্থাপনের যে আপেক্ষিক সুবিধা থাকে, সেইরূপ সুবিধালাভে আমেরিকা ইওরোপীয় দেশগুলি অপেক্ষা

মার্কিন উন্নতির মূল কারণ

* "She (America) seems to have compressed into one century historical processes which in Europe have extended over more than a thousand years." Ketelbey, p. 534.

অধিকতর সমর্থ হইয়াছিল। এই সকল সুবিধার জন্য আমেরিকাবাসীরা তাহাদের ইংরেজ পূর্বপুরুষগণ অপেক্ষা যে ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া উঠিয়াছিল তাহা উপলব্ধি না করিবার ফলেই ইংরেজ রাজনীতিকগণের মার্কিন নীতির বিফলতা পরিলক্ষিত হয়।* অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য যে, ইংরেজ ঐতিহ্যের সহিত ফরাসী দার্শনিকদের মতবাদের সংমিশ্রণ সাধন করিয়াই মার্কিন জাতি তাহাদের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল ও পরবর্তী গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ইংরেজ ঐতিহ্য ও ফরাসী দার্শনিক মতবাদের মিশ্রণে মার্কিন স্বাধীনতা ও শাসনপদ্ধতির জন্ম

নব-লব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ়তর করা ছিল ঐ সময়ের প্রধান সমস্যা। ইহা ভিন্ন যুদ্ধের ঋণ, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, উপনিবেশগুলির নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে অত্যধিক সচেতনতা, রাজতন্ত্রের সমর্থকদের দেশত্যাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা স্বাধীন মার্কিন সরকারের দায়িত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল।

স্বাধীন আমেরিকার সমস্যা

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আমেরিকার উপনিবেশগুলি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট হইলেন এই শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। মণ্টেস্কুর ক্ষমতাবিভাজন নীতি (Theory of Separation of Powers) অনুসরণ করিয়া প্রেসিডেণ্ট ও তাঁহার মন্ত্রিগণকে আইনসভার প্রাধান্য-মুক্ত রাখা হইল। কংগ্রেস নামক আইনসভার 'সিনেট' ও 'হাউস-অব-রিপ্রেজেন্‌টেটিভস্' (Senate & the House of Representatives) নামে দুইটি কক্ষ গঠন করা হইল। আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন-কানুন শাসনতন্ত্র-বিরোধী কিনা বিচার করিবার এবং শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার জন্য একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল। পরোক্ষ নির্বাচন দ্বারা প্রেসিডেণ্ট নিয়োগের প্রথা গৃহীত হইল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington): জর্জ ওয়াশিংটন সর্ব-সম্মতিক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন।

* "Do not make any difference between your American and your British subjects' said Dr. Johnson, and, acting on this advice George III lost a continent." Vide Ketelbey, p. 536.

আধুনিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতাদের অন্যতম হিসাবে জর্জ ওয়াশিংটন নিজ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্ট হইবার দাবি ওয়াশিংট অপেক্ষা অপর কাহারও ছিল না, বলা বাহুল্য।

প্রেসিডেন্ট-পদে ওয়াশিংটনের দাবি

জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি। তাহার চরিত্রের নৈতিকতা ও সততা, তাঁহার সংযম ও অধ্যবসায়, সর্বোপরি তাঁহার দেশাত্মবোধ ও সর্বপ্রকার অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত নির্ভীকতা ও আত্মপ্রত্যয় তাঁহাকে নৈতিকতার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কার বা কূটবুদ্ধির কোন স্থান ছিল না। উচ্চ শিক্ষা বা প্রতিভা তাঁহার যে খুব বেশি ছিল এমন নহে, তথাপি কল্যাণের পথে মার্কিন জাতিকে চালিত করিবার শক্তি তাঁহার ছিল অপরিসীম। 'শান্তিতে বা যুদ্ধে, অথবা জনসাধারণের হৃদয়ে তাঁহার স্থান ছিল সর্বপ্রথম।'* আমেরিকার ভবিষ্যৎ উন্নতিতে গভীর বিশ্বাস, ধর্মপ্রবণতা, নিরপেক্ষ বিচার-ক্ষমতা, অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সহিষ্ণুতা, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের অপরাপর বৈশিষ্ট্য।

জর্জ ওয়াশিংটনের চরিত্র

জর্জ ওয়াশিংটন যখন প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন তখন নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের সকল সমস্যাই বর্তমান ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী, প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসস্থান, কংগ্রেসের অধিবেশন-গৃহ, যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক বাহিনী, মন্ত্রিসভা, বিচারপতি কোন কিছুই তখন ছিল না। তদুপরি বিভিন্ন উপনিবেশের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থজ্ঞান ও পরস্পর প্রতিযোগিতার মনোবৃত্তি, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, পররাষ্ট্রীয় নীতি সম্বন্ধে দুর্বলতা, সবদিক দিয়া জর্জ ওয়াশিংটনের সমস্যার অন্ত ছিল না। তিনি নিজেও প্রথমে এই পরিস্থিতিতে ভীত না হইলেও, কতকটা সন্দিহান হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।† কিন্তু তাঁহার একনিষ্ঠ দেশপ্রেম এবং জনকল্যাণার্থে আত্মত্যাগ এইরূপ সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতেও তাঁহাকে জয়যুক্ত করিয়াছিল। তাঁহার পররাষ্ট্র

ওয়াশিংটনের সমস্যা

* "First in peace, first in war, and first in the hearts of his countrymen" —*Henry Lee*, vide, Ketelbey, p. 547.

† "My movements to the chair of government will be accompanied by feeling not unlike those of a culprit who is going to the place of his execution."—***Washington to General Knox***, vide, Ketelbey, p. 549.

সেক্রেটারী ছিলেন জেফারসন্ এবং রাজস্ব-বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন্। হ্যামিল্টন্ ছিলেন একাধারে সুদক্ষ সামরিক নেতা, দার্শনিক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক, আইনজ্ঞ, বাগ্মী ও অর্থনীতিক। আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মর্যাদালাভের একমাত্র পন্থা ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই কারণে হ্যামিল্টন্ নানাপ্রকার কর স্থাপন করিয়া ইউনিয়ন সরকারের আয় বৃদ্ধি করিলেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের জন্য যে ঋণ হইয়াছিল তাহা শোধ করিবার দায়িত্ব তিনি রাজ্যসরকারগুলির উপর হইতে ইউনিয়ন সরকারের উপর ন্যস্ত করিলেন। এইভাবে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করিলেন। জাতীয় ব্যাঙ্ক নামে একটি ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানও তিনি স্থাপন করিলেন। ওয়াশিংটন নামক শহর স্থাপন করিয়া উহাকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী করিবার ব্যবস্থা শুরু হইল।

আভ্যন্তরীণ শাসন

পররাষ্ট্রক্ষেত্রেও জর্জ ওয়াশিংটনের আমলে আমেরিকার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল। ফরাসী বিপ্লব শুরু হইলে ফ্রান্সের প্রতি স্বভাবতই আমেরিকায় সহানুভূতি প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ওয়াশিংটন ব্রিটেনের সহিত সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক আদান-প্রদান রক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা ভিন্ন, আমেরিকা কোন যুদ্ধে লিপ্ত হউক ইহা তিনি চাহিতেন না। এই দুই কারণে তিনি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করিলেন। এই নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের ফলে ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে আমেরিকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইল, কারণ আমেরিকা বিবদমান দেশগুলিকে সমভাবে মাল সরবরাহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ইংলণ্ড অবশ্য আমেরিকাকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার ত্রুটি করিল না। এমন কি মার্কিন জাহাজে করিয়া কোন কোন সামগ্রী ফ্রান্সে প্রেরণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিল ও ব্রিটিশ পশ্চিম ভারতীয় (British West Indies) অঞ্চলে কয়েকটি মার্কিন জাহাজও আটক করিল। এই সূত্রে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। জর্জ ওয়াশিংটন তাঁহার নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করিলেন না বটে, কিন্তু ব্রিটেনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে তিনি স্বীকৃত হইলেন। তিনি ফরাসী দূত সিটিজেন জেনেট (Citizen Genet)-কে অপসারণের জন্য ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানাইলেন। এই সময়ে আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে

ওয়াশিংটনের আমলে পররাষ্ট্র-নীতি

একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং মার্কিন অভিযোগের অনেক কিছু দূরীভূত করা সম্ভব হয়। এই চুক্তি আমেরিকাবাসীর মধ্যে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক করে।

এই সময় হইতে মার্কিন রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিভেদের সৃষ্টি হয়। হ্যামিল্টন্ ও অপরাপর অনেকে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। জেফারসন্ ও অপরাপর অনেকে ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধি-নীতির বিরুদ্ধে। এই দুইয়ের প্রথম দল 'ফেডারেলিস্ট্' (Federalist) এবং অপর দল 'রিপাব্লিকান-ডেমোক্রেট' (Republican democrat) নামে অভিহিত। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জেফারসন্ সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিয়া বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কালে ওয়াশিংটনের শাসনের এমন কি ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার আক্রমণ করা হইতে থাকে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটনকে তৃতীয়বার প্রেসিডেণ্ট-পদ দান করা হইলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন।

রাজনৈতিক বিভেদ: 'ফেডারেলিস্ট' ও রিপাব্লিকান-ডেমোক্রেট' দলের উত্থান

ওয়াশিংটনের প্রেসিডেণ্ট-পদ প্রত্যাখ্যান

জন এ্যাডামস্ (John Adams): পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট জন এ্যাডামস্ ছিলেন ফেডারেলিস্ট্ দলভুক্ত। রিপাব্লিকান-ডেমোক্রেট দল জেফারসন্কে ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচন করিতে সমর্থ হয়। এ্যাডামসের আমলে ফেডারেলিস্ট্ দলের শক্তি আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার ত্রুটির জন্যই এইরূপ ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেণ্ট জন এ্যাডামস্ (১৭৯৭—১৮০১)

ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে পর পর কয়েকবার পরাজিত হওয়ার ফলে স্বভাবতই ফ্রান্স আমেরিকাকে ফরাসী সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা-যুদ্ধের কালে প্রদত্ত ঋণ শোধের জন্য চাপ দিল। এই বিষয় লইয়া ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠিল। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন-ফরাসী চুক্তি নাকচ করিয়া এক নূতন চুক্তি দ্বারা (১৮০০) আমেরিকার সহিত মিটমাট করিয়া লইলেন। আমেরিকা পুনরায় নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিল।

এ্যাডামসের আমলে পররাষ্ট্র-নীতি: নেপোলিয়নের সহিত চুক্তি (১৮০০)

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে এ্যাডামসের আমলে 'বিদেশী' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' (Alien

and Sedition Acts)—এই দুইটি আইন পাস করিয়া ফেডারেলিস্ট্ দলের শত্রুপক্ষকে দমন করিবার চেষ্টার ফলে দেশের সর্বত্র সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। ফলস্বরূপ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে জেফারসন্ প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলেন এবং 'রিপাব্লিক-ডেমোক্রেট' দল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দলে পরিণত হইল।

এ্যাডামস্ ও ফেডারেলিস্ট্ দলের পতন: জেফারসন্ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

জেফারসন্ (Jefferson)ঃ মার্কিন ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই ভার্জিনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে জর্জ ওয়াশিংটন, ম্যাডিসন, জন মার্শাল, জেফারসন্ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভার্জিনিয়াবাসী জেফারসন্

জেফারসনের চরিত্রে কতকগুলি বিরুদ্ধ গুণাবলীর সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চেহারা মোটেই সুদর্শন ছিল না, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য এবং প্রীতিপূর্ণ আলাপ ও ব্যবহার তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে দেশপ্রেম ও উদারতা, দার্শনিকসুলভ চিন্তাশক্তি ও গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সহিত ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও চক্রান্ত-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ-মাত্রেরই মৌলিক অধিকারের নীতিতে প্রকাশ্যভাবে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু দাস-প্রথা সমর্থনকারীদের একটি দলগঠনের তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা। আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা ও ভার্জিনিয়া রাজ্যে ধর্মনৈতিক স্বাধীনতার আইনের রচয়িতা এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা হিসাবে মার্কিন ইতিহাসে তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

চরিত্র

আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে জেফারসনের নীতি ছিল ব্যয়সঙ্কোচ-সাধন এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন। প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সময় তিনি 'সকলের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার, সততার ভিত্তিতে সকল জাতির প্রতি মৈত্রী এবং কাহারো সহিত জটিল চুক্তি-সম্পাদন হইতে বিরত থাকা'* তাঁহার শাসনের মূল নীতি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি ভূতপূর্ব সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত 'বিদেশী' ও 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা' সম্পর্কিত আইন বাতিল করিয়া দিয়া এই দুই আইনের বলে কারাদণ্ডে

আভ্যন্তরীণ কার্যাদি

* 'Justice to all men, honest friendship with all nations, entangling alliances with none.'—*Jefferson in his inaugural speech.* Vide, Ketelbey, p. 556.

দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে মুক্তি দিলেন। তিনি ফেডারেলিস্ট্ কর্মচারীদের স্থলে ডেমোক্রেটিক মতাবলম্বীদের নিযুক্ত করিলেন। প্রথমে তিনি রাজ্যসরকারগুলির ক্ষমতা-বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা-বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করিযাছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান ব্যয়, যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন এবং ভাল ভাল রাস্তা দ্বারা সমগ্র দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনের ফলেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও আয়-বৃদ্ধির নীতি তিনি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ওহিও (Ohio) রাজ্যের সহিত যোগাযোগের জন্য উন্নত ধরণের রাস্তা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন জলদস্যুদের হাত হইতে মার্কিন নৌ-বাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্য তিনি ট্রিপলির সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (১৮০১—'৫)। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র দেড় কোটি ডলার দিয়া তিনি নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নিকট হইতে লুসিয়ানা (Louisiana) নামক ফরাসী উপনিবেশটি ক্রয় করিয়াছিলেন। ৮ লক্ষ বর্গমাইল ভূমি এই সামান্য অর্থ দ্বারা ক্রয় করা জমি ক্রয়-বিক্রয়ের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা-ঘোষণার ন্যায়ই ইহা মার্কিন ইতিহাসের এক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

রাস্তা-নির্মাণ

পররাষ্ট্র-নীতি : ট্রিপলির সহিত যুদ্ধ (১৮০১—১৮০৫)

ফ্রান্স হইতে লুসিয়ানা ক্রয় (১৮০৩)

ঐ সময়ে নেপোলিয়ন ইংলণ্ডকে অর্থনৈতিক অস্ত্রে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার 'কন্টিনেন্টাল প্রথা' চালু করিয়াছিলেন। ব্রিটেনও উহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের পাল্টা জবাব হিসাবে 'অর্ডার্স-ইন-কাউন্সিল' পাস করিয়াছিল। এই ভাবে উভয়পক্ষই পরস্পর পরস্পরের দেশের অবরোধ ঘোষণা করিয়াছিল। এই অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে ক্রমে নিরপেক্ষ দেশগুলি, বিশেষত আমেরিকার সামুদ্রিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ জাহাজগুলি মার্কিন জাহাজ তল্লাসী শুরু করিল। এমনকি ব্রিটিশ জাহাজে নাবিকের কাজ ত্যাগ করিয়া যাহারা মার্কিন জাহাজে কাজ গ্রহণ করিয়াছিল, ব্রিটিশ জাহাজগুলি তাহাদিগকে বলপূর্বক মার্কিন জাহাজ হইতে লইয়া যাইতে লাগিল। জেফারসন্ অবশ্য এই কারণে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন না। এই সূত্রে পরবর্তী প্রেসিডেন্টের শাসনকালে ব্রিটেনের সহিত আমেরিকার যুদ্ধ বাধিয়াছিল।

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পরস্পর অর্থনৈতিক অবরোধসূত্রে মার্কিন বাণিজ্য ও জাহাজের উপর আক্রমণ

জেফারসন্ দুইবার প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইয়া আট বৎসর আমেরিকার আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধন করিয়া ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিলেন।

জেম্‌স্ ম্যাডিসন্ (James Madison) ঃ পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট জেম্‌স্ ম্যাডিসন্ ১৮০৯ হইতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইবার প্রেসিডেণ্ট-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট ম্যাডিসন্ (১৮০৯-'১৭)

ম্যাডিসনের আমলের সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ (১৮১২ —১৪)। এই যুদ্ধ আমেরিকার স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত হইযা থাকে। ব্রিটিশ ঔদ্ধত্যে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধ দেখা দেয়। জেফারসনের আমলেই ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধেব ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিল। ম্যাডিসন্ মার্কিন জনমতের চাপে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। প্রথমে মার্কিন জাহাজের আক্রমণে ব্রিটিশ পক্ষ পরাজিত হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ জাহাজের আক্রমণে মার্কিন জাহাজ পশ্চাদপসরণ করিল। পেনিনসুলার যুদ্ধেব পর ব্রিটিশবাহিনী আমেরিকা আক্রমণ করিয়া ওয়াশিংটন শহর দখল কবিল এবং হোযাইট হাউস ভস্মীভূত করিল।

ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ ঃ মার্কিন স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ

অপর এক ব্রিটিশ বাহিনী অর্লিয়েন্স দখল করিতে গিয়া পরাজিত হইল। শেষ পর্যন্ত ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল এবং মার্কিন অভিযোগের প্রায় সব কিছুই দূরীভূত হইল। এই সূত্রে কানাডা ও আমেরিকার সীমারেখাও নির্ধারিত হইল।

ইঙ্গ-মার্কিন শান্তিচুক্তি

জেম্‌স্ মন্‌রো (James Monroe) ঃ ম্যাডিসনের পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট ছিলেন জেম্‌স্ মন্‌রো। মন্‌রোর আমলে জাতীয়তাবোধের এক ব্যাপক প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮১২—'১৪ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের ফলে মার্কিন জাতীয়তাবোধের বিকাশ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহারই প্রকাশ মন্‌রোর আমলে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতিতে পরিলক্ষিত হয়।

প্রেসিডেণ্ট জেম্‌স মন্‌রো (১৮১৭-২৫)

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার সহিত বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে আমেরিকা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অতি দৃঢ় ও অনমনীয় নীতি গ্রহণ করিলে এই বিবাদ আমেরিকার স্বপক্ষে মীমাংসিত হয়। এই ঘটনার ছয় বৎসর পর আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে মেটারনিক্-প্রভাবিত কন্‌সার্ট-অব-ইওরোপ (Concert of

মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি

Europe) এই বিদ্রোহ দমনে উদ্যোগী হয়। ঐ সময়ে প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো তাঁহার বিখ্যাত 'মন্‌রো-নীতি'* (Monroe Doctrine) ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা দ্বারা প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো স্পষ্ট ভাষায় ইওরোপীয় দেশগুলিকে জানাইলেন যে, আমেরিকা মহাদেশ ইওরোপীয় দেশসমূহের উপনিবেশ-স্থাপনের স্থল নহে। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের পক্ষে আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ-বিস্তার আমেরিকার নিরাপত্তা-বিরোধী এবং কোন শক্তি এই পন্থা অনুসরণ করিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহা শত্রুতা-মূলক কার্য বলিয়া বিবেচনা করিবে। মন্‌রো-নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল (১) ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে আমেরিকাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রতিক্রিয়াপন্থী কনসার্ট-অব-ইওরোপ হইতে মার্কিন গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। (২) ইহা ভিন্ন 'আমেরিকা আমেরিকা-বাসীদের জন্য' এই নীতি প্রচার করা, এবং (৩) আমেরিকাবাসীকে এক বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ করা।† পরবর্তী কালে আমেরিকার স্বার্থের প্রয়োজনমত মন্‌রো-নীতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

মনরো-নীতি 'Monroe Doctrine'

মন্‌রো-নীতির গুরুত্ব

* 'Hands off America,' 'America for the Americans', 'Our country right or wrong'—and such other expressions were characteristic of the age of national and Pan-American enthusiasm of the time.

†"The occasion has been judged proper for asserting as a principle in which the rights and interests of the United States are involved, that the American continents, are henceforth not to be considered as subjects for future colonisation by any European powers.

"......It is only when our rights are invaded or seriously menaced that we resent injuries or make preparation for our defence... The political system of the allied powers (Austria, France, Prussia and Russia) is essentially different in this respect from that of America...We owe it therefore to cando(u)r and to the amicable relations existing between the United States and those powers to declare that we should consider any attempt on their part to extend their system to any portion of this hemisphere as dangerous to our peace and safety. With the existing colonies or dependencies of any European power we have not interfered and shall not interfere. But with the Governments who have declared their independence and maintained it, and whose independence we have, on great consideration and on just principles, acknowledged. We could not view any interposition for the purpose of oppressing them, or controlling in any other manner their destiny, by any European power in any other light than as the manifestation of an unfriendly disposition towards the United States." ***Extracts from President Monroe's Declaration of December 2nd, 1823.*** Vide, E. H. Carr Appdx. I. p. 281.

করা হইয়াছিল। মনরো-নীতি হইতেই আমেরিকা পাশ্চাত্ত্যের গণতান্ত্রিকতার নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইয়াছিল বুঝিতে পারা যায়।

আমেরিকায় যে তীব্র জাতীয়তাবাদী চেতনা প্রকাশ পাইয়াছিল, উহা আভ্যন্তরীণক্ষেত্রে সাহিত্য, আইন-কানুন প্রভৃতি সব কিছুতে পরিলক্ষিত হয়। ইমাবসন, হথর্ণ, ফেনিমোর, পো, ব্যান্‌নক্রফ্‌ট, হোমস্‌, লুটিয়ার, লংফেলো প্রভৃতি সাহিত্যকারগণ মার্কিন জাতীয় সাহিত্য গঠনে ব্রতী হইলেন। জন মার্শাল সুপ্রীম কোর্টের বিচারের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের নূতন এবং প্রগতিশীল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহন-ব্যবস্থা, রাস্তা, খাল, রেলপথ প্রভৃতির উন্নয়ন ও নির্মাণের ফলে জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক মান উন্নীত হইল। কিন্তু এই জাতীয়তাবোধের অন্তরালে উত্তর ও দক্ষিণাংশের রাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবধানের প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। উত্তরের রাজ্যগুলি শিল্প, বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে লাগিল, অপর দিকে দক্ষিণের রাজ্যগুলি কৃষির উপর জোর দিল। কৃষির প্রাধান্য হেতু দাস-প্রথা বজায় রাখা তাহাদের স্বার্থের দিক দিয়া প্রয়োজনীয় ছিল।

আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের পার্থক্য

এনড্রু জ্যাক্‌সন্‌ (**Andrew Jackson**): ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এনড্রু জ্যাক্‌সনের প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচন (১৮২৯—'৩৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

*** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণ:**

জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৮৯—১৭৯৭) (দুইবার নির্বাচিত), জন এ্যাডামস্ (১৭৯৭—১৮০১), টমাস জেফারসন্ (১৮০১—১৮০৯) (২), জেম্‌স ম্যাডিসন্ (১৮০৯—১৮১৭) (২), জেম্‌স মনরো (১৮১৭—১৮২৫) (২), জন কুইন্‌সি এ্যাডামস্ (১৮২৫—১৮২৯), এনড্রু জ্যাক্‌সন্ (১৮২৯—১৮৩৭) (২), মার্টিন বুরেন্ (১৮৩৭—১৮৪১), উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন (১৮৪১—'৪১), জন টাইলার (১৮৪১—১৮৪৫), জেম্‌স্ পক্ (১৮৪৫—১৮৪৯), জেকারে টেলর (১৮৪৯—১৮৫০), মিলার্ড ফিলিমোর (১৮৫০—১৮৫৩), ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স (১৮৫৩—১৮৫৭), জেম্‌স্ বুকানন (১৮৫৭—১৮৬১), আব্রাহাম্ লিঙ্কন (১৮৬১—১৮৬৫) (২), এনড্রু জনসন্ (১৮৬৫—১৮৬৯), ইউলিসিস্ গ্র্যান্ট (১৮৬৯—১৮৭৭) (২), রাদার ফোর্ড হেইস্ (১৮৭৭—১৮৮১), জেম্‌স্ গার্ফিল্ড্ (১৮৮১—'৮১), চেষ্টার আর্থার (১৮৮১—১৮৮৫), গ্রোভার ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড (১৮৮৫—১৮৮৯), বেঞ্জামিন্ হ্যারিসন (১৮৮৯—১৮৯৩), গ্রোভার ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড (১৮৯৩—১৮৯৭), উইলিয়াম ম্যাক্‌কিনলি (১৮৯৭—১৯০১) (২), থিয়োডোর রুজ্‌ভেল্ট্ (১৯০১—১৯০৯) (২), উইলিয়াম ট্যাফট্ (১৯০৯—১৯১৩), উড্রো উইলসন্ (১৯১৩—১৯২১) (২), ওয়ারেন্ হার্ডিং (১৯২১—১৯২৩), ক্যালভিন্ কুলীজ (১৯২৩—১৯২৯) (২), হারবার্ট হুভার (১৯২৯—১৯৩৩) (৩), ফ্রাঙ্কলিন রুজ্‌ভেল্ট (১৯৩৩—১৯৪৫), (৩), ট্রুম্যান (১৯৪৫—১৯৫২) (২), আইসেন হাওয়ার (১৯৫২—৬০) (২), কেনেডি (১৯৬০—১৯৬৩), জনসন - (১

ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁহার আমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি কর্তৃক 'দক্ষিণের রাষ্ট্রসংঘ' স্থাপনে বাধা দান। ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জন এ্যাডামস্ (১৮২৫—'২৯)-এর আমলে উচ্চ হারে শুল্ক (tariff) স্থাপন করিবার ফলে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষতি ঘটে। এই সূত্রে সাউথ কেরোলিনা রাজ্যের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্কস্থাপনের ক্ষমতার বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। দক্ষিণের রাজ্যগুলির প্রতিনিধিগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি স্বাধীন রাজ্যের সমষ্টি বলিয়া বিশ্লেষণ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শুল্কস্থাপনের ক্ষমতা অস্বীকার করেন। এই বিষয় লইয়া মার্কিন সিনেটে এক দীর্ঘ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিভাজ্য এবং স্থায়ী এই নীতির উপর জোর দিয়া ইউনিয়নের শুল্কস্থাপন নীতির সমর্থন করেন। সাউথ কেরোলিনার নেতৃত্বে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণের রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের চেষ্টা করা হইলে জ্যাক্সন্ সামরিক শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হইলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই বিবাদের আপোষ-মীমাংসা হইল।

প্রেসিডেন্ট জ্যাকসন্ (১৮২৯—'৩৭)

মার্কিন ইউনিয়ন রক্ষা

জ্যাক্সনের সময়ে রিপাব্লিকান ডেমোক্রেট দলের বিরুদ্ধে হুইগ দল নামে অপর একটি দলের সৃষ্টি হইল। ইতিমধ্যে ফেডারেলিস্ট্ দলের অবশ্য পতন ঘটিয়াছিল। হুইগ দল পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিল। জর্জ ওয়াশিংটন হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যাক্সনের আমল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার ক্রমোন্নতির তৃতীয় পর্যায় সম্পন্ন করিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের রিপাব্লিকান দল নামে একটি নূতন দলের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় হইতে অদ্যাবধি রিপাব্লিকান ও ডেমোক্রেটিক—এই দুই রাজনৈতিক দলই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

হুইগ দলের সৃষ্টি

আব্রাহাম্ লিঙ্কন, ১৮৬১—১৮৬৫ (Abraham Lincoln): আধুনিক গণতন্ত্রের ইতিহাসে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের নাম নেপোলিয়নের নামের ন্যায়ই অমরত্ব লাভ করিয়াছে। আব্রাহাম্ লিঙ্কনের জীবনী আমাদের মনে যেমন এক অবাক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে তেমনি আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যুর মর্মান্তিকতা আমাদিগকে অভিভূত করে।

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেণ্টুকী নামক রাজ্যের এক কাঠের কুটিরে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের জন্ম হয়। শস্য-উৎপাদন, কাঠের ঘর নির্মাণ, নৌচালনা, কাঠকাটা প্রভৃতি দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ যাবতীয় কাজে তিনি পারদর্শী ছিলেন। অসাধারণ দৈহিক শক্তির সহিত অনন্যসাধারণ মানসিক বলের এক অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল। চিন্তাশীলতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দয়াপ্রবণতা, সরলতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহার চরিত্রকে সর্বজনের শ্রদ্ধার বস্তু করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা ছিল অপরিসীম এবং সাধারণ জ্ঞান ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

লিঙ্কনের জন্ম (১৮০৯)

চরিত্র

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইলিনয় (Illinois)-এর পরিষদে ডগ্‌লাস নামে অপর একজন সদস্যের সহিত সিনেটের সভ্যনির্বাচন সম্পর্কে তিনি এক বিতর্কে উপস্থিত হন। এই বিতর্কে তিনি নবগঠিত (১৮৫৪) রিপাব্‌লিকান বা প্রজাতান্ত্রিক দলের রাজনৈতিক আদর্শের যে সুযৌক্তিক ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতে সমগ্র জাতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই ঘটনার পূর্বে দীর্ঘ আট বৎসর তিনি ইলিনয় পরিষদের সদস্য ছিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার প্রতিভার কোন পরিচয় কেহ পায় নাই। আইনজীবী হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি বা অর্থাগম হইত না। প্রথমে তিনি হুইগ (Whig) দলের সমর্থক ছিলেন এবং হুইগ দল ক্ষমতা লাভ করিলে তিনি General Land office-এ কমিশনারের পদপ্রার্থী হন। তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত না করিয়া অরিগন (Oregon) রাজ্যের গবর্ণরের পদ দেওয়া হয়। কিন্তু আব্রাহাম্ এই পদ ত্যাগ করেন। যাহা হউক, ইলিনয় পরিষদে দীর্ঘ আট বৎসর অভিজ্ঞতা লাভের ফলে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিল। এমন সময়ে ডগ্‌লাসের সহিত বিতর্কে নিজ প্রতিভার পরিচয় দান করিয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে তিনি রিপাব্‌লিকান দলের প্রার্থী হিসাবে প্রেসিডেণ্ট-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ঐ সময়ে ডেমোক্রেটিক দলে আভ্যন্তরীণ বিভেদের ফলে তাঁহার জয়লাভ সহজ হইয়াছিল। এইভাবে কাঠের কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি নিজ প্রতিভাবলে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট-পদ লাভে সমর্থ হইলেন।

ডগ্‌লাসের সহিত বিতর্ক (১৮৫৮)

প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত (১৮৬১)

তাঁহার উদ্দেশ্য ও নীতি (His aims and policy):

(১) আব্রাহাম্ লিঙ্কন ক্রীতদাস-প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলি তাহাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে দাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধনই প্রয়োজন মনে করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন উদার মনোবৃত্তির দিক হইতেও উত্তরাঞ্চলের দেশগুলি দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলি অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। সুতরাং উত্তরাঞ্চলে দাস-প্রথার উচ্ছেদ যখন নীতিগতভাবে এবং প্রকৃতক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল, ঐ সময়ে দক্ষিণের রাজ্যগুলি কৃষির সুবিধার জন্য দাস-ব্যবসায় চালাইতেছিল। আব্রাহাম্ লিঙ্কন আমেরিকার একাংশের দাস-প্রথার উচ্ছেদ হইবে ও অপরাংশে উহা চালু থাকিবে এই অযৌক্তিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রেসিডেন্ট-পদ লাভের পূর্বেই তাঁহার দাস-প্রথার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব সম্পর্কে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলির অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণের রাজ্যগুলির মধ্যে দাস-প্রথা উচ্ছেদের আশঙ্কা জন্মিল। (২) আবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করা আব্রাহাম্ লিঙ্কন একটি পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-স্থাপনের প্রথম হইতেই উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে মতভেদ ছিল। ১৮ ২ খ্রীষ্টাব্দে শুল্কস্থাপন ব্যাপারে দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি পৃথক একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিল। প্রজাতান্ত্রিক দলের নেতা আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হইলে গণতান্ত্রিক মতাবলম্বী দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি স্বভাবতই সন্তুষ্ট হইল না। কিন্তু আব্রাহাম্ লিঙ্কন মার্কিন ইউনিয়ন (Union) রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এইজন্য তিনি প্রয়োজন হইলে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না।

(১) ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধন

(২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা

লিঙ্কন ও অন্তর্যুদ্ধ (Lincoln and the Civil War): ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সাউথ কেরোলিনার নেতৃত্বে দক্ষিণাঞ্চলের জর্জিয়া, টেক্সাস্, ফ্লোরিডা, লুসিয়ানা, আলাবামা ও মিসিসিপি—এই ছয়টি রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (Union) ত্যাগ করিয়া একটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিলে লিঙ্কন সামরিক সাহায্যে ঐ সকল রাজ্যকে পরাজিত করিয়া পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনিলেন। এই অন্তর্যুদ্ধের সময়েই তিনি এক ঘোষণা দ্বারা দাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন। (অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশদ আলোচনা নিম্নে দ্রষ্টব্য)

উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্যুদ্ধ: দক্ষিণাঞ্চলের পরাজয়

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণের রাজ্যগুলি পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলে উহার পাঁচদিন পর এক প্রেক্ষাগৃহে জন উল্‌কিস্ বুথ্ (John Wilkes Booth) নামে একজন অভিনেতার গুলিতে আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রাণ হারাইলেন (১৪ই এপ্রিল, ১৮৬৫)।

লিঙ্কনের মৃত্যু (১৮৬৫)

লিঙ্কনের কৃতিত্ব (Estimate of Lincoln)ঃ সামান্য কুটিরবাসী আব্রাহাম্ লিঙ্কনের মার্কিন রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট-পদ লাভ গণতান্ত্রিক ব্যক্তি-সাম্যের চরম নিদর্শন সন্দেহ নাই। অধ্যবসায়, একনিষ্ঠ দেশপ্রেম ও জনকল্যাণ সাধনের ইচ্ছা তাঁহাকে কুটির হইতে 'হোয়াইট হাউস' (White House)-এ উন্নীত করিয়াছিল। দৈহিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী আব্রাহাম্ লিঙ্কন যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেন তাহার প্রতি চরম বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতেন এবং যাহা ন্যায় ও সততার উপর নির্ভরশীল উহার রক্ষার জন্য যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি ছিলেন দয়াপ্রবণ, অকুতোভয়-চিত্ত সরলপ্রাণ মহৎ ব্যক্তি।

চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

প্রেসিডেণ্ট-পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সেই সুযোগে স্বৈরাচারী হইয়া উঠেন নাই। ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তিনি মানুষমাত্রেরই স্বাধীনভাবে জীবন যাপনের অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। মানবতার দিক হইতে বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, তিনি মানুষের আদিম এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বার্থলোলুপ মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর পাশবিক নির্যাতনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা করিয়া তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন যেমন আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলেন তেমনি আমেরিকার ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আব্রাহাম্ লিঙ্কন আমেরিকার ঐক্য রক্ষা করিয়া সেই স্বাধীনতাকে সার্থক করিয়া তুলিবার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা

আব্রাহাম্ লিঙ্কনের রাজনৈতিক ভাবধারা সমসাময়িক রাজনীতিকে

প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি গণতন্ত্রকে 'Government of the people, by the people and for the people' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। গণতন্ত্রের ইতিহাসে আব্রাহাম্ লিঙ্কনের জীবনী এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়া আছে।

গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস-প্রথার অবসান (Abolition of Slavery in the U. S. A.): ষোড়শ শতাব্দীতে জনৈক ওলন্দাজ বণিক মাত্র কুড়িজন আফ্রিকাবাসীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আমেরিকার জেমস্ টাউনে বিক্রয় করে। ঐ সময় হইতে ইওরোপীয় বণিকদের অর্থগৃধ্নুতার ফলে অসংখ্য ক্রীতদাস আমেরিকায় আমদানি করা হয়। নূতন উপনিবেশ বিস্তারের যাবতীয় দৈহিক শ্রম অতি সামান্য খরচে ক্রীতদাসদের দ্বারা করান সম্ভব হইত। এইজন্য ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় আমেরিকায় এক অতি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়।

আমেরিকায় ক্রীতদাস-প্রথার সূত্রপাত

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকায় নিগ্রো ক্রীতদাসের সংখ্যা কুড়ি লক্ষেরও অধিক হইয়া দাঁড়ায়। আমেরিকা যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করে তখন একমাত্র ম্যাসাচুসেট্স্ ভিন্ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশেই দাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় 'মানুষ মাত্রেই সমান অধিকার লইয়া জন্মিয়াছে' ("All men were created equal")—এই নীতি প্রচার করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু নিগ্রো ক্রীতদাসদিগের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য ছিল না।

স্বাধীনতা ঘোষণার কালে ম্যাসাচুসেটস্ ভিন্ন আমেরিকার সর্বত্র ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত

চিন্তাশীল, উদারচেতা আমেরিকাবাসীদের অনেকেই অবশ্য ক্রীতদাস-প্রথার অ-নৈতিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাস-প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। এমন কি 'ম্যাসন-ডিক্সন্ লাইন' (Mason-Dixon line)-এর উত্তরস্থ সকল রাষ্ট্রে ক্রীতদাস-প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অহিও নদীর উত্তর এবং এলিগানিজ অঞ্চলের পশ্চিমস্থ দেশগুলিতেও ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ করা হইয়াছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত থাকিলেও সেখানেও উহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। প্রেসিডেন্ট জেফারসন ক্রীতদাসগণকে ক্রমে ক্রমে মুক্তি দিয়া তাহাদের নিজ দেশ আফ্রিকায়

উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ: দক্ষিণাঞ্চলেও বিলুপ্ত-প্রায়

ক্রীতদাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধকরণ (১৮০৮)

ফেরৎ পাঠাইবার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয় নাই। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে আইন করিয়া ক্রীতদাস-ব্যবসা আমেরিকায় নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

এইভাবে ক্রীতদাস-প্রথা যখন ক্রম-বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটে। শিল্প-বিপ্লবে বয়নশিল্পের উন্নতি সাধিত হইলে তুলার চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল ছিল তুলাচাষের উৎকৃষ্ট স্থান। তুলার চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সস্তা শ্রমেরও প্রয়োজন হইল। ফলে, দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি স্বভাবতই ক্রীতদাস-প্রথা লাভজনক মনে করিল। কৃষিপ্রধান দক্ষিণাঞ্চল স্বাধীনতার সময় হইতেই ক্রীতদাস-প্রথা সম্পর্কে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল।*

শিল্প-বিপ্লব : দক্ষিণাঞ্চলের ক্রীতদাস-প্রথার গুরুত্ব বৃদ্ধি

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের নিকট হইতে লুসিয়ানা ক্রয় করিবার পর এই স্থানের একাংশ 'মিসৌরি' (Missouri) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'মিসৌরি মীমাংসা' (Missouri Compromise) নামে এক চুক্তি দ্বারা মিসৌরি রাষ্ট্রকে ক্রীতদাস-প্রথা চালু রাখিবার অধিকার দেওয়া হইল। কিন্তু মিসৌরির দক্ষিণ সীমান্তবর্তী কতকাংশ ক্রীতদাস-প্রথা-মুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইল। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিহেতু ক্রীতদাস-প্রথা সেখানে বদ্ধমূল হইয়া গেল। ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থকদেরও অভাব হইল না। তাহাদের মতে কাল-চামড়া নিগ্রোদের সহিত সাদা-চামড়া ইওরোপীয়দের 'ক্রীতদাস ও প্রভু' এই সম্বন্ধ ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না, নিগ্রোগণ কোন প্রকার শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম এবং শিক্ষা দান করা যদি বা সম্ভব হয় তবে উহার ফল হয় বিষময়, কারণ নিগ্রোরা তাহাতে বিদ্রোহ করিবার সামর্থ্য লাভ করে। এই সকল যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিগ্রোদিগকে পশুর স্তরে রাখিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকে স্বীকার করিত।†

মিসৌরি মীমাংসা (১৮২০)

ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থক দাক্ষিণাঞ্চল

* "America entered into the shadow of the civil war before she had emerged from that of the War of Independence." Quoted by Ketelbey, p. 576.

† ইংরেজী নাট্যকার শেক্‌স্‌পিয়ারের 'Tempest' নাটকে এই মনোবৃত্তির সুন্দর উল্লেখ রহিয়াছে:

কিন্তু আব্রাহাম্ লিঙ্কনের ন্যায় উদারমনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই প্রথার সমর্থন করা দূরের কথা, উহা জঘন্যতম নীচতা বলিয়াই মনে করিতেন। 'দাসত্ব প্রথা' যদি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে কোন কিছুই অন্যায় নহে'—এই কথা আব্রাহাম্ লিঙ্কন বলিতেন।*

আব্রাহাম্ লিঙ্কনের ক্রীতদাস-প্রথার বিরোধিতা

আব্রাহাম লিঙ্কনের মতবাদে প্রভাবিত উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ক্রীতদাস-প্রথার প্রসার বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর ছিল। ইহাদের মধ্যে একদল ছিল উগ্র মতবাদাবলম্বী। এই দল দক্ষিণাঞ্চল হইতেও ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের দাবি করিতেছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ তাহাদের স্বার্থবিরোধী ছিল বলিয়া তাহারা ক্রীতদাস-প্রথা চালু রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার আইন পাস করিয়া দাস-প্রথার বিলোপ সাধন করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি এক শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন উত্থাপন করিল। তাহারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কতকগুলি সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের সংঘ বলিয়া বর্ণনা করিল এবং যেহেতু উহা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংঘ সেজন্য ইচ্ছামত যে-কোন রাষ্ট্র এই সংঘ হইতে চলিয়া যাইতে পারে এই যুক্তি দেখাইল। মেক্সিকো হইতে বিজিত অংশে দাস-প্রথা প্রবর্তন এবং কেলিফোর্ণিয়া রাষ্ট্র দাস-প্রথার সমর্থক অথবা দাস-প্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে—এই দুই প্রশ্ন লইয়া উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হইল। দক্ষিণাঞ্চল হইতে পলাতক ক্রীতদাসগণ উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে আশ্রয় লইত। এই বিষয় লইয়াও বিবাদ লাগিয়া থাকিত। অবশেষে হেন্‌রী ক্লে (Henry Cley) নামে একজন নেতার

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিভেদ

ক্লে-মীমাংসা (১৮৫০)

"Prospero: Abhorred slave,
Which any print of goodness wilt-not take,
Being capable of all ill! * * *
Caliban: You taught me language; and my profit on't
Is, I know how to curse. The red plague rid you
For learning me your language!" *The Tempest,*
Act I (ii)

* "If slavery is not wrong, then nothing is wrong." *Abraham Lincoln.* Vide, Ketelbey, p. 578.

চেষ্টায় এই বিরোধের মীমাংসা হইল। এই মীমাংসা অনুসারে কেলিফোর্ণিয়া দাস-প্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচিত হইল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হইল যে, কেন্দ্রীয় সরকার পলাতক ক্রীতদাসদিগকে পুনরায় নিজ রাষ্ট্রে ফিরাইয়া দিবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন (Fugitive Slave Act) পাস করিবেন।

Uncle Tom's Cabin

ক্লে-মীমাংসা (Clay Compromise)-এর পর সাময়িকভাবে ক্রীতদাস-প্রথা-সংক্রান্ত বিরোধের শান্তি হইল। কিন্তু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হেরিয়েট বীচার স্টো (Harriet Beecher Stowe) 'আঙ্ক্‌ল টমস্ ক্যাবিন' (*Uncle Tom*'s *Cabin*) নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিলে দাসত্ব-প্রথা-সংক্রান্ত বিরোধ পুনরায় দেখা দিল। এই পুস্তকে ক্রীতদাসদের চরম দুর্দশার একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কান্‌সাস্ নেব্রাস্কা (Kansas Nebraska)

কান্‌সাস্ নেব্রাস্কা-আইন (১৮৫৪) : দাস-প্রথার সমর্থন

আইন পাস করিয়া কান্‌সাস্ অঞ্চলে ক্রীতদাস-প্রথা-প্রবর্তন আইনসিদ্ধ করা হইল। ইহা ভিন্ন এই আইন পাস করিবার ফলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মিসৌরি মীমাংসাও বাতিল হইয়া গেল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেড্-স্কট্ (Dred-Scot) বিচারে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট 'মিসৌরি মীমাংসা'

ড্রেড্-স্কট বিচার : দাস-প্রথা স্বীকৃত

অবৈধ ঘোষণা করিলেন এবং কোন আইন পাস করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ফলে, ক্রীতদাস-প্রথা হ্রাসপ্রাপ্ত বা সীমাবদ্ধ না হইয়া বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ পাইল। এই

নূতন রিপাব্‌লিকান দলের সৃষ্টি

সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক নূতন প্রজাতান্ত্রিক (Re-publican) দলের সৃষ্টি হইল। এই দলের মূলনীতি ছিল ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংহতিসম্পন্ন করা। এই নূতন প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন আব্রাহাম্ লিঙ্কন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলে স্বভাবতই দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্থাপনের আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিল। এই সূত্রে

অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সামরিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্কন ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা দ্বারা বিদ্রোহী রাষ্ট্রগুলিতে দাস-প্রথা উচ্ছেদ করা হইল। ইহার পর দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ক্রীতদাসগণকে সুযোগ পাইলেই ধরিয়া আনিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে স্বাধীন ব্যক্তি হিসাবে ভর্তি করা হইতে লাগিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাঞ্চলের পরাজয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের পুনর্ভুক্তির সময়ে দাস-প্রথারও উচ্ছেদ সম্পন্ন হইয়াছিল। আব্রাহাম্ লিঙ্কনের দাস-প্রথা উচ্ছেদের ঘোষণা ইওরোপীয় উদারনৈতিক দেশগুলিরও সমর্থন লাভ করিয়াছিল।

আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রেসিডেন্ট-পদ লাভ : অন্তর্যুদ্ধ : দাস-প্রথার উচ্ছেদ (১৮৬৩)

অন্তর্যুদ্ধের অবসানে নিগ্রোদের মার্কিন রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার দেওয়া হইল বটে কিন্তু তখনও দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে নিগ্রোদিগকে পদানত করিবার গোপন চেষ্টা চলিল। দক্ষিণাঞ্চলের আমেরিকা-বাসী শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ 'কু-ক্লাক্স্-ক্ল্যান' (Ku-Klux-Klan), 'হোয়াইট্ ব্রাদারহুড' (White Brother-hood), 'পেল ফেসেস' (Pale Faces) নামে বিভিন্ন গোপন সমিতি স্থাপন করিয়া নিগ্রো-নির্যাতন শুরু করিল। মার্কিন সরকার এবং সুপ্রীম কোর্ট যদিও শ্বেতকায় ঔপনিবেশিক ও কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন তথাপি আমেরিকার কোন কোন স্থানে এখনও কালো চামড়ার প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শনের মনোভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

'কু-ক্লাক্স্-ক্ল্যান', 'হোয়াইট্ ব্রাদার-হুড্', 'পেল ফেসেস'

মার্কিন অন্তর্যুদ্ধ, ১৮৬১—'৬৫ (American Civil War):
কারণ: আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের বীজ এই দুই অঞ্চলের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যেই নিহিত ছিল। 'স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় হইতেই আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল'—এই উক্তির সত্যতা উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে খুঁজিতে হইবে।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের বীজ

(১) উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ছিল শিল্প-প্রধান। শিল্পোৎপাদন, ব্যবসায়-

বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়, বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করিয়া উত্তরাঞ্চলের অর্থনীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অপর পক্ষে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ছিল কৃষিপ্রধান। তুলার চাষ-ই ছিল দক্ষিণাঞ্চলের সম্পদের প্রধান উৎস। এই অর্থনৈতিক পার্থক্য-ই ছিল এই দুই অঞ্চলের পরস্পর বিভেদের মূল কারণ। পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে পশুপালন ও কৃষিকার্য ছিল প্রধান উপজীবিকা। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি উত্তরাঞ্চল হইতে প্রস্তুত সামগ্রী এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে পশু প্রভৃতি আমদানি করিত। উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণ শুল্ক (Protective tariff) স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। অপর পক্ষে উত্তরাঞ্চলের উপর শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য নির্ভরশীল দক্ষিণাঞ্চল শুল্কস্থাপনের ফলে বেশি দামে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বাধ্য হইত। স্বভাবতই এই বিষয় লইয়া উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইত।

(১) অর্থনৈতিক বৈষম্য

(২) ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে খুব উচ্চ হারে শিল্প-সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপিত হইলে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি তীব্র প্রতিবাদ করে। সাউথ কেরোলিনাবাসী ভাইস-প্রেসিডেণ্ট জন্ ক্যাল্হন্ এই বিষয় লইযা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি ঐ সময়ে এক শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন উত্থাপন করিল। তাহাদের মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল কতকগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংঘবিশেষ এবং এই কারণে শুল্ক-সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিয়া কোন কোন রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার বহির্ভূত। ইহা ভিন্ন আয়ের জন্য কর স্থাপন করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিলেও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য লইয়া করস্থাপন ঐ অধিকারের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এ বিষয় লইয়া সাউথ কেরোলিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলে প্রেসিডেণ্ট জ্যাক্সন্ সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যুদ্ধ ঘটিল না। হেন্‌রী ক্লে (Henry Clay)-এর চেষ্টায় একটি পরিবর্তিত শুল্কনীতি গৃহীত হইল। ঐ সময়েই প্রেসিডেণ্ট এনড্রু জ্যাক্সন্ দক্ষিণাঞ্চলের যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের ইচ্ছার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন: "শুল্কের প্রশ্ন একটি অজুহাত মাত্র।

(২) শুল্ক-সংক্রান্ত বিরোধ

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সাউথ কেরোলিনার যুক্তরাষ্ট্র-ত্যাগের চেষ্টা

পরবর্তী অজুহাত নিগ্রো বা ক্রীতদাস-প্রথা হইতে উদ্ভূত হইবে।"* জ্যাক্‌সনের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল।

(৩) দাস-প্রথা-সংক্রান্ত বিরোধ: উত্তরাঞ্চল দাস-প্রথার অবসানের পক্ষপাতী, দক্ষিণাঞ্চল উহা রক্ষা করার পক্ষপাতী

(৩) স্বাধীনতা ঘোষণার সময় একমাত্র ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাষ্ট্র ভিন্ন আমেরিকার অপরাপর সকল রাষ্ট্রেই ক্রীতদাস-প্রথা প্রচলিত ছিল। শিল্পপ্রধান উত্তরাঞ্চলে ক্রীতদাসের প্রয়োজন তেমন না থাকায় ক্রমে সেই অঞ্চল হইতে ক্রীতদাস-প্রথার অবসান ঘটে। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও ক্রীতদাস-প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস-ব্যবসায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতেও ক্রীতদাস-প্রথা ক্রমেই বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের ফলে বিশেষভাবে হুইট্‌নি কর্তৃক 'কটন জিন' আবিষ্কৃত হইলে তুলার চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি তুলার চাষ করিত। এইজন্য ক্রীতদাসের সস্তা শ্রম চাষের পক্ষে স্বভাবতই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং দক্ষিণাঞ্চলে ক্রীতদাস-প্রথা আবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই ব্যাপারে ক্রীতদাস-প্রথা-বিরোধী উত্তরাঞ্চল এবং ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থক দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হইল। এই বিবাদের ফলে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে 'মিসৌরি মীমাংসা' দ্বারা মিসৌরিকে ক্রীতদাস-প্রথার সমর্থক দেশ হিসাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রহণ করিতে হইল। ইহা দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিরই জয়লাভের সামিল হইল। উত্তরাঞ্চল ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ করা দূরের কথা, উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে অক্ষম হইয়া ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্র-গুলির বিরোধিতা আরও বৃদ্ধি পাইল। ফলে, কোন নূতন রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের আবেদন করিলেই দক্ষিণাঞ্চল উহাকে দাস-প্রথা-সমর্থক (Slave State) রাষ্ট্র হিসাবে গ্রহণের জন্য দাবি করিত; অপরপক্ষে উত্তরাঞ্চল উহাকে দাস-প্রথা-মুক্ত (Free State) হিসাবে গ্রহণের চেষ্টা করিত। কেলিফোর্ণিয়ার ক্ষেত্রেও এইরূপ এক তীব্র বিবাদের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত হেন্‌রী ক্লে (Henry Clay)-এর চেষ্টায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কেলিফোর্ণিয়াকে দাস-প্রথা-মুক্ত অঞ্চল

কেলিফোর্ণিয়া-সংক্রান্ত বিরোধ: সাময়িক মীমাংসা

* "The tariff was a mere pretext.........The next pretext will be the negro or slavery."—*Andrew Jackson.* Vide, Ketelbey.

হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে সম্মুখীন সমস্যার মীমাংসা সম্ভব হইলেও উহার স্থায়ী মীমাংসা সম্ভব হইল না। এই সকল কারণে কেন্দ্রীয় সরকার পলাতক ক্রীতদাসগণকে নিজ নিজ রাজ্যে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত আইন-প্রণয়নে রাজী হইলেন।

(৪) ক্রীতদাস-প্রথার সহিত গভীর রাজনৈতিক প্রশ্নও জড়িত ছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি উত্তরাঞ্চলের প্রাধান্য সহ্য করিতে পারিত না। নূতন উপনিবেশ উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ন্যায় দাস-প্রথা-মুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইবে এই কারণেও ক্রীতদাস-প্রথা অবসানের প্রশ্ন জটিলতর হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের এক নূতন ব্যাখ্যা উত্থাপন করিল। সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে যে-কোন রাষ্ট্র ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে এই দাবি তাহারা করিল। এ বিষয় লইয়াও যুক্তরাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমর্থকদের ও যুক্তরাষ্ট্র-ত্যাগের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইল।

(৪) ক্রীতদাস-প্রথার অন্তরালে রাজনৈতিক কারণ

ইচ্ছামত যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের দাবি

(৫) কেলিফোর্ণিয়া-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসার পর অল্পকাল শান্তিতে কাটিলেও হেরিয়েট বীচার স্টো নামে জনৈক মহিলা Uncle Tom's Cabin নামক একখানি পুস্তকে নিগ্রো ক্রীতদাসদের দুর্দশার বর্ণনা প্রকাশ করিলে ক্রীতদাস-প্রথার অবসানের আন্দোলন পুনরায় তীব্র আকার ধারণ করিল। এমন সময় কান্‌সাস্ নেব্রাস্কা আইন পাসের দ্বারা এই দুই স্থানে ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ করা বা প্রচলিত রাখা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অধিবাসী-দিগকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেড্-স্কট্ বিচারে সুপ্রীম কোর্ট ক্রীতদাসকে অস্থাবর সম্পত্তি বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং সেইহেতু ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ-সংক্রান্ত আইন মাত্রেই অবৈধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন। ইহার ফলে উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বভাবতই এক দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি হইল। তাহারা দাস-প্রথা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে দেখিয়া অধিকতর তৎপর হইয়া উঠিল। এক নূতন রিপাব্‌লিকান দল গঠন করিয়া ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদের আন্দোলন

(৫) Uncle Tom's Cabin-এর প্রকাশ: ক্রীতদাস-প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি

কান্‌সাস নেব্রাস্কা আইন: ড্রেড্-স্কট্ বিচার

নূতন রিপাবলিকান দলের সৃষ্টি

চালান হইল। এই দলের প্রধান নেতাদের অন্যতম ছিলেন আব্রাহাম্ লিঙ্কন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জন ব্রাউন নামে একজন ক্রীতদাস-প্রথা-উচ্ছেদকারী নেতা এক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়া ক্রীতদাসগণের মধ্যে ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহিত করিলেন। বিচারে ব্রাউনের ফাঁসি হইল। ফলে, দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের বিরোধের তীব্রতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল।

জন ব্রাউন কর্তৃক অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

(৬) ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির আশঙ্কা হইল যে, উত্তরাঞ্চলের দাস-প্রথা-উচ্ছেদকারী দল এইবার নিজ ইচ্ছামত সংস্কার সাধন করিয়া দক্ষিণাঞ্চলকে প্রত্যুত্তর দিবে। আব্রাহাম্ লিঙ্কনের দাস-প্রথার প্রতি অপরিসীম ঘৃণার কথাও তাহাদের অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার আমলে কোন প্রকার আপোষ-মীমাংসার আশা নাই মনে করিয়া সাউথ কেরোলিনার নেতৃত্বে আলাবামা, ফ্লোরিডা, মিসিসিপি, লুসিয়ানা, টেক্সাস ও জর্জিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া এক পৃথক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিল। তাহারা সাম্টার দুর্গ (Fort Sumter) আক্রমণ করিলে আব্রাহাম্ লিঙ্কন সৈন্য প্রস্তুতির আদেশ দিলেন। এই সময়ে ভার্জিনিয়া, টেনেসি, নর্থ কেরোলিনা ও আর্কানসাস্ যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মিসৌরি, কেণ্টুকি ও মেরিল্যাণ্ড এই তিনটি রাষ্ট্রের সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া আব্রাহাম লিঙ্কন দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।

(৬) আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচন : দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ইউনিয়ন-ত্যাগ : যুদ্ধের সূচনা

যুদ্ধের গতি : প্রথমে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি জয়লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই লিঙ্কন যুদ্ধের গতি ইউনিয়নের পক্ষে ফিরাইতে সক্ষম হইলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি যে সকল রাষ্ট্র ইউনিয়নের বহির্ভূত থাকিবে সেগুলির ক্রীতদাস মাত্রেই স্বাধীন বলিয়া বিবেচিত হইবে তিনি এই ঘোষণা করিলেন। এইভাবে তিনি বিদ্রোহী রাষ্ট্র-গুলির দুর্বলতার সৃষ্টি করিলেন। লিঙ্কনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করা। সুতরাং ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ তখন সামরিক সুবিধার জন্যই তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন।*

দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্র-সমূহের জয়লাভ

ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ

*"My paramount object in this struggle is to save the Union and is not either to save or destroy slavery. If I could save the Union without freeing any slave I would do it, and if I could save it by freeing all the slaves

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিয়নের সৈন্য নিউ অর্লিয়েন্স দখল করিল। ইহার অব্যবহিত পরেই তাহারা ভিক্‌স্‌বার্গ জয় করিল। এই স্থান জয় করিবার ফলে মিসিসিপি নদীর উপর প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় উহার পশ্চিম অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি অপরাপর বিদ্রোহী রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। দক্ষিণ রাষ্ট্রসমূহের জেনারেল লী (Lee) দক্ষিণ রাষ্ট্রসংঘের রাজধানী রিচমণ্ড রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু পেনসিল্‌ভ্যানিয়া আক্রমণ করিতে গিয়া গেটিস্‌বার্গ (Gettysburg)-এর যুদ্ধে পরাজিত হইলেন (১৮৬৩)। এই যুদ্ধ দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া দিল। এই যুদ্ধে পরাজয়, দীর্ঘকাল যুদ্ধের শ্রান্তি এবং জ্যাকসন্‌ নামক সুদক্ষ জেনারেলের মৃত্যুতে দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলির পরাজয় ঘটিল। ভার্জিনিয়া ও জর্জিয়া সহজেই পদানত হইল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লী'র আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যুদ্ধের অবসান ঘটিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনঃসঞ্জীবিত হইল।

ইউনিয়ন পক্ষের নিউ অর্লিয়েন্স ও ভিক্‌স্‌বার্গ দখল

গেটিস্‌বার্গের যুদ্ধ (১৮৬৩)

লী'র আত্মসমর্পণ : অন্তর্যুদ্ধের অবসান (১৮৬৫)

ফলাফল : মার্কিন অন্তর্যুদ্ধের ফল আমেরিকার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা। (১) এই যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা পাইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুনরুজ্জীবনের ফলে ভবিষ্যৎ ইতিহাসে আমেরিকা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে। (২) এই যুদ্ধে জয়লাভের উদ্দেশ্যেই সামরিক সুযোগ বৃদ্ধির জন্য আব্রাহাম্‌ লিঙ্কন দাস-প্রথার উচ্ছেদ করিয়া ক্রীতদাসগণকে মানুষের আদিম অধিকারে স্থাপন করিয়াছিলেন। (৩) দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের শাসনতান্ত্রিক দাবি চিরতরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বপক্ষে মীমাংসিত হইয়াছিল। ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি, মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। (৪) অন্তর্যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত আমেরিকা মনরো-নীতি অনুসরণ করিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নয়নে ব্যস্ত ছিল, ইহার পর হইতে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমেরিকা অধিকতর শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়সহ অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

(১) যুক্তরাষ্ট্র রক্ষা

(২) ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ

(৩) যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের দাবি চিরতরে বাতিল

I would do it : and if I could save it by freeing some and leaving others alone I would also do that. What I do about slavery and the coloured race, I do because I believe it helps to save the Union, and what I forbear I forbear because I do not believe it would help to save the Union," *Abraham Lincoln to Horace Greeley.* Vide Ketelbey, p. 585.

ট্রেণ্ট্ ও আলাবামা ঘটনা (Trent & Alabama Affairs) : আব্রাহাম্ লিঙ্কন কর্তৃক ক্রীতদাস-প্রথা অবসানের ঘোষণা ইওরোপীয় দেশগুলির বিশেষত ইংলণ্ডের আন্তরিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ইংলণ্ডের শ্রমিকগণ ছিল ক্রীতদাস-প্রথা-বিরোধী উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির সমর্থক, কিন্তু শাসকশ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতি সহানুভূতি ছিল বেশি। ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী আমেরিকা অপেক্ষা বিভক্ত এবং দুর্বল আমেরিকার সৃষ্টি হউক ইহাই ছিল ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর ইচ্ছা। সুতরাং মার্কিন অন্তর্যুদ্ধের সময়ে ট্রেণ্ট ও আলাবামা ঘটনা লইয়া উত্তরাঞ্চলের রাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের মধ্যে মনো-মালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত আপোষ-মীমাংসা সম্ভব হইয়াছিল।

ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক সমর্থিত

ট্রেণ্ট্ (Trent) নামক এক ব্রিটিশ জাহাজে করিয়া দক্ষিণ রাষ্ট্রসংঘের দুইজন দূত ইংলণ্ড গমনকালে উত্তরাঞ্চলের নৌবাহিনীর একজন কর্মচারী ক্যাপ্টেন উইলকিস্ ঐ জাহাজটি তল্লাসী করেন এবং ঐ দুইজন দূতকে ধরিয়া লইয়া যান। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এইরূপ আচরণ মোটেই বৈধ ছিল না। আব্রাহাম্ লিঙ্কন এই দুইজন দূতকে ফিরাইয়া দিয়া এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া এই বিবাদের মীমাংসা করেন।

'ট্রেণ্ট্' ঘটনা

অপর ক্ষেত্রে আলাবামা (Alabama) নামে লিভারপুল নৌ-কারখানায় নির্মিত একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ব্রিটিশ সরকারের গোপন অনুমতি অথবা অসাবধানতাবশত লিভারপুল হইতে দক্ষিণ-আমেরিকায় চলিয়া আসে এবং দক্ষিণ রাষ্ট্রসংঘের অধীনে কার্য গ্রহণ করে। এই জাহাজটি উত্তরাঞ্চলের জাহাজগুলি আক্রমণ করিয়া সেগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই বিষয়ে আমেরিকা ব্রিটিশ সরকারের নিকট অভিযোগ করিলে দীর্ঘকাল বিবাদের পর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভা শহরে এক সালিশী বিচারালয়ে ইহার বিচার হয়। এই বিচারের রায় অনুসারে ব্রিটিশ সরকার আমেরিকাকে ক্ষতিপূরণ দান করেন। গ্ল্যাড্স্টোন ছিলেন তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

'আলাবামা' ঘটনা

মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি (American Foreign Policy) :
১৭৭৬-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ : স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরে মার্কিন

পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদে নির্লিপ্ত থাকা। এই কারণে ফরাসী বিপ্লবীদের প্রতি আমেরিকার চরম সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্যে অগ্রসর হয় নাই। আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায় ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতার ঘোষণায়। এই মূলনীতির সঙ্গে অপর একটি আগ্রহও পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটেন হইতে আমেরিকা স্বাধীন হইয়া গেলেও ব্রিটেনের সহিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্য বজায় রাখিবার ইচ্ছা আমেরিকাবাসীর ছিল। এই কারণেও ফরাসী পক্ষ সমর্থন হইতে আমেরিকা বিরত ছিল, এমন কি ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া ফরাসী দূত সিটিজেন জেনেটকে অপসারণের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই ফরাসী দূত আমেরিকা হইতে ব্রিটিশ-বিরোধী কার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এইভাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক কতকটা তিক্ত হইয়া উঠিল। ব্রিটেন আমেরিকাকে নিজপক্ষে যুদ্ধে যোগদানে রাজী করাইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার উপর চাপ দিতে লাগিল। এমন কি ব্রিটিশ জাহাজ কর্তৃক মার্কিন জাহাজগুলি তল্লাসী, মার্কিন জাহাজ যুদ্ধ-সরঞ্জাম পরিবহণ করিতেছে এই অজুহাতে বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি নানাপ্রকার আক্রমণাত্মক কার্য ব্রিটিশ সরকার শুরু করিলে আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার ব্যাপক দাবি উত্থিত হয়। জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ হইতে বিরত থাকা আমেরিকার স্বার্থের দিক হইতে একান্ত প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া নিরপেক্ষতা নীতি অবশ্য ত্যাগ করিলেন না। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের সহিত ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধের মিটমাট হয়। এই চুক্তি প্রধান বিচারপতির নামানুসারে জে-চুক্তি (Jay Agreement) নামে পরিচিত।

আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদে নিরপেক্ষতা এবং ইংলণ্ডের সহিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের নীতি

ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে মার্কিন নিরপেক্ষতা

ইংলণ্ড-আমেরিকার মনোমালিন্য

জে-চুক্তি

ফ্রান্স জে-চুক্তি ফরাসী-বিরোধী কার্য বলিয়া বিবেচনা করিল এবং স্বাধীনতা-যুদ্ধের কালে প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করিতে এবং ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্কিন-ফরাসী

চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধের সময় পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য-দানের শর্তানুযায়ী আমেরিকাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাপ দিল। ঐ সময়ে জন এ্যাডামস্ প্রেসিডেন্ট-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মার্কিন সরকার স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকার অপর কোন শক্তির নিকট ত্যাগ করিবেন না—এই ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেরও প্রস্তুতি চলিল। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ও ফ্রান্সের নৌবাহিনীর মধ্যে ইতস্তত সংঘর্ষও ঘটিল। কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধ সৃষ্টি হইবার পূর্বেই ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সহিত মার্কিন সরকারের মিটমাটের চুক্তির পর আমেরিকা পুনরায় নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিল।

আমেরিকা ও ফ্রান্সের বিরোধ

নেপোলিয়নের সহিত মিটমাটের চুক্তি: মার্কিন সরকারের নিরপেক্ষতা নীতি পুনঃ-অবলম্বন

উনবিংশ শতাব্দী: উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে (১৮০১) জেফারসন্ ও ডিমোক্রেটিক দলের ক্ষমতালাভ মার্কিন রাজনীতিতে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র নীতিতে এই নূতন সরকারের নূতন নীতি শীঘ্রই পরিলক্ষিত হইল।

পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

জেফারসন্ প্রেসিডেন্ট-পদে অভিষিক্ত হওয়ার কালে ঘোষণা করিলেন যে, পররাষ্ট্রক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সততার ভিত্তিতে সকল রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করিয়া চলিবে; কিন্তু কোন রাষ্ট্রের সহিতেই জটিলতাপূর্ণ চুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর হইবে না। এই দুই মূল নীতির ভিত্তিতে পররাষ্ট্র-নীতি পরিচালনা করিলেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-নীতি স্বাধীন চেতনা এবং আত্মপ্রত্যয়ের পরিচায়ক ছিল। ১৮০১-৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজগুলিকে জলদস্যুদের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা ট্রিপোলি (Tripoli)-এর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছিল। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়নের নিকট হইতে সামান্য দেড় কোটি ডলার

নূতন নীতি:
(১) সকলের সহিত মিত্রতা,
(২) কাহারো সহিত কোন জটিল চুক্তিতে অগ্রসর না হওয়া

মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতিতে অধিকতর আত্মপ্রত্যয়

মূল্যে লুসিয়ানা নামক বিরাট ভূখণ্ড মার্কিন সরকার ক্রয় করেন। এই বিশাল ভূখণ্ডকে বিভক্ত করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছয়টি রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ক্রমবর্ধমান শক্তি, সামর্থ্য ও মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য নীতির পরিচয় আমরা দেখিতে পাই ইঙ্গ-মার্কিন বিবাদে।

(ক) ট্রিপোলির সহিত যুদ্ধ,
(খ) ফ্রান্স হইতে লুসিয়ানা ক্রয়

ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে নিরপেক্ষ দেশ আমেরিকার সমুদ্রবাহী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করিয়া তাহা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন বাণিজ্য-জাহাজের ক্ষতিসাধন করিতে লাগিল। ব্রিটিশ জাহাজ কর্তৃক আমেরিকার জাহাজ তল্লাসী প্রভৃতি বিরক্তিকর নীতি গ্রহণ করিলে ক্রমেই ইঙ্গ-মার্কিন মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রিটিশ জাহাজ হইতে নাবিকের কাজ ত্যাগ করিয়া যে সকল লোক মার্কিন জাহাজে নাবিকের কাজ গ্রহণ করিত ইংরেজগণ তাহাদিগকে বলপূর্বক মার্কিন জাহাজ হইতে ধরিয়া লইয়া যাইত। ফলে, ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকায় এক দারুণ বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল। জেফারসন্ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। তথাপি তিনি ব্রিটিশ জাহাজ কোন মার্কিন বন্দর প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন জাহাজের বিদেশী কোন বন্দরে যাওয়া বন্ধ করা হইল। কিন্তু এই আদেশ প্রকৃত ক্ষেত্রে কার্যকরী করা সম্ভব না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হইল। পরবর্তী প্রেসিডেণ্ট ম্যাডিসন্ জনমতের চাপে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন (১৮১২)। এই যুদ্ধ ঘোষণার পশ্চাতে কেবলমাত্র মার্কিন সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রশ্নই জড়িত ছিল না। ইহার অপর উদ্দেশ্য ছিল এই সুযোগে কানাডা জয় করা। কিন্তু ব্রিটিশ সহায়তা ভিন্নই কানাডা আত্মরক্ষায় সক্ষম হইল। অপর দিকে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথমে মার্কিন নৌবাহিনী জয়ী হইলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ নৌ-বহরের সংখ্যাধিক্যের জোরে মার্কিন নৌবাহিনী পরাজিত হইল। ইহার পর পেনিন্সুলার যুদ্ধ অবসানের পর ব্রিটেন মার্কিন রাজধানী ওয়াশিংটন

(গ) ফরাসী বিপ্লবের যুদ্ধে আমেরিকার নিরপেক্ষতা ঘোষণা

ব্রিটিশ-মার্কিন মনোমালিন্য

(ঘ) ব্রিটিশ-মার্কিন যুদ্ধ (১৮১২-১৪)

শহর আক্রমণ করিয়া 'হোয়াইট হাউস' (White House) ভস্মীভূত করিল। কিন্তু নিউ অর্লিয়েন্স আক্রমণ করিতে আসিয়া অপর এক বৃটিশ বাহিনী আমেরিকার হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইয়া আমেরিকার সহিত ঘেণ্ট্ (Ghent)-এর শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য হইল।

ঘেণ্ট্-এর শান্তি-চুক্তি

১৮১২ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ আমেরিকার স্বাধীনতার দ্বিতীয় যুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই যুদ্ধে মার্কিন জাতির মধ্যে যে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা জাতির মধ্যে একতার ভাব বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই নূতন জাতীয় চেতনা আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতিতে শীঘ্রই প্রকাশ পাইল। ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা উত্তরোত্তর দৃঢ়তর পররাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন করিয়া চলিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার সহিত আমেরিকার বাণিজ্য বিষয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে আমেরিকা কানাডার মাতৃদেশ ইংলণ্ডের সহিত এ বিষয় সম্পর্কে মীমাংসার ব্যাপারে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া নিজ দাবি আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময় হইতেই আমেরিকা ইওরোপীয় দেশগুলির সহিত বিশেষত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত পূর্বেকার অনুসৃত নমনীয় নীতি ত্যাগ করিয়া নিজ স্বার্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দৃঢ় এবং জাতীয় নীতি গ্রহণ করিল।

ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধের ফলে মার্কিন জাতীয়তাবোধ ও ঐক্যবৃদ্ধি : দৃঢ়তর পররাষ্ট্র-নীতি অবলম্বন

কানাডার সহিত বাণিজ্য-সমস্যার মীমাংসা

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকাস্থ স্পেনীয় উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে কন্সার্ট-অব-ইওরোপ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে প্রেসিডেণ্ট মন্‌রো তাঁহার বিখ্যাত 'মন্‌রো-নীতি' ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণার দ্বারা আমেরিকা মহাদেশ ইওরোপীয় দেশগুলির উপনিবেশ বিস্তারের স্থল নহে বলা হইল এবং কোন ইওরোপীয় দেশ আমেরিকাস্থ কোন স্থানে হস্তক্ষেপ করিলে আমেরিকা উহা বিপজ্জনক এবং মিত্রতা-বিরোধী কার্য বলিয়া বিবেচনা করিবে এই কথাও স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল। মন্‌রো-নীতির ঘোষণার মধ্যে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে আমেরিকার রাজনীতি ভিন্ন প্রকৃতির এই কথা স্পষ্ট হইল। ইহা ভিন্ন ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা-ই মার্কিন স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন এবং 'আমেরিকা মহাদেশ আমেরিকাবাসীর জন্য'—ইহাও মন্‌রো-নীতি হইতে প্রকাশ পাইল। এই সময়

মন্‌রো-নীতি : আমেরিকার ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে অপসরণ

হইতেই সমগ্র আমেরিকাবাসীকে এক বৃহত্তর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ইওরোপীয় কন্সার্টের প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব হইতে মার্কিন গণতন্ত্রকে রক্ষা করা আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র হইয়া দাঁড়াইল। এই নীতিকে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা অন্তর্মুখী নীতি গ্রহণ করিল এবং সাময়িকভাবে ইওরোপীয় রাজনীতির সহিত যোগাযোগ ছিন্ন করিল।

ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও নিজ আওতার মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তৃতি

ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি আমেরিকা অর্ধ-শতাব্দীরও অধিক কাল অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে আমেরিকা নিজ আওতার অন্তর্বর্তী স্থানসমূহ দখল করিতে ব্যস্ত ছিল। ইওরোপীয় রাজনীতির জটিলতা নেপোলিয়নের যুদ্ধের কালে আমেরিকা উপলব্ধি করিয়াছিল। সুতরাং আভ্যন্তরীণ উন্নয়নকল্পে ইওরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা যেমন প্রয়োজন ছিল, নিজ আওতার অন্তর্বর্তী স্থানসমূহ দখলের জন্যও এই বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি সমভাবে প্রয়োজনীয় ছিল।

অন্তর্যুদ্ধের পর হইতে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি:

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অন্তর্যুদ্ধের অবসানে ঐক্যবদ্ধ আমেরিকা অভূতপূর্ব শক্তি ও মর্যাদা সহকারে নিজ নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। অন্তর্যুদ্ধের কালে ফরাসী সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার আর্ক ডিউক ম্যাক্সিমিলিয়ানকে মেক্সিকোর সিংহাসনে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে এক সামরিক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(১) মেক্সিকো হইতে ফরাসী সৈন্যের অপসারণ—মন্‌রো-নীতি প্রয়োগ

সাময়িকভাবে ম্যাক্সিমিলিয়ান মেক্সিকোর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু অন্তর্যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্র আমেরিকা মন্‌রো-নীতি অনুসরণ করিয়া নেপোলিয়নকে মেক্সিকো হইতে সৈন্য অপসারণে বাধ্য করিল। ম্যাক্সি-মিলিয়ান মেক্সিকো ত্যাগে বিলম্ব করিয়া মেক্সিকোর সন্ত্রাসবাদীদের হস্তে প্রাণ হারাইলেন।

(২) 'আলাবামা' ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়, আলাস্কা দখল (১৮৬৭)

মার্কিন অন্তর্যুদ্ধের সময়ে 'আলাবামা' সংক্রান্ত ঘটনার জন্য (২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আমেরিকা ইংলণ্ড হইতে দীর্ঘকাল যুঝিয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা রাশিয়ার নিকট হইতে আলাস্কা (Alasaka) ক্রয় করিয়াছিল।

প্রেসিডেন্ট ক্লীভ্‌ল্যাণ্ডের আমলে (১৮৮৯-৯৭) মন্‌রো-নীতির প্রয়োগ ক্যারিবিয়ান সাগর তীর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইল। ভেনিজুয়েলা ও ব্রিটেনের মধ্যে সীমারেখা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইলে আমেরিকা, আমেরিকা মহাদেশের প্রধান এবং সার্বভৌম শক্তি হিসাবে এই বিবাদের মধ্যস্থতা করিতে চাহিল। ব্রিটিশ সরকার প্রথমে এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় ক্লীভ্‌ল্যাণ্ড ঘোষণা করিলেন যে, তিনি এই বিষয়ে মধ্যস্থতার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করিবেন এবং উহার সিদ্ধান্ত বলপূর্বক ব্রিটেন ও ভেনিজুয়েলার উপর কার্যকরী করিবেন। ব্রিটেন পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া আমেরিকার মধ্যস্থতা গ্রহণে স্বীকৃত হইল। এইভাবে ক্রমেই মন্‌রো-নীতির সম্প্রসারণ ঘটিতে লাগিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-আমেরিকারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিল।

(৩) মন্‌রো-নীতির সম্প্রসারণ : ব্রিটেন ও ভেনিজুয়েলার বিবাদে আমেরিকার মধ্যস্থতা

স্পেনীয় উপনিবেশ কিউবাতে (Cuba) বিদ্রোহ দেখা দিলে স্পেনীয় সরকার সেই বিদ্রোহ দমনে বর্বরোচিত দমন নীতি অবলম্বন করিলেন। ফলে, আমেরিকাবাসীদের মধ্যে স্পেনের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণার উদ্রেক হইল। কিউবার বিদ্রোহ দমনে স্পেনীয় সরকারের অক্ষমতার ফলে তথাকার ব্যবসায়-বাণিজ্য বিনাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। আমেরিকার বহু মূলধনী কিউবাতে শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের স্বার্থরক্ষার্থ আমেরিকা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিল। প্রত্যুত্তরে স্পেনীয়গণ হাভানা বন্দরে একটি মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংস করিলে আমেরিকায় স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এক শক্তিশালী জনমতের সৃষ্টি হইল। আমেরিকা স্পেনকে কিউবার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে জানাইল। স্পেন ইহার উত্তরে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্পেন ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের শান্তি-চুক্তি (Pact of Paris) দ্বারা পোর্টোরিকো (Porto Rico), গুয়াম (Guam), ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (Philippine Islands), হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ (Hawaian Islands) প্রভৃতি স্থানে আমেরিকাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিউবা মার্কিন সরকারের রক্ষণাধীনে স্বাধীনতা লাভ করিল। এই সকল স্থান অধিকার করিবার ফলে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও সুদূর-

কিউবার বিদ্রোহ : আমেরিকা ও স্পেনের যুদ্ধ

(৪) প্যারিসের শান্তি-চুক্তি (১৮৯৮) : মার্কিন অধিকার বৃদ্ধি

প্রাচ্যে আমেরিকার ক্ষমতা ও আধিপত্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। এই সময় হইতেই আমেরিকা এক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হইল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে বিস্তার নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। এই সূত্রে জাপান ও চীনদেশের সহিত আমেরিকা বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হইতে থাকে।

(৫) প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে মার্কিন অগ্রগতি: মার্কিন-জাপানী চুক্তি (১৮৫৪), প্যারিসের শান্তি-চুক্তি (১৮৯৮) স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের একাংশ দখল (১৮৯৯) —মনরো নীতি পরিত্যক্ত

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কমডোর পেরি ভীতি প্রদর্শন করিয়া জাপানী সরকারকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এক চুক্তি দ্বারা দুইটি বন্দর মার্কিন জাহাজের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে বাধ্য করেন। প্যারিসের শান্তি-চুক্তি দ্বারা আমেরিকা প্রশান্ত মহাসগর অঞ্চলে অধিকতর ক্ষমতা বিস্তারে সক্ষম হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ও ব্রিটেনের সহিত চুক্তি দ্বারা স্যামোয়ান দ্বীপপুঞ্জের (Samoan Islands) একাংশ দখল করে। এইভাবে রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা ক্রমে অধিকতর সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠিল। মনোবৃত্তির এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনরো-নীতিও পরিত্যক্ত হইল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা মনরো-নীতি-প্রসূত স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ পূর্বক সুদূর-প্রাচ্য ও ক্রমে ইওরোপীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিল।

বিংশ শতাব্দী: ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হইয়াছিল। ইওরোপীয় দেশগুলির ক্ষেত্রে মনরো-নীতির প্রয়োগ করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমেরিকা মনরো-নীতি পরিত্যাগে কুণ্ঠিত হইল না। সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্য-স্বার্থ রক্ষার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকা ক্রমেই অধিকতর দৃঢ়তা সহকারে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে থিয়োডোর রুজভেল্ট্ প্রেসিডেণ্ট-পদে নির্বাচিত হইলে আমেরিকা এই সাম্রাজ্যবাদী নীতি আমেরিকা, এশিয়া ও ইওরোপ—এই তিন মহাদেশেই সম-পরিমাণ উৎসাহের সহিত অনুসরণ করিতে লাগিল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে দৃঢ়তর মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি

আমেরিকা, এশিয়া ও ইওরোপে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ

(১) কানাডা-আলাস্কার সীমা-সংক্রান্ত সমস্যা

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে কানাডা এবং আলাস্কার সীমারেখা-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বে থিয়োডোর রুজভেল্টের দৃঢ়তার জন্যই কানাডা আলাস্কার যাবতীয় দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

জাপানের ক্রম-উত্থানের ফলে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থরক্ষার জন্য জাপানের সহিত ভবিষ্যতে যুদ্ধ করিতে হইতে পারে এই আশঙ্কায় আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের রাজনীতিতে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়। রুশ-জাপানী যুদ্ধে (১৯০৪-৫) আমেরিকার মধ্যস্থতায় শান্তি স্থাপিত হয়। জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আমেরিকার কূটচালে পরাজিত হইয়াছিল এবং পোর্টস্‌মাউথের সন্ধিতে রাশিয়াকে যতদূর পদানত করিতে সক্ষম হইতে পারিত ততদূর পারে নাই। এই কারণে জাপান ও আমেরিকার মধ্যে সামান্য মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরে কেলিফোর্ণিয়ায় জাপানীদের বসবাস-সংক্রান্ত বিবাদের ফলে এই মনোমালিন্য তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে থিয়োডোর রুজভেল্ট্ মার্কিন নৌ-বাহিনীর শক্তি প্রদর্শনের জন্য এক মার্কিন নৌ-বাহিনী পৃথিবী প্রদক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। বিশেষ করিয়া জাপানকে মার্কিন নৌ-শক্তির অপরাজেয়তা সম্পর্কে ধারণা দেওয়াই রুজভেল্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল।

(২) জাপানের উত্থান: আমেরিকা কর্তৃক প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে সক্রিয় অংশ গ্রহণ: রুশ-জাপানী যুদ্ধে মধ্যস্থতা (১৯০৪-৫) —মন্‌রো-নীতি-লঙ্ঘন

মন্‌রো-নীতি লঙ্ঘন করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা মরক্কো-সংক্রান্ত ইওরোপীয় রাজনীতির সমস্যা সমাধানের জন্য আল্‌জেসিরাস্ (Algeciras) কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিল।

(৩) আল্‌জেসিরাস্ কন্‌ফারেন্সে যোগদান —মন্‌রো-নীতি লঙ্ঘন

ক্রমবর্ধমান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরিপূরক হিসাবে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে জলপথে সংযোগ স্থাপন আমেরিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। কলম্বিয়া প্রজাতন্ত্র হইতে পানামা রাজ্যটিকে নানা-প্রকার বিদ্রোহাত্মক কার্যে উৎসাহিত করিয়া আমেরিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে সমর্থ হইল। পরে পানামা রাজ্য হইতে পানামা খাল খননের উপযোগী জমি ক্রয় করিয়া আমেরিকা পানামা খাল খনন করাইল। দীর্ঘ দশ বৎসর ধরিয়া খননকার্যের ফলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে জলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হইল। ফলে, এই দুই মহাসাগরের যোগাযোগ পথ কয়েক হাজার মাইল হ্রাস পাইল। ইহা ভিন্ন মধ্য-আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান সাগর অঞ্চলের উপর আমেরিকার প্রভাব এবং প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পাইল। পানামা

(৪) সাম্রাজ্য-স্বার্থ রক্ষার জন্য পানামা খাল খনন

খালের নিরাপত্তার জন্য আমেরিকা নানাপ্রকার ফন্দিবাজীর দ্বারা 'ক্যানাল জোন' (canal-zone)-এ ক্ষমতা বিস্তার করিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, নিজ স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে আমেরিকা কোন কোন ক্ষেত্রে মনরো-নীতির অনুসরণ করিতে আবার অপরাপর ক্ষেত্রে মনরো-নীতি ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। ইওরোপীয় দেশগুলির সহিত পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে দেনা-পাওনা-সংক্রান্ত বিবাদের সৃষ্টি হইলে আমেরিকা মনরো-নীতির উপর নির্ভর করিয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপগুলির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। এই সূত্রে আমেরিকা ক্রমে ল্যাটিন আমেরিকার অভিভাবকত্ব ও সংরক্ষণের অধিকার গ্রহণে অগ্রসর হয়।

(৫) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও ইওরোপীয় দেশগুলির বিবাদে আমেরিকার মনরো-নীতি প্রয়োগ

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অপর প্রকাশ দেখা যায় 'প্যান-আমেরিকানিজম্' (Pan Americanism)-এর মধ্যে। আমেরিকা মহাদেশের উপর সর্বাত্মক প্রাধান্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা কয়েকটি 'প্যান-আমেরিকান্' কন্ফারেন্স আহ্বান করিয়াছিল।

(৬) দক্ষিণ-আমেরিকার উপর প্রাধান্য লাভের চেষ্টা: প্যান-আমেরিকানিজম্

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে প্রথম তিন বৎসর আমেরিকা এই যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত ছিল। লুপ্তপ্রায় মনরো-নীতি অনুসরণ করিবার ইচ্ছা ভিন্ন আমেরিকাবাসীর এক-পঞ্চমাংশ ছিল জার্মান—এই কারণেই আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু ক্রমে জার্মানির ডুবো-জাহাজের আক্রমণে মার্কিন বাণিজ্য-স্বার্থ নষ্ট হইতে থাকিলে এবং ইওরোপীয় দেশগুলিকে আমেরিকা যে বিরাট পরিমাণ অর্থ ঋণ দিয়াছিল তাহার নিরাপত্তার জন্য ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধাবসানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইল্সনের চেষ্টায়-ই লীগ-অব-ন্যাশন্স গঠিত হয়। কিন্তু প্যারিস শান্তি-সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত শান্তি-চুক্তিগুলির শর্তাদি রক্ষার দায়িত্ব আমেরিকার সেনেট কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় ফলে, মার্কিন সরকার ঐ সকল সন্ধি স্বাক্ষর করিলেন না। পুনরায় আমেরিকা ইওরোপের রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন প্রথম যুদ্ধে আমেরিকা ইংলণ্ডের মাধ্যমে যে পরিমাণ ঋণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম-ভাগে মার্কিন নিরপেক্ষতা

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান (১৯১৭): মনরো-নীতি ত্যাগ

ইওরোপীয় দেশগুলিকে দিয়াছিল তাহাও আদায় না হওয়ায় আমেরিকা ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিবার কু-ফল বুঝিতে পারিল। ইহারপর কিছুকাল পর্যন্ত আমেরিকা একদিকে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিল, অপর দিকে সুদূর-প্রাচ্যে স্বার্থরক্ষার কাজে ব্যস্ত রহিল। কিন্তু ক্রমেই আন্তর্জাতিক সমবায়ের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া আমেরিকা ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স (Washington Conference) নামে এক সম্মেলন আহ্বান করিল। এই সম্মেলনে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল ও নৌশক্তি হ্রাস-সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসানে ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার নীতি গ্রহণ, সুদূর-প্রাচ্যে স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা

ইহা ভিন্ন আমেরিকা লীগ-অব ন্যাশন্‌সের সহযোগিতার নীতিও গ্রহণ করিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি সমস্যার সমাধানের জন্য মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সাহায্য আমেরিকা দিতে স্বীকৃত হইল। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষার জন্য স্বাক্ষরিত ব্রিয়াণ্ড্‌-কেলগ্‌ চুক্তি (Briand-Kellog Pact)-ও আমেরিকা গ্রহণ করিয়াছিল (১৯২৮)। জাপান ঐ সময় মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিলে আমেরিকা লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সহিত যুগ্মভাবে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও জানাইয়াছিল। এইভাবে ক্রমেই আমেরিকা লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য না হইয়াও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক সামরিক বিবাদ-বিসংবাদ হইতে নির্লিপ্ত থাকিবার আগ্রহ ঐ সময়ে আমেরিকা পররাষ্ট্র-নীতির মূলসূত্র ছিল সন্দেহ নাই। ইতালি যখন আবিসিনিয়া দখল করে তখন আমেরিকা ইওরোপীয় যুদ্ধ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে নিরপেক্ষতামূলক আইন প্রণয়ন করিয়া সেগুলি অনুসরণ করিয়া চলিল। কিন্তু নাৎসি জার্মানির শক্তি বৃদ্ধিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স— এই দুইটি গণতান্ত্রিক দেশের নিরাপত্তা যতই ক্ষুণ্ণ হইতে চলিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন্‌ রুজভেল্ট্‌ ততই নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে নিরপেক্ষতার আইনগুলি বাতিল করা হইল। হিট্‌লারের সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র পৃথিবীর শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর এই কথা বিবেচনা করিয়া রুজভেল্ট্‌ আমেরিকাকে সামরিকসজ্জায় প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং ইংলণ্ডকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য প্রয়োজনীয়

লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্য না হইয়াও আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সহায়তা দান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে যোগদান

আইন (Lease & Lend Bill) প্রণয়ন করিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৭ই তারিখে জাপান কর্তৃক পার্ল বন্দর (Pearl Harbour) আক্রান্ত হইলে আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল।

মার্কিন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ উন্নতি (Internal development of America) ঃ অন্তর্যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে আমেরিকা স্বাধীনতা যুদ্ধ-প্রসূত অর্থনৈতিক অব্যবস্থা দূরীকরণে চেষ্টিত ছিল। বিভিন্ন প্রেসিডেণ্টের কার্যকুশলতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা

পশ্চিমাঞ্চলে পশুপালন ও কৃষি-ব্যবসায় গড়িয়া ওঠে। দক্ষিণাঞ্চলে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কৃষিজাত দ্রব্যাদি, বিশেষভাবে তুলার চাষ চলিতে থাকে। উত্তরাঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যের সংরক্ষণের জন্য স্থাপিত শুল্কের বিরোধিতা দক্ষিণাঞ্চলে তীব্র আকার ধারণ করে এবং অন্তর্যুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

মন্‌রো-নীতি অবলম্বন করিয়া আমেরিকা ফ্লোরিডা, লুসিয়ানা প্রভৃতি স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে। মিসিসিপি নদী অঞ্চলে বসতি বিস্তার, টেকসাস্ দখল, কেলিফোর্ণিয়া অধিকার প্রভৃতি নানাভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৬১-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্যুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদের ফলে আমেরিকাবাসী সমবেতভাবে এক নূতন দেশ গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

মন্‌রো-নীতি : আমেরিকার আয়তন বৃদ্ধি

অন্তর্যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীতে আমেরিকার আভ্যন্তরীণ উন্নতি এবং অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন মার্কিন জাতীয়জীবনে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। কেলিফোর্ণিয়া ও কলরেডো অঞ্চলে স্বর্ণখনির আবিষ্কার, রকিস্ অঞ্চলে নানাপ্রকার মূল্যবান ধাতুর আবিষ্কার অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইয়াছিল। জমি উন্নয়নের উৎসাহদানের জন্য মার্কিন সরকার অন্তত পাঁচ বৎসর কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইবে এই শর্তে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ১৬০ একর করিয়া জমি দিতে লাগিলেন। জমি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনেরও উন্নতি সাধিত হইল। পরিবহণ ও চলাচলের সুবিধার জন্য 'ইউনিয়ন পেসিফিক্

অন্তর্যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দী : কৃষি, পশুপালন, খনিজদ্রব্য ও রেলপথের উন্নতি

রেলওয়ে' (Union Pacific Railway) নামে এক দীর্ঘ রেলপথ প্রস্তুত হইল। ১৮৭০-৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট রেলপথ নির্মাণ করা হইলে আমেরিকার বৃহদাংশ রেলপথ দ্বারা সংযোজিত হইল।

রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সহিত সংঘর্ষ

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইওরোপীয়দের বসতি বিস্তার ক্রমে রেড্ ইণ্ডিয়ানদের স্বার্থে আঘাত হানিল। ফলে, আমেরিকাবাসী ঔপনিবেশিকদের সহিত রেড্ ইণ্ডিয়ানদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়া রেড্ ইণ্ডিয়ানগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ জমিগুলিও ঔপনিবেশিকদের নিকট হারাইল এবং আত্মসমর্পণে বাধ্য হইল।

শিল্পোন্নতি

অন্তর্যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দী শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রেও যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকা ছিল কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু ইহার পর হইতে আমেরিকা শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়। নিজ দেশের জনসংখ্যার বিরাট চাহিদার সহিত ও ইওরোপীয় দেশগুলির মিলিত চাহিদার ফলে আমেরিকার শিল্পজাত দ্রব্যের উন্নতির প্রয়োজনীয় বাজারের অভাব কোন সময়েও হয় নাই। ইহা ভিন্ন ঐ সময়ে বিজ্ঞানের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহার ফলে এই বিরাট চাহিদা অনুযায়ী সামগ্রী প্রস্তুতের অসুবিধাও ছিল না। সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমেরিকা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শিল্পোৎপাদক দেশে পরিণত হইল। শিশুশিল্পকে সংরক্ষণ দান করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টার কোন ত্রুটি হইল না। শিল্পবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় শহর গড়িয়া উঠিল। লৌহ, খনিজ তৈল, মোটর গাড়ী প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প দ্রুতগতিতে উন্নত হইয়া উঠিল। শিল্পোৎপাদকগণ 'শিল্পসংঘ' (Combines), ট্রাস্ট্ (Trust) প্রভৃতি স্থাপন করিয়া বিশালাকৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন। লৌহশিল্পে কার্ণেগি, তৈলশিল্পে রকফেলার প্রভৃতি শিল্পপতিগণ শিল্পোৎপাদনে যুগান্তর আনয়ন করিলেন। শ্রমিকগণও সংঘবদ্ধ হইয়া মজুরী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। মার্কিন মালিক ও মজুর শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ ঐ সময় হইতে আরম্ভ হইয়া আজও চলিয়া আসিতেছে।

আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নতিতে আকৃষ্ট হইয়া ইওরোপীয় দেশগুলি এবং চীন ও জাপান হইতে বহুলোক আমেরিকায় বসবাস করিবার জন্য আসিতে লাগিল। ক্রমে বহিরাগত ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে মার্কিন

সরকার অবাধভাবে বহিরাগত ব্যক্তিদের আমেরিকায় আসা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। প্রতিবৎসর একটি নির্ধারিত সংখ্যার অধিক লোক বিদেশ হইতে আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। চীনা ও জাপানী শ্রমিকদের আগমনে মার্কিন শ্রমজীবিগণের সহিত তাহাদের তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দিলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে চীনা আগন্তুকদের আমেরিকা প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হইল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় নাগরিকত্ব যাহারা গ্রহণ করে নাই এইরূপ সকল চীনাকেই আমেরিকা হইতে বহিষ্কার করা হইল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী আগন্তুকদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

আগন্তুক বিরোধী আইন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকা অসাধারণ শিল্পোন্নতির মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী দেশে পরিণত হইয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা বিরাট পরিমাণ অর্থ ইওরোপীয় দেশগুলিকে ঋণ দিয়াছিল। অবশ্য এই অর্থের অধিকাংশই আমেরিকা ফেরৎ পায় নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বত্র যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল তাহা আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থারও বিপর্যয় আনিয়াছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট্-এর আমলে National Industrial Recovery Act (NIRA) পাস করিয়া অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের এক সুযৌক্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইল। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই আমেরিকার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সম্পূর্ণ হইয়া বাহিরের দেশগুলিকে সাহায্য দিবার মত শক্তি জন্মিয়াছিল।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অর্থনৈতিক অবনতি : পুনরুজ্জীবন (NIRA)

দ্বাদশ অধ্যায়

সুদূর-প্রাচ্য : চীন ও জাপান

(The Far East : China and Japan)

ইওরোপের সুদূর-প্রাচ্য (ভারতবর্ষের নিকট-প্রাচ্য), অর্থাৎ চীন ও জাপান ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উভয়দেশই ইওরোপীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্যিক বিস্তার-নীতি হইতে রেহাই পাইল না। ক্রমে এই দুই দেশ পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির স্বার্থসিদ্ধি ও শোষণের ক্ষেত্রে পরিণত হইল।

সুদূর-প্রাচ্য—চীন ও জাপান

চীন (China)

আদি সভ্যতার অন্যতম জন্মস্থান চীনদেশ, পর্বত, মরুভূমি ও সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বহির্জগতের সহিত চীনদেশের যোগাযোগ ছিল না মনে করিলে ভুল হইবে। প্রাচীনকালে রোমের বণিকগণ চীনদেশ হইতে রেশম লইয়া যাইত। চীন-রাজসভায় আরব-পারসিক দূতগণও আসিতেন। ভারতবর্ষের সহিত চীনদেশের যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ইওরোপীয় নাবিকগণ 'ক্যাথে' (Cathay) অর্থাৎ চীনদেশে পৌঁছিবার পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিত। মার্কো পোলো নামক ইতালীয় পর্যটক দীর্ঘকাল চীনদেশে অবস্থানের পর স্বদেশে ফিরিয়া 'মার্কো পোলোর ভ্রমণ' (Travels of Marco Polo) নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে চীনদেশের এবং জাপান, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলির বিবরণ প্রকাশিত হইলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মধ্যে ক্যাথে ও প্রাচ্য অঞ্চলের অপরাপর দেশে পৌঁছিবার এক দারুণ আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভৌগোলিক

আদি সভ্যতার অন্যতম জন্মস্থান

ইওরোপীয়দের চীনদেশে পৌঁছিবার চেষ্টা

আবিষ্কারের যুগে প্রাচ্যের দেশগুলিতে পৌঁছিবার সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হওয়ার সময় হইতে ইওরোপীয় বণিকগণ ক্রমে চীনদেশের স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীর ভেদ করিয়া সেখানে স্বার্থসিদ্ধির জন্য উপস্থিত হইতে লাগিল। চীনাগণ নিজেদের দেশকে স্বর্গ রাজ্য (Celestial Empire) বলিয়া বর্ণনা করিত। তাহারা নিজেদের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিত। প্রাচীন গ্রীকগণ যেমন অ-গ্রীক মাত্রেরই নাম দিয়াছিল 'বর্বর', তেমনি চীনাগণও অপর সকলকেই 'বর্বর' (barbarian) নামে অভিহিত করিত। ফলে, তাহারা অতি সন্তর্পণে নিজ সভ্যতাকে বাহিরের সভ্যতার সংস্পর্শ ও প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া চলিত।

চীনদেশের স্বাতন্ত্র্য

কিন্তু ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর ষোড়শ শতাব্দীতে সমুদ্রপথ ধরিয়া পোর্তুগীজ বণিকগণ চীনদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। ম্যাকাও (Macao) নামক বন্দরে তাহারা অতিশয় কঠোর শর্তাধীনে বাণিজ্য করিবার সামান্য অধিকার লাভ করিল। ইহার এক শতাব্দী পর আসিল স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরেজ নাবিকগণ। ইহারা আসিল ক্যাণ্টন (Canton) নামক বন্দরে। এই সকল ইওরোপীয় বণিকগণ অতিশয় অপমানজনক শর্ত মানিয়া প্রায় 'জোঁকের'* ন্যায়ই চীনদেশে টিকিয়া রহিল। চীনদেশ ইওরোপীয় বণিকদের চীনে বসবাস ও বাণিজ্য মোটেই পছন্দ করিত না, সুতরাং চীন সম্রাট তাহাদের উপর নানাপ্রকার কঠোর শর্ত আরোপ করিলেন। ইওরোপীয় বণিকগণকে চীনা পদ্ধতিতে চীন সম্রাটকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম (Kotow) করিতে হইত। বিদেশী বণিকদের চীনাভাষা শিক্ষা করা নিষিদ্ধ ছিল, তাহারা অতি নীচ স্তরের লোক বলিয়া বিবেচিত হইত। কো-হং (Co-hong) নামে এক শ্রেণীর চীনা বণিকদের নিকট তাহারা পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষী ইওরোপীয় বণিকগণ এই সকল অপমানজনক শর্ত মানিয়া লইয়াই চীনদেশে টিকিয়া রহিল এবং সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। চীনদেশের নিকটবর্তী রাশিয়াও এবিষয়ে পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। ১৬৮৯

পোর্তুগীজ, স্পেনীয় ও ইংরেজ বণিকদের আগমন

অপমানজনক শর্তে ইওরোপীয় বণিকগণের বাণিজ্য অধিকার লাভ

*"They fastened like leeches upon her southern shore.........
Ketelbey, p. 493.

খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম রাশিয়াই চীন সম্রাটের সহিত নারস্কিঙ্ক (Nerschink) নামক চুক্তি স্থাপনে সমর্থ হয়। ইহাই ছিল সর্বপ্রথম চীনা-ইওরোপীয় চুক্তি। রুশ বণিকদিগকেও নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম-কানুন মানিয়া বাণিজ্য করিতে হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আরও কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতেও রুশ বণিকগণ চীনদেশে বাণিজ্যের প্রসার সাধনে সমর্থ হয় নাই। বরঞ্চ চীনা-রুশ বাণিজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে অতি সামান্য পরিমাণে আসিয়া দাঁড়ায়। অপরাপর ইওরোপীয় বণিকগণ চীনা চা ও রেশম ক্রয় করিত এবং চীনদেশে আফিং আমদানি করিত। ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছিল এবিষয়ে অগ্রণী।

নারস্কিঙ্ক্ চুক্তি : রুশ-চীনা বাণিজ্যচুক্তি

ক্রমে চীনদেশের সহিত ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে ব্রিটিশ সরকারও কোম্পানিকে সাহায্যদানে প্রস্তুত হইলেন। রাজা তৃতীয় জর্জ চীন সম্রাটের নিকট উপঢৌকন-সহ দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু চীনের সম্রাট এই উপঢৌকনকে 'কর' (tribute) বলিয়া অভিহিত করিলেন। সম্রাট চিয়েন লুঙ্ (Chien Lung) তৃতীয় জর্জের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না এবং ইংরেজ বণিকদের কোনপ্রকার সুযোগ দানে বা ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন না। তৃতীয় জর্জের রাজত্বকালে লর্ড ম্যাক্‌কার্টনি (১৭৯৩) এবং লর্ড আমহার্স্ট (১৮১৬) বাণিজ্যের সুযোগ আদায় করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে চীনদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় দৌত্যই বিফল হইয়াছিল। চীন সম্রাট কর্তৃক বাণিজ্যিক সুবিধা দানে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে ইংলণ্ড ও চীনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের প্রসার

চীনে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের দূত প্রেরণ

নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তির মধ্যেও ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আফিং ব্যবসায় ইতিমধ্যে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আফিং ব্যবসায় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং ঐ বৎসর সমগ্র চীনদেশের মোট রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আফিংয়ের মোট আমদানি মূল্য অধিক ছিল। ব্রিটিশ ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত ও পারস্য দেশীয় আফিং চীনে

নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যেও আফিং ব্যবসায়ের প্রসার

আমদানি করিত এবং তুরস্ক হইতে আফিং আমদানি করিত মার্কিন ব্যবসায়িগণ। এই বিরাট পরিমাণ আফিং আমদানি হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চীনবাসীদের অধিকাংশই ছিল আফিংসেবী। আফিং সেবনের কু-অভ্যাস বিদেশীরাই চীনদেশে প্রচলন করিয়াছিল। চীন সরকার এই সর্বনাশাত্মক অভ্যাস দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে আদেশ জারী করিয়া আফিং সেবন নিষেধ করিয়াছিলেন এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে আফিং আমদানি নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বার্থপর বিদেশী বণিকগণ চীনা সরকারী কর্মচারিবর্গের দুর্নীতি-পরায়ণতার সুযোগ লইয়া এই সকল বাধা-নিষেধ অমান্য করিয়া আফিংয়ের ব্যবসায় পূর্ণোদ্যমেই চালাইতেছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই চীন সরকারের এক আদেশের ফলে সাময়িকভাবে ক্যান্টন বন্দর হইতে আফিংয়ের ব্যবসায় সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া গেল। ইহাতে চীনা কর্মচারীদের অবৈধ উপায়ে অর্থাগমের পথও বন্ধ হইয়া গেল। ফলে, তাহারা আফিংয়ের ব্যবসায় গোপনে পুনরায় গড়িয়া উঠিবার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিতে লাগিল।

চীন সরকার কর্তৃক আফিং বর্জন নীতি-গ্রহণ : চীনা কর্মচারী ও বিদেশী বণিকদের স্বার্থপরতায় গোপনে আফিং ব্যবসায় প্রচলন

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যান্টন বন্দরে একজন চীনা কমিশনার আফিং সেবন ও আফিং ব্যবসায় বন্ধ করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু বিদেশী বণিকগণের বিরোধিতা ও চীনা সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থপরতার জন্য আফিং ব্যবসায় বন্ধ করা সম্ভব হইল না। ঐ বৎসরই ব্রিটিশ সরকার লর্ড চার্লস্ নেপিয়ারকে চীনদেশে ব্রিটিশ বাণিজ্যের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। চার্লস্ নেপিয়ারের উদ্দেশ্য ছিল চীন সরকারের নিকট হইতে ব্রিটিশ বণিকদের সম্মানজনক শর্তে বাণিজ্য করিবার অধিকার আদায় করা। চার্লস্ নেপেয়ারের ঔদ্ধত্য চীন সরকারের বিরক্তি বৃদ্ধি করিল। পর বৎসর (১৮৩৪) নেপিয়ারের মৃত্যু হইলে আসন্ন ইঙ্গ-চীনা বিরোধের আশঙ্কা দূর হইল বটে, কিন্তু চীন সরকারের ব্রিটিশ বিরোধিতা বৃদ্ধি পাইল। ঐ বৎসরই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আফিং ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার বাতিল হইলে এই ব্যবসায়ে আরও বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহণে অগ্রসর হইল। ক্রমেই আফিংয়ের ব্যবহার বৃদ্ধি

চীন সরকার কর্তৃক আফিং ব্যবসায় দমনের চেষ্টা : ইঙ্গ-চীন মনোমালিন্য

[illegible] চীন সরকার ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে এই সর্বনাশাত্মক মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় বন্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার লিন্-জু-সু (Lin-Tzu-hsu) নামে একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে ক্যান্টনের স্পেশ্যাল কমিশনার নিযুক্ত করিলেন। আফিং ব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য যে-সকল বিধি-নিষেধ করা হইয়াছিল সেগুলি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী করিবার দায়িত্ব তাঁহাকে দেওয়া হইল। লিন্ বিদেশী বণিকগণকে তাহাদের হাতে যে পরিমাণ আফিং ছিল তাহা তাঁহার নিকট জমা দিতে এবং ভবিষ্যতে তাহারা আফিং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে না এই প্রতিশ্রুতি দিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ অমান্য করিলে তিনি বিদেশী বণিকদের চীনদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার সম্পূর্ণভাবে নাকচ করিয়া দিবেন বলিয়া ভীতিও প্রদর্শন করিলেন। ব্রিটিশ বণিকগণ তাহাদের আমদানিকৃত আফিংয়ের কতক পরিমাণ চীনা কমিশনারের আদেশ অনুসারে জমা দিল বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে আফিং ব্যবসায় ত্যাগের প্রতিশ্রুতিদানে অস্বীকার করিল। মার্কিন বণিকগণ ঐ শর্ত গ্রহণ করিল এবং চীনদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার অধিকার ভোগ করিতে লাগিল। ব্রিটিশ বণিকদের সহিত যাবতীয় বাণিজ্য-সম্বন্ধ চীন সরকারের আদেশে বন্ধ করা হইল, এমন কি খাদ্যদ্রব্যাদিও তাহাদের পক্ষে পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। এইভাবে চীন সরকার ও ব্রিটিশ বণিকদের মধ্যে যে বিরোধের সৃষ্টি হইল তাহা ক্রমে প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইল।

লিন্ স্পেশ্যাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (১৮৩৯)

ইংরেজ বণিকদের সহিত বিরোধের সৃষ্টি

প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধ বা অহিফেন যুদ্ধ (Anglo-Chinese or Opium War) : প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের মূল কারণ যে, ইংরেজ বণিকদের নীচ স্বার্থপরতা-প্রসূত ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নৈতিকতার দিক হইতে বিচার করিলে চীনদেশের অধিবাসিগণকে আফিংয়ের ন্যায় অনিষ্টকর দ্রব্য সেবন করাইয়া ইংরেজ বণিকদের অর্থলাভের চেষ্টা অত্যন্ত গর্হিত কার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে বলা বাহুল্য।

প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের মূল কারণ : ইংরেজদের স্বার্থপরতা

চীনদেশে অহিফেন বা আফিং সেবনের কু-অভ্যাসের জন্য প্রধানত স্বার্থান্বেষী বিদেশী বণিকগণই দায়ী ছিল। অবশ্য চীন সরকারের আফিং

সেবন বন্ধ করিবার অক্ষমতা ও চীনা সরকারী কর্মচারিগণের দুর্নীতিপরায়ণতা এজন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল সন্দেহ নাই। আফিং সেবনের কু-অভ্যাস চীনবাসীদিগকে যেমন হীনচেতা করিতেছিল অপরদিকে তেমনি বিরাট পরিমাণ আফিংয়ের আমদানির ফলে চীন-দেশের সোনা-রূপা বিদেশে চলিয়া যাইতেছিল। ন্যায়পরায়ণ কোন কোন মার্কিন বা ইংরেজ বণিকও যে আফিং ব্যবসায়ের অবৈধতা ও সর্বনাশাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন না ছিলেন এমন নহে। আফিং ব্যবসায়ের উপর অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ফলে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যাদির ব্যবসায় দিন দিনই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল এই কারণেও অনেকে আফিং ব্যবসায়ের সংকোচ সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী বিদেশী বণিকদের অর্থলিপ্সার জন্য আফিং ব্যবসায় বন্ধ করিবার যাবতীয় চেষ্টা ব্যাহত হইয়াছিল।

অহিফেন সেবনের কু-অভ্যাস : দেশী বণিকদের দায়িত্ব

১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন সরকার কমিশনার লিন্-এর হস্তে আফিং ব্যবসায় দমন করিবার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিলে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। লিন্ ব্রিটিশ বণিকদের নিকট হইতে যাবতীয় আফিং হস্তগত করিলেন এবং মোট কুড়ি হাজার আফিং বোঝাই বাক্স পোড়াইয়া দিলেন। ব্রিটিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপ্টেন ইলিয়ট্ (Captain Elliot) এইজন্য ইংলণ্ডের রাণীর নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইবেন বলিয়া চীনা কমিশনার লিন্কে ভয় দেখাইলেন। লিন্ ইহাতে ভীত হইলেন না। তিনি ব্রিটিশ বণিকগণকে ভবিষ্যতে আফিং ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে বলিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি ঘোষণা করিলেন যে, পুনরায় যাহারা আফিং ব্যবসায় শুরু করিবে তাহাদিগকে চীনা আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে। চীন সরকারের বিনা অনুমতিতে কোন ব্রিটিশ জাহাজ চীনা উপকূলে ভিড়িতে পারিবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। চীনা বিচারালয়ে ব্রিটিশ বণিকদের বিচার করিবার অধিকার লইয়া চীন সরকার ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। ঐ সময়ে বিনা অনুমতিতে তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিলে চীন সরকারের আদেশে একটি ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজও আক্রমণ করা হইয়াছিল। তদুপরি ব্রিটিশ বণিকদের সহিত যাবতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

কমিশনার লিন্ কর্তৃক আফিং ব্যবসায় দমনের চেষ্টা

আফিং ব্যবসায়ে বাধা : ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ইংরেজ বণিকদের পক্ষ অবলম্বন

ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ আক্রমণের জন্য ক্ষতিপূরণ, ভবিষ্যতে ইংরেজ বণিকদের চীনদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার এবং কমিশনার লিন্ কর্তৃক বিনাশ-কৃত আফিংয়ের জন্য ক্ষতিপূরণ চীন সরকারের নিকট দাবি করিলেন। চীন সরকার এই সকল দাবি অগ্রাহ্য করিলে ব্রিটিশ-জাহাজ কতিপয় চীনা-জাহাজের উপর গুলিবর্ষণ করে। এই সূত্রে প্রথম ইঙ্গ-চীনা বা প্রথম অহিফেন যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ ১৮৪০ হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল।

প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধ বা প্রথম অহিফেন যুদ্ধ (১৮৪০-৪২)

উপরোক্ত কারণগুলি ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের আসন্ন কারণ হইলেও ইহার মূল কারণ ছিল ইংলণ্ড তথা ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট চীনদেশকে উন্মুক্ত করিবার ইচ্ছার মধ্যে। মার্কিন ঐতিহাসিক জন কুইন্সি এ্যাডামস্ (John Quincy Adams) বলেন যে, বোস্টন বন্দরে চায়ের বাক্স জলে নিক্ষেপ করা যেরূপ আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কেবল অজুহাত মাত্র ছিল, সেইরূপ চীন সরকার কর্তৃক ব্রিটিশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির আফিংয়ের বাক্স বাজেয়াপ্ত করাও চীনদেশের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের অজুহাত ভিন্ন অপর কিছুই নহে।* বস্তুতপক্ষে এই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল, (১) চীনা সাম্রাজ্যে ইংরেজ রাজনৈতিক অধিকার স্থাপনের ইচ্ছা, (২) রাজনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে বাণিজ্যিক স্বার্থ বৃদ্ধি এবং কো-হং (co-hong) প্রথার অবসান।

অহিফেন-সংক্রান্ত ঘটনা যুদ্ধের আসন্ন কারণ

মূল কারণ : (১) চীন সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন, (২) বাণিজ্য-স্বার্থ বৃদ্ধি, (৩) কো-হং প্রথার অবসান

যুদ্ধ শুরু হইলে অল্পায়াসেই ব্রিটিশসৈন্য চীনাসেনাবাহিনীকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত চীন সরকার ইংরেজদের সহিত শান্তি স্থাপনে বাধ্য হইলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট চীনদেশের সহিত ইংরেজ পক্ষের নান্‌কিং-এর চুক্তি (Treaty of Nankin) স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে দুই কোটি দশ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে চীন সরকার ইংরেজগণকে দিতে বাধ্য হইলেন। চীন সরকার ব্রিটিশ

চীনের পরাজয় : নান্‌কিং-এর চুক্তি (১৮৪২)

*"It is a general, but I believe, altogether mistaken opinion that the quarrel is merely for certain chests of opium imported by British merchants into China, it is mere incident to the dispute; but no more the cause of war than the throwing overboard of the tea in the Boston Harbour was the cause of the North American revolution". Vide Vinacke, p. 40.

সরকারকে হংকং দান করিলেন। ইহা ভিন্ন ক্যান্টন, এময়, ফুচো, নিংপো ও সাংহাই—এই পাঁচটি বন্দর বিদেশী বণিকদের নিকট উন্মুক্ত করিতে চীন সরকার স্বীকৃত হইলেন। এই সকল বন্দরে বিদেশী বণিকগণ নিজ নিজ কন্‌সাল (Consul) নিযুক্ত করিবার অধিকার পাইল। 'কো-হং' প্রথার অবসান করা হইল এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শুল্ক বিদেশী বণিকদের আমদানি-রপ্তানির উপর নির্ধারিত হইল। এই যুদ্ধ আফিং ব্যবসায় লইয়া-ই শুরু হইয়াছিল বটে, কিন্তু নান্‌কিং-এর সন্ধিতে আফিং ব্যবসায় সম্পর্কে কোন উল্লেখই করা হইল না। তদুপরি, এই যুদ্ধের ফলেই চীনদেশের সামরিক দুর্বলতার পরিচয় ইংরেজগণ তথা ইওরোপীয়রা পাইল এবং উহার সুযোগ গ্রহণে অগ্রসর হইল।

শর্তাদি

ফলাফল

চীনদেশের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিবার দায়িত্ব ইংরেজগণ গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রথম ইঙ্গ-চীনা যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই অপরাপর ইওরোপীয় দেশও চীনদেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিতে লাগিল। আমেরিকার চেষ্টায় চীনদেশীয় বাণিজ্য সকল বিদেশীর নিকট-ই উন্মুক্ত রাখা হইল, ইংরেজগণ চীনদেশ সম্পর্কে 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' (Open door policy) অবলম্বন করিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা চীনদেশের সহিত একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এই চুক্তি দ্বারা চীনদেশে অবস্থানকারী মার্কিন বণিকগণ কোনপ্রকার অপরাধে অভিযুক্ত হইলে কেবলমাত্র মার্কিন কন্‌সাল তাহাদের বিচার করিবেন স্থির হইল। এইভাবে চীনদেশে অবস্থান করিয়াও চীনদেশের আইন-কানুনের প্রয়োগ ও চীনা আদালত হইতে স্বাধীনভাবে থাকিবার অধিকার (extra territorial rights) মার্কিন ব্যবসায়িগণ লাভ করিল। আমেরিকার পর ফ্রান্সও অনুরূপ শর্তে চীন সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল। ফ্রান্স ক্যাথলিক ধর্মপ্রচারের অনুমতিও লাভ করিতে সমর্থ হইল। এইভাবে ইংরেজ, আমেরিকাবাসী ও ফরাসীদের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিবার ফলে চীনদেশের দ্বার ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট উন্মুক্ত হইল। সুইডেন, নরওয়ে, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও চীনদেশের সহিত বাণিজ্য করিবার সুযোগ গ্রহণে পশ্চাদ্‌পদ রহিল না।

ইওরোপীয়দের বাণিজ্য বিস্তারের উৎসাহ

দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধ (Second Chinese War): ক্রমেই বিদেশী

বণিকগণ নিজ নিজ স্বার্থবৃদ্ধির জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ করিয়া সন্তুষ্ট রহিতে পারিল না। সমগ্র ইয়াংসিকিয়াং উপত্যকা তাহারা নিজেদের প্রাধান্যাধীনে আনিতে চাহিল। অপর দিকে চীন সরকার বিদেশী বণিকদের সুযোগবৃদ্ধি ব্যাহত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিলেন। এইভাবে অল্প-কালের মধ্যেই এক দ্বিতীয় সংঘর্ষের সৃষ্টি হইল।

চীন সরকার ও বিদেশী বণিকদের মনোমালিন্য : দ্বিতীয় সংঘর্ষের প্রস্তুতি

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে চীন সরকারের দুর্বলতা টেইপিং (Taiping) বিদ্রোহের ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে বিদেশী বণিকদের স্বার্থবৃদ্ধির সুযোগ হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন চীনা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে জনৈক ফরাসী খ্রীষ্ট ধর্মযাজকের প্রাণদণ্ড হইলে ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ উপস্থিত হইল। এই দুই দেশের সরকার চীন সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে মনস্থ করিলেন। এমন সময় অপর একটি ঘটনা প্রকাশ্য যুদ্ধের অজুহাতের সৃষ্টি করিল। এ্যারো (Arrow) নামে একটি লর্‌চা (*Lorcha*) অর্থাৎ জাহাজ ছিল একজন চীনবাসীর। এই জাহাজ ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করিয়া গোপনে অহিফেন ব্যবসায়, জলদস্যুতা প্রভৃতি অবৈধ কার্যে লিপ্ত ছিল। চীন সরকারের আদেশে এই জাহাজের বারো জন নাবিককে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সকল নাবিকের মধ্যে একজন দুর্ধর্ষ জলদস্যুও ছিল। ক্যান্টনে অবস্থিত ব্রিটিশ কন্‌সাল (Consul) এই নাবিকদের প্রত্যর্পণ দাবি করেন এবং ব্রিটিশ পতাকার অবমাননার জন্য চীন সরকারকে ক্ষমা চাহিতে বলেন। চীন সরকার প্রথমে এই সকল দাবি অগ্রাহ্য করিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাবিকদের ফিরাইয়া দিলেন। ক্ষমা চাহিবার দাবি অবশ্য চীন সরকার ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করিলেন। এই অজুহাতে ব্রিটিশ পক্ষ চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিল। ফ্রান্স ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামারস্টোন্ এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিটিশ মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কারণ 'এ্যারো' নামক জাহাজটি ছিল চীনদেশীয় এবং চীন সরকারের সার্বভৌমত্ব উহার উপর প্রয়োগ করা সম্পূর্ণভাবে আইনসঙ্গত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধের কারণ

'লর্‌চা এ্যারো ঘটনা'

টেইপিং বিদ্রোহে দুর্বলীকৃত চীন সরকার ইঙ্গ-ফরাসী যুগ্মবাহিনীর বিরুদ্ধে অধিককাল যুঝিতে সক্ষম হইলেন না। বাধ্য হইয়াই চীন সরকার ব্রিটিশ ও ফরাসী শক্তির সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই দুই দেশের সহিত সন্ধিই তিয়েনসিন (Treaties of Tientsin)-এর সন্ধি নামে পরিচিত (১৮৬১)। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী (১) আরও এগারটি বন্দর বিদেশী বণিকদের ব্যবসায়ের জন্য উন্মুক্ত হইল। (২) পিকিং-এ ইওরোপীয় দেশগুলির দূতাবাস স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। (৩) বিদেশী বাণিজ্য-স্বার্থের সুবিধার জন্য শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করা হইল। (৪) নির্ধারিত শুল্ক দিয়া অহিফেন আমদানি আইনত স্বীকৃত হইল। (৫) খ্রীষ্ট ধর্মযাজকগণকে অবাধ ধর্মপ্রচারের অধিকার দেওয়া হইল। (৬) চীন সরকার ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষকে প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইলেন। (৭) বিদেশী বণিকগণকে চীনা আইনের প্রয়োগ হইতে মুক্ত রাখিবার extra territorial rights পুনরায় স্বীকৃত হইল। দ্বিতীয় চীনা যুদ্ধ চীন সাম্রাজ্যের ও চীনা জাতির আত্মমর্যাদায় দারুণ আঘাত হানিল।

তিয়েনসিন্-এর সন্ধির শর্তাদি

টেইপিং বিদ্রোহ (Taiping Rebellion): ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চীন সাম্রাজ্য যখন ইওরোপীয় বণিকদের স্বার্থপর আক্রমণ-নীতি হইতে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত তখন আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এক দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল। মাঞ্চু সম্রাটবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য 'টেইপিং বিদ্রোহ' * নামে এক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় (১৮৫১)। এই আন্দোলন প্রথমে একটি ধর্মান্দোলন হিসাবে শুরু হইয়া অল্পকালের মধ্যেই রাজনৈতিক প্রকৃতি লাভ করে। টেইপিং বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দক্ষিণ চীনের কোয়াংটাং প্রদেশবাসী হাং-সিন্-চুয়ান্ (Hung-Hsin-Chuang)। ইনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ক্যাণ্টনের প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মযাজকগণের নিকট তিনি খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি এক নূতন ধর্মপ্রচারের জন্য স্বর্গীয় প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। হাং পৌত্তলিকতা-বিরোধী খ্রীষ্টধর্মের অনুকরণে এক নূতন ধর্মপ্রচার শুরু করেন। নিজেকে তিনি 'স্বর্গীয় রাজা' (Heavenly King) বলিয়া ঘোষণা করেন এবং

টেইপিং বিদ্রোহের সূত্রপাত : হাং-এর নেতৃত্ব

* T'ai P'ing = Perfect Peace.

স্বর্গরাজ্য (Heavenly Kingdom) নামে একটি নূতন রাজ্যস্থাপনের জন্য সচেষ্ট হন। হাং 'সম্পূর্ণ শান্তি' বা 'টেইপিং' (Taiping—Perfect Peace) নামে এক নূতন রাজবংশ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। কোয়াংসি নামক স্থানে হাং বহুসংখ্যক লোকের সমর্থন লাভ করিলেন। কোয়াংসি হইতে হাং তাঁহার দলবলসহ উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং মন্দিরের দেবমূর্তি, গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি বিনষ্ট করিয়া এবং সরকারী সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিয়া এক ব্যাপক অব্যবস্থার সৃষ্টি করিলেন। এইভাবে হাং সাময়িকভাবে নান্‌কিং দখল করিতেও সমর্থ হইলেন এবং সেখানে একটি নূতন রাজধানীও স্থাপন করিলেন। ধর্ম হইতে উদ্ভূত হইলেও নূতন রাজ্য গঠনের রাজনৈতিক আদর্শ-ই ছিল ইহার প্রকৃত প্রেরণা। ইওরোপীয় প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বিগণ হাং-কে সাহায্যদানের পক্ষপাতী ছিল। প্রথমে ব্রিটিশ সরকারও টেইপিং বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকা এই ব্যাপারে চীনা সরকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। বিদেশী বণিকদের মধ্যে প্রথমে যাঁহারা টেইপিং বিদ্রোহীদিগকে সাহায্যদানের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, হাং যদি দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তাঁহারা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে পারিবেন। কিন্তু ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বিদেশী সহানুভূতি টেইপিং বিদ্রোহিগণের পক্ষ হইতে চীন সম্রাটের পক্ষে পরিবর্তিত হয়। বিদেশী সহায়তায় মাঞ্চু সম্রাটবংশ টেইপিং বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। সুদক্ষ নেতৃত্বের অভাবও টেইপিং বিদ্রোহের বিফলতার অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন সেং-কুয়ো-ফান্ (Tseng-Kuo-Fan) একদল সৈন্য যোগাড় করিয়া টেইপিং বিদ্রোহীদিগকে নান্‌কিং হইতে বিতাড়িত করেন। বিদেশী সাহায্যের মধ্যে ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারী ক্যাপ্টেন গর্ডন (Captain Gordon)-এর তৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে টেইপিং বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমিত হয়।

প্রথম টেইপিং বিদ্রোহের ধর্মাশ্রয়ী রূপ—প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন

বিদ্রোহ দমন

টেইপিং বিদ্রোহ মূলত ছিল কৃষকদের বিদ্রোহ। সামন্ত প্রথা-প্রসূত অত্যাচার-অবিচার এই বিদ্রোহের প্রেরণা দান করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ ছিল মাঞ্চু সম্রাটবংশের দুর্বলতা ও পতনোন্মুখতার প্রমাণস্বরূপ। ১৮৫১ হইতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ

টেইপিং বিদ্রোহের গুরুত্ব

পর্যন্ত দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া এই বিদ্রোহের ব্যাপকতা ভবিষ্যতের চীনা বিদ্রোহের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিল। টেইপিং বিদ্রোহিগণের দাবির কোন কিছুই ঐ সময়ে সাফল্যলাভ করে নাই বটে, কিন্তু প্রায় একশত বৎসর পরে নূতন চীন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে টেইপিং বিদ্রোহিদের দাবির সব কিছুই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। আধুনিক চীনের পূর্বাভাস একশত বৎসরের পূর্বেকার টেইপিং বিদ্রোহে পরিলক্ষিত হয়। ইহাই হইল টেইপিং বিদ্রোহের গুরুত্ব।

তিয়েনসিন-এর সন্ধি (১৮৬১) হইতে শিমনোশেকির সন্ধি (১৮৯৫) পর্যন্ত চীন (China from the Treaty of Tientsin to the Treaty of Shimonoseki) : তিয়েনসিন-এর সন্ধির পর চীন সাম্রাজ্য ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হইল। বহু শতাব্দীর লৌহ-অবগুণ্ঠন সামরিক শক্তিপুষ্ট ইওরোপীয় বণিকদের স্বার্থ-লিপ্সার আঘাতে উন্মোচিত হইল। বিদেশী বণিকগণ চীনদেশের অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত প্রবেশ করিয়া চীনদেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপরতার এক নগ্ন, জঘন্য অভিনয় চীন সাম্রাজ্যের বুকে অভিনীত হইতে লাগিল। বিদেশী বণিকদের মধ্যে চীনদেশের অর্থ নৈতিক শোষণের এক দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্বেই ইওরোপীয় দেশগুলির প্রত্যেকটিই চীন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যের অংশ গ্রহণের সুযোগ লইয়াছিল। ইংলণ্ড চীনা বাণিজ্যের সর্বাধিক অংশ দখল করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বিদেশী বণিকদের চীন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

ইওরোপীয় দেশগুলি কর্তৃক চীনের অর্থ নৈতিক শোষণ

জনৈক ব্রিটিশ কন্‌সালকে হত্যা করিলে ব্রিটিশ সরকার সুযোগ পাইয়া চীন সরকারের উপর এক নূতন চুক্তির শর্ত চাপাইলেন। ইহা 'চিফু চুক্তি' (১৮৭৬) (Cheefoo Agreement) নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুসারে আরও চারিটি বন্দর বিদেশী বণিকদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ বাণিজ্য অধিকারও নানাভাবে বৃদ্ধি করা হইল।

ইওরোপীয় বণিকগণ চীন সাম্রাজ্যের অর্থ নৈতিক শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না। চীন সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অংশগুলি একে একে বিদেশীগণ কর্তৃক অধিকৃত হইল। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করিল, ফ্রান্স ইন্দোচীনে আনাম ও টন্‌কিন্ অধিকার করিল। ইংলণ্ড ব্রহ্মদেশ ও সিকিম দখল করিয়া লইল। এইভাবে

চীন সাম্রাজ্যাংশ অধিকার

চীনদেশের অধীন সাম্রাজ্যের অনেকাংশ বিদেশীদের হস্তগত হইল। এশিয়াস্থ দেশ জাপানও চীনগ্রাসে অগ্রসর হইল। জাপান কর্তৃক চীনগ্রাসের নীতি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সুদূর-প্রাচ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন এবং গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়; সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যা এক নূতন জটিলতায় জটিলতর হইয়া উঠে। ১৭৯৩ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদূর প্রাচ্যের সমস্যার প্রধান সমস্যা ও উদ্দেশ্য ছিল চীনদেশের অবগুণ্ঠন উন্মোচন এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুবিধা-সুযোগ আদায়। ১৮৬০ হইতে ১৮৯৫ পর্যন্ত সুদূর-প্রাচ্য সমস্যা তিনটি বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে (১) চীন ও জাপানে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির বাণিজ্য স্বার্থ বৃদ্ধির চেষ্টা, (২) চীন সাম্রাজ্য গ্রাসের প্রতিযোগিতা এবং চীন সাম্রাজ্যের অধীন বহু স্থান পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি কর্তৃক অধিকার, (৩) জাপানের উত্থান এবং চীনা সাম্রাজ্য গ্রাসে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সমধর্মী হইয়া উঠা—এই তিনটি কারণে সুদূর-প্রাচ্য সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল।

জাপানের উত্থানে নূতন জটিলতার সৃষ্টি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুদূর-প্রাচ্য সমস্যার জটিলতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপান পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সামরিক জ্ঞান লাভ করিয়া জাপান পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির ন্যায়ই এক সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্র-নীতি অনুসরণ করিল। ইওরোপীয় দেশগুলি যখন চীনদেশকে নিজ নিজ সুবিধামত চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করিতেছিল তখন জাপান যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়া চীনদেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ নীতি গ্রহণ করে। ইওরোপীয় দেশগুলির ন্যায়-ই জাপান চীনদেশের নিকট হইতে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিবার দাবি করে (১৮৭২)। চীন সাম্রাজ্যাধীন কোরিয়া রাজ্য জাপানের নিকট নিজ বন্দরগুলি উন্মুক্ত করিতে অস্বীকার করিলে জাপান কোরিয়ার বন্দরগুলি আক্রমণ করে। দুই বৎসর পর (১৮৭৪) জাপান ফরমোসা দ্বীপটি আক্রমণ করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনদেশ হইতে লুচু দ্বীপগুলি (Loochoo Islands) বলপূর্বক দখল করে। কিন্তু জাপানের দৃষ্টি ছিল কোরিয়ার উপর নিবদ্ধ। জাপানের নিরা-পত্তার দিক হইতেও কোরিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা এবং সেখানে জাপানী প্রাধান্য

জাপান কর্তৃক চীন সাম্রাজ্য-গ্রাস নীতি গ্রহণ

বিস্তার করা প্রয়োজন ছিল। কোরিয়া কোন ইওরোপীয় শক্তির হস্তে চলিয়া গেলে জাপানের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে এক প্রকার বিনা কারণেই যুদ্ধ শুরু করিল এবং চীনদেশকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়া শিমনোশেকির সন্ধি (Treaty of Shimonoseki) স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল (১৮৯৫)। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী চীনদেশ কোরিয়ার উপর আধিপত্য ত্যাগ করিল এবং ভবিষ্যতে কোরিয়ার উপর জাপানের অধিকার বিস্তৃতির পথ প্রস্তুত হইয়া রহিল। শিমনোশেকির সন্ধি দ্বারা জাপান সমগ্র লিয়াওটাং উপদ্বীপটি আত্মসাৎ করিতে চাহিলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপের ফলে উহা প্রতিহত হইল।

চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৫)
শিমনোশেকির সন্ধি

জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ দখল করিলে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ প্রসারের পথ বন্ধ হইত। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারে ইচ্ছুক ছিল। শিমনোশেকির সন্ধি দ্বারা লিয়াওটাং উপদ্বীপ জাপানের দখলে চলিয়া যাওয়াতে রাশিয়া জার্মানি ও ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে চীন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া জাপানকে বাধা দানে অগ্রসর হইল। এই তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মত সামর্থ্য জাপানের তখন ছিল না। সুতরাং তাহাদের হস্তক্ষেপের ফলে জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। কিন্তু জাপানকে চীন সাম্রাজ্য গ্রাসে বাধা দানের কালে চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার আগ্রহ ইওরোপীয় শক্তিবর্গ প্রদর্শন করিলেও ইহা নিছক স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবেই যে করা হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। চীন সাম্রাজ্যের তথাকথিত মিত্রদেশ রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানি জাপানের গ্রাস হইতে চীন সাম্রাজ্যাংশ রক্ষা করিবার পুরস্কার গ্রহণে অগ্রসর হইল। ফ্রান্স চীনদেশকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ঋণদানের বিনিময়ে নানাপ্রকার বাণিজ্য-সুযোগ আদায় করিয়া লইল। চীনদেশের রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনার যাবতীয় কার্যের দায়িত্ব ফ্রান্স গ্রহণ করিল। সাণ্টাং বন্দরে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দুইজন জার্মান ধর্মযাজকের হত্যাকাণ্ডের ফলে জার্মানি চীন সরকারের নিকট হইতে সুবিধা-সুযোগ আদায় করিয়া

চীন সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তার অজুহাতে রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ

চীন হইতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের প্রতিযোগিতা

লইল। সাণ্টাং বন্দরটি ও কয়াও-চাও জেলাটি ৯৯ বৎসরের জন্য দখলে রাখিবার অধিকার জার্মানি চীন সরকারের নিকট হইতে আদায় করিল। জার্মানির এইভাবে শক্তি বৃদ্ধি পাইলে অপরাপর ইওরোপীয় দেশ জার্মানির সহিত শক্তি-সাম্য বজায় রাখিবার অজুহাতে চীন সরকার হইতে নানা স্থান আদায় করিয়া লইল। ফ্রান্স কোয়াং চোয়াং ৯৯ বৎসরের জন্য দখল করিল এবং টনকিন্ ও য়ুনান নামক স্থানের যাবতীয় রেলপথ নির্মাণ ও উহার পরিচালনার ভার পাইল। রাশিয়া পোর্ট আর্থার ও টালিয়েন নামক স্থান দুইটি ২৫ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ভ্লাডিভস্টক্ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের অধিকার আদায় করিয়া লইল। রাশিয়া যত দিন পোর্ট আর্থার দখলে রাখিবে ততদিন ব্রিটেন ওয়ে-হাই-ওয়ে নামক স্থানের উপর আধিপত্য করিবার অধিকার আদায় করিল। জাপান চীন হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিল যে, ফুকিন (Fukein) অঞ্চলে অন্য কোন শক্তির প্রাধান্য স্থাপনে চীন সরকার রাজী হইবেন না। এইভাবে সাণ্টাং অঞ্চলে জার্মানি, ইয়াং সিকিয়াং উপত্যকায় ব্রিটেন, ফুকিন অঞ্চলে জাপান, টন্কিন, য়ুনান ও কোয়াং চোয়াং অঞ্চলে ফ্রান্স এবং মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়া অঞ্চলে রুশ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। জাপানকে শিমনোশেকির চুক্তির শর্তানুযায়ী চীন সাম্রাজ্যের অংশ দখল করিতে বাধা দেওয়ার পশ্চাতে ইওরোপীয় শক্তিবর্গের যে স্বার্থবুদ্ধি লুকায়িত ছিল তাহা চীন ও জাপানের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। চীন সাম্রাজ্য ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থলোলুপতার যূপকাষ্ঠে আহুত হইতে চলিল।

সাণ্টাং অঞ্চলে জার্মানি, ইয়াং সিকিয়াং অঞ্চলে ব্রিটেন, ফুকিন অঞ্চলে জাপান, মাঞ্চুরিয়া ও মোঙ্গোলিয়ায় রাশিয়া, কোয়াং চোয়াং, টন্কিন্, য়ুনান অঞ্চলে ফ্রান্সের প্রাধান্য স্থাপন

আমেরিকা চীনদেশের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নাই, উপরন্তু টেইপিং বিদ্রোহকালে সর্বপ্রথম আমেরিকা-ই চীন সরকারের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিল। পরবর্তী সময়েও অপরাপর ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যখন চীনদেশের সাম্রাজ্য দখল করিতে ব্যস্ত, তখনও আমেরিকা চীনদেশে বাণিজ্য করিবার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। আমেরিকা চীনদেশে extra-territorial rights অবশ্য ভোগ করিত। এই সকল কারণে আমেরিকা চীনদেশের

চীনদেশের সহিত মার্কিন বন্ধুত্ব

প্রকৃত মিত্রদেশ হিসাবে বিবেচিত হইত। আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধ এবং উহার পর আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব মার্কিন জাতিকে বহির্জগতে উপনিবেশ-বিস্তারে নিরস্ত রাখিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের সহিত যুদ্ধের ফলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিবার পর প্রশান্ত মহাসাগরে চীনদেশের ঔপনিবেশিক স্বার্থ বৃদ্ধি পাইল। ইহার পূর্বাবধি কেবলমাত্র বাণিজ্যস্বার্থ বৃদ্ধিই ছিল আমেরিকার সুদূর-প্রাচ্য নীতির মূল সূত্র। কিন্তু স্পেনের যুদ্ধের পর আমেরিকা এক অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইল। ইতিমধ্যে ইওরোপীয় দেশগুলি চীন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এমনভাবে ক্ষমতা বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল যাহার ফলে ঐ সকল দেশ ইচ্ছা করিলে চীনদেশে মার্কিন বাণিজ্যাধিকার একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে পারিত। সুতরাং মার্কিন সুদূর-প্রাচ্য নীতি সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিল। আমেরিকার সম্মুখে তখন তিনটি পন্থা উন্মুক্ত ছিল: (১) অপরাপর শক্তিগুলির সহিত চীন সাম্রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তারে অবতীর্ণ হওয়া, (২) চীন সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র বাণিজ্য-স্বার্থ বৃদ্ধি করা এবং সেই কারণে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করা, এবং (৩) চীন সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। চীন সাম্রাজ্যে মার্কিন উপনিবেশ বিস্তার ঐ সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্র-নীতি বহির্ভূত ছিল। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের ফলে ঐ নীতি কতকটা ব্যাহত হইয়াছিল বটে, কিন্তু চীনের অংশ দখল করিবার নীতি তখনও মার্কিন সরকার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।* সুতরাং আমেরিকা চীনদেশের নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ইওরোপীয় দেশগুলিকে চীনে 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' (Open door policy) অনুসরণের জন্য অনুরোধ জানাইল। মার্কিন প্রস্তাবে কোন বিদেশী বণিকের বিরুদ্ধে চীনা বাণিজ্যের বিষয়ে বৈষম্যমূলক নীতি গৃহীত হইবে না দাবি

আমেরিকা কর্তৃক চীনদেশে 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' গ্রহণের দাবি

ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক 'উন্মুক্ত দ্বার নীতি' স্বীকৃত

* "Consequently, for the United States to attempt to get a slice of the 'Chinese Melon' would have been for it to mak ea violent departure from its past policy. The departure would have been more marked if adopted in China than if adopted elsewhere, because after 1842 the government of the United States had almost uniformly urged the necessity of maintaining the territorial integrity of China." Vide Vinacke, p. 143.

করা হইল। একমাত্র রাশিয়া ভিন্ন অপরাপর সকল ইওরোপীয় দেশই আমেরিকা প্রস্তাবিত 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' স্বীকার করিল। রাশিয়া এই নীতি অগ্রাহ্য না করিলেও স্পষ্টভাবে উহা গ্রহণও করিল না।

মার্কিন নীতি গ্রহণের ফলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক চীন সাম্রাজ্যের আসন্ন ব্যবচ্ছেদ রোধ করা সম্ভব হইল।

বক্সার বিদ্রোহ (Boxer Rebellion): আমেরিকার চেষ্টায় ইওরোপীয় শক্তিবর্গ কর্তৃক চীনদেশ আত্মসাৎ করিবার হীন স্বার্থপর প্রতিযোগিতা কতক পরিমাণে হ্রাস পাইল। চীনদেশের লৌহ-অবগুণ্ঠন অবশ্য সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হইয়া চীনদেশ ইওরোপীয় দেশগুলির শোষণের জন্য উন্মুক্ত হইল। কিন্তু এই শোষণ নীতির বিরোধিতা চীনাবাসীর মধ্যে ক্রমেই প্রকাশ্য বিদ্রোহে রূপলাভ করিতে চলিল।

ইওরোপীয়দের প্রতি চীনাবাসীর বিরোধিতা

মাঞ্চু বংশের শাসনের অক্ষমতা ও দুর্বলতা বিদেশীদের চীনদেশ গ্রাস নীতির সহায়ক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। স্বভাবতই বিদেশীদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চু বংশের পতন ঘটাইবার ইচ্ছাও জাগিল। 'মুষ্টি যোদ্ধা' (Boxers or Fist-Fighters) নামে এক গোপন সমিতি গড়িয়া উঠিল। এই বিদ্রোহী সঙ্ঘ বিদেশী শোষণ এবং বিদেশীয়দের অনুকরণে চীন সাম্রাজ্যে সম্রাট কোয়াং-সু (Kwang-Hsu) প্রবর্তিত সংস্কার—অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিদেশীয় প্রভাবের অবসানকল্পে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে (১৮৯৮) জু-সি (Tzu-Hsi) নামে বিধবা সম্রাজ্ঞী সম্রাট কোয়াং-সু'কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজ হস্তে শাসনকার্য গ্রহণ করিলেন। তিনি বিদেশীয়দের অনুকরণে প্রবর্তিত যাবতীয় সংস্কার নাকচ করিয়া এক অতিশয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিলেন। মাঞ্চু বংশের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে দারুণ বিদ্রোহভাব জাগিয়াছিল তাহা হ্রাস করিবার উপায় হিসাবে তিনি বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে দেশবাসীর স্বাভাবিক বিদ্রোহভাবের সমর্থন করিতে লাগিলেন।

'বক্সার' গোপন সমিতি গঠন

সম্রাজ্ঞী জু-সি-এর সহায়তা

বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে চীনাবাসীর প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় চীন যুদ্ধের পর হইতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঐ যুদ্ধের পর ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মান ধর্মযাজকগণ অধিকতর উৎসাহ সহকারে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। চীনবাসিগণ এই সকল ধর্মযাজককে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্র প্রস্তুত-

কারক বলিয়া মনে করিত। বিদেশী খ্রীষ্ট ধর্মযাজকদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ তীব্র আকার ধারণ করে। বিদেশী ধর্মযাজকদের হত্যাকাণ্ডে এই বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়।

বক্সার বিদ্রোহ (১৯০০)

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার বিদ্রোহ চরমে পৌঁছে। চীনদেশের নানা স্থানে শত শত ইওরোপীয় ধর্মযাজককে হত্যা করা হয়। জার্মানির একজন পদস্থ কর্মচারীকে পিকিং-এর রাস্তায় হত্যা করা হয়। বিদেশী দুতাবাসগুলি বিদ্রোহী জনতা কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়। প্রায় দুই মাস এই সকল দুতাবাসের কর্মচারিগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবার পর এক আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী পিকিং-এ উপস্থিত হইয়া দুতগণকে অবরোধ-মুক্ত করে। আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞী জু-সি ও তাঁহার সভাসদ্‌গণ পিকিং ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনী চীনা বিদ্রোহী এবং বিদেশীয় সৈন্যদের দমন করিয়া শান্তিশৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপন করিল।

আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী কর্তৃক বিদ্রোহ দমন

ঐ সময়ে চীনদেশের আভ্যন্তরীণ দুরবস্থা চরমে পৌঁছিয়াছিল। চীন সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদের শ্রেষ্ঠ সুযোগ তখনই উপস্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। আমেরিকা নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি'র সমর্থন এবং চীন সাম্রাজ্যের সংহতি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিল (১৯০০)। ঐ বৎসরই ইংলণ্ড ও জার্মানি চীন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা ও অব্যবস্থার সুযোগে নিজ নিজ উপনিবেশ বিস্তার করিবে না বলিয়া চুক্তিবদ্ধ হইল এবং অপর কোন শক্তি চীন সাম্রাজ্য-গ্রাস নীতি অবলম্বন করিলে উভয়ে মিলিয়া উহা প্রতিরোধ করিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইল।

আমেরিকা কর্তৃক 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' পুনঃ সমর্থন

চীনদেশের ব্যবচ্ছেদ রোধ হইল বটে, কিন্তু ইওরোপীয় শক্তিমাত্রেই চীনা সরকারের নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ এবং বাণিজ্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া লইল। ইহা ভিন্ন উত্তর চীনে, পিকিং-তিয়েনসিন রেলপথে এবং বিদেশীয় দুতাবাসে ইওরোপীয় সৈন্য মোতায়েন করিবার অধিকার চীনা সরকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। বক্সার বিদ্রোহ এইভাবে বিফলতায় পর্যবসিত হইল বটে, কিন্তু চীনবাসীদের মধ্যে বিদেশীয়দের শোষণের বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতেছিল তাহার পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যায়।

ইওরোপীয় দেশ কর্তৃক চীন হইতে ক্ষতিপূরণ ও নানা-প্রকার সুযোগ গ্রহণ

আমেরিকা কর্তৃক সমাথত 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' এবং ইঙ্গ-জার্মান চুক্তি ভিন্ন অপর একটি কারণেও চীনদেশের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজন হইল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া চীনদেশের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া জাপানকে শিমনোশেকির সন্ধির শর্তানুযায়ী সুবিধা ভোগ করিতে দেয় নাই। কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরই (১৮৯৭) রাশিয়া পোর্ট আর্থার দখল করিয়া লইয়াছিল। ইহা ভিন্ন মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ভ্লাডিভস্টক্ ও পোর্ট আর্থার পর্যন্ত ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মাণের অধিকার আদায় করিয়াছিল। রাশিয়ার ক্রম-বিস্তার ইংলণ্ড ও জাপানের ছিল স্বার্থবিরোধী। সুতরাং বক্সারের বিদ্রোহের সুযোগে রাশিয়া সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া লইল এবং মাঞ্চুরিয়ার উপর সামরিক শাসন স্থাপনের অধিকার দাবী করিল। তখন ইওরোপীয় শক্তিবর্গের তীব্র বিরোধিতায় সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ইংলণ্ড ও জাপান চীনদেশে নিজ স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এক ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি স্বাক্ষর করিল। ইহা দ্বারা চীনদেশের নিরাপত্তা ও 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' রক্ষা করা হইবে এই স্বীকৃতি দান করা হইল এবং যুদ্ধ বাধিলে পরস্পর পরস্পরকে সামরিক সহায়তা দান করিবে স্থির হইল। ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি পরোক্ষভাবে চীনদেশের সংহতি রক্ষার সহায়ক হইয়াছিল। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হইয়া মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু রাশিয়াকে বিতাড়িত করিবার পশ্চাতে জাপানের নিজ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় ছিল বলা বাহুল্য। এইভাবে বিভিন্ন দেশের স্বার্থের বিরোধিতার ফলে চীনদেশ সাময়িকভাবে রাশিয়ার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেও জাপান ক্রমেই চীনদেশ দখলে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করিয়া লইল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে 'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands) নামে একুশটি ভিন্ন ভিন্ন দাবি চীনদেশের নিকট উত্থাপন করিল।

রাশিয়ার চীন সাম্রাজ্য-গ্রাস নীতি

ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি (১৯০২) : চীন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা নীতি গৃহীত

জাপান কর্তৃক কোরিয়া দখল (১৯১০)

চীনের বিপ্লব (The Chinese Revolution) : বক্সার বিদ্রোহে বিদেশী বিতাড়নের এবং অকর্মণ্য মাঞ্চুবংশকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার যে মনোভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা বক্সার বিদ্রোহের বিফলতার সঙ্গে সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার অকর্মণ্যতা দিন দিনই চীনাবাসীদের

মধ্যে মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহী ভাবের সৃষ্টি করিল। মাঞ্চুবংশের রাজত্বকালের দুর্বলতার সুযোগেই বিদেশীরা চীনদেশকে তাহাদের বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুবংশীয় সম্রাজ্ঞী জু-সি চীনাবাসীদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবকে ইওরোপীয়দের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া সাময়িকভাবে মাঞ্চুবংশকে বাঁচাইয়াছিলেন। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের হস্তে চীনের পরাজয় এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের উত্থানের দৃষ্টান্ত দেখিয়া চীনাজাতির মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবাদের উদ্রেক হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই চীনাবাসীর মধ্যে সংস্কারের ব্যাপক দাবি উত্থিত হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই দাবি শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই সময়ে সম্রাজ্ঞী জু-সি কতকগুলি সংস্কার সাধন করিয়া মাঞ্চুশাসনকে জাতীয়তা-বাদী প্রতিক্রিয়া হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন, শিক্ষায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি, শাসনসংস্কার সাধন করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে চাহিলেন। এমন কি তিনি জাতীয় প্রতিনিধিবর্গের একটি পার্লামেণ্ট স্থাপন করিয়া চীনদেশে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা স্থাপনের প্রতিশ্রুতিও দান করিলেন। ইওরোপের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য একটি কমিশনও তিনি প্রেরণ করেন। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন মাঞ্চুবংশের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরই (১৯০৮) মাঞ্চুশাসনের অবসান ঘটে।

মাঞ্চুবংশের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

সম্রাজ্ঞী জু-সি-এর সংস্কার কার্য

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই চীনের উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে সংস্কার-নীতি সম্পর্কে বিভেদের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণাঞ্চলের চীনাগণ ছিল প্রজাতান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী। তাহারা মাঞ্চুবংশের অবসান করিয়া প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা কুয়োমিং-তাং (Kuoming-tang) বা প্রজা-তান্ত্রিক বিপ্লবী দল গঠন করিয়া মাঞ্চুবংশের উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। সুন্-ইয়াৎ-সেন নামে একজন ডাক্তার এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ক্যাণ্টন ছিল কুয়োমিং-তাং দলের কর্মকেন্দ্র। মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য শুরু হইলে সরকার পক্ষ জাতীয় সভা আহ্বান করিতে রাজী হইলেন। কিন্তু সুন্-ইয়াৎ-সেন মাঞ্চুশাসনের

ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেন ও কুয়োমিং-তাং দল

সহিত কোন প্রকার মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সুন্-ইয়াৎ-সেনের জাতীয়তাবাদী দল মাঞ্চুবংশের শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা নানকিং দখল করিয়া সেখানে এক অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করিল। সুন্-ইয়াৎ-সেন হইলেন এই অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেণ্ট। ঐ সময়ে মাঞ্চুবংশের এক নাবালক সম্রাট চীন সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিপ্লব ব্যাপকতা লাভ করিলে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিলেন (১৯১২)। চীনদেশ প্রজাতান্ত্রিক দেশ বলিয়া ঘোষিত হইল।

মাঞ্চুশাসনের অবসান : চীনদেশ প্রজাতন্ত্রে পরিণত

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেন প্রেসিডেণ্ট-পদ ত্যাগ করিলেন এবং জেনারেল য়ুয়ান্-শি-কাই (Yuan-shi-kai) প্রেসিডেণ্ট-পদে স্থাপিত হইলেন। য়ুয়ান্-শি-কাই ছিলেন একজন অতিশয় শক্তিশালী সামরিক নেতা এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন কূটকৌশলী। সুন্-ইয়াৎ-সেন মনে করিয়াছিলেন যে, য়ুয়ান্-শি-কাই-এর ন্যায় দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তির হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইলে প্রজাতন্ত্র স্থায়ী এবং শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু য়ুয়ান্-শি-কাই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলে সুন্-ইয়াৎ-সেনের সেই আশা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল। বিদেশী বণিকদের নানা প্রকার সুবিধা-সুযোগ দান করিয়া তিনি তাহাদের সহায়তা লাভে সমর্থ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল নিজে সম্রাটসুলভ ক্ষমতা অর্জন করিয়া একটি নূতন রাজবংশের পত্তন করিবেন। য়ুয়ান্ চীনদেশে রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তনের জন্য জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান্-শি-কাই-এর স্বার্থপরতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসর হইতেই ইওরোপীয় দেশগুলি পরস্পর সামরিক প্রস্তুতির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই সুযোগে রাশিয়া ও জাপানের পক্ষে চীনদেশে অধিকার বিস্তার সহজ হইল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে চীন বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই রাশিয়া বহির্মঙ্গোলিয়া (Outer Mongolia) চীন সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রুশ সামরিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বাধীনে এক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করিল। চীনদেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বলা বাহুল্য। ইওরোপীয় অপরাপর দেশগুলি চীনদেশকে ঋণ দান করিয়া আভ্যন্তরীণ অবস্থায়

পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতে চাহিল বটে, কিন্তু প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে রাশিয়া সহ ইওরোপীয় শক্তিবর্গ লিপ্ত হওয়াতে চীনদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলিবার নীতি কার্যকরী করা সম্ভব হইল না। স্বভাবতই জাপানের পক্ষে চীনগ্রাসের চরম সুযোগ উপস্থিত হইল।

রাশিয়া ও জাপানের সাম্রাজ্য গ্রাসের সুযোগ

জাপান ইওরোপের পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীন সাম্রাজ্যে জার্মান অধিকৃত সাণ্টাং অঞ্চল দখল করিল এবং জার্মানির অপরাপর অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও আত্মসাৎ করিল। ইহা ভিন্ন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন সরকারের নিকট 'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands) নামে এক দীর্ঘ দাবি-পত্র উপস্থিত করিল। এই একুশটি দাবি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। 'এই সকল দাবিতে চীনদেশের বিভিন্ন স্থান দখল করিবার প্রস্তাব হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকার বাণিজ্য সুযোগ-সুবিধা, জাপান হইতে চীনদেশের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় প্রভৃতি নানা প্রকার প্রস্তাব ছিল। এগুলি স্বীকার করিয়া লইলে চীনদেশ জাপানের তাঁবেদার রাজ্যে পরিণত হইত বলা বাহুল্য। ঐ সময়ে চীনদেশের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন য়ুয়ান্-শি-কাই। জাপান য়ুয়ান্ শি-কাইকে তাঁহার সম্রাট-পদ লাভে সাহায্য দান করিবে এই প্রলোভন দেখাইল। ইহা ভিন্ন 'একুশ দাবি' স্বীকার না করিলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভয়ও দেখান হইল। য়ুয়ান্-শি-কাই প্রায় সব কয়টি দাবিই স্বীকার করিয়া লইলেন। কেবল মাত্র যে সকল দাবি স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব বিলোপের সম্ভাবনা ছিল সেগুলি ভবিষ্যতে বিচার-বিবেচনার জন্য স্থগিত রাখা হইয়াছিল। এইভাবে জাপান চীনদেশের এক বিরাট অংশের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হইল। য়ুয়ান্-শি-কাই-ও মৃত্যুর সামান্য পূর্বে হাং-সিয়েন (Hung Shien) নামে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। অল্পকালের মধ্যে (১৯১৬) য়ুয়ানের মৃত্যু ঘটিলে চীনা প্রজাতন্ত্র রক্ষা পাইল।

'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands)

আমেরিকা এবং ইওরোপীয় শক্তিবর্গ পূর্বে চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল বটে কিন্তু জাপান যখন 'একুশ দাবি' চীনদেশকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল তখন কেহ-ই চীনদেশের সাহায্যে অগ্রসর হইল না। জাপান মিত্রপক্ষকে সাহায্য দানের বিনিময়ে 'একুশ দাবির' সমর্থন লাভ করিল। চীনদেশের

ইওরোপীয় শক্তি ও আমেরিকা কর্তৃক জাপানের দাবি সমর্থন

সংহতি রক্ষা নীতির সমর্থক আমেরিকার সহিত জাপানের লান্‌সিং-ইশাই (Lansing Ishii) চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে মার্কিন সরকারের চীন সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার নীতি যে কেবল স্তোকবাক্য তাহা প্রমাণিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা আমেরিকা সাণ্টাং-এর উপর জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লইল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও আমেরিকার এই আচরণের পশ্চাতে একমাত্র যুক্তি ছিল এই যে, তাহারা তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ লইয়া জাপান চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইবে এই ভয় চীনা সরকারের প্রথম হইতেই ছিল। সুতরাং মিত্রপক্ষে যোগদান করিয়া জাপানের সুযোগ নাশ করিবার ইচ্ছায়-ই চীন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু জাপানের বাধাদানে এবং মিত্রপক্ষ চীনদেশের যুদ্ধে যোগদানে তাহাদের হস্ত দৃঢ়তর হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া চীন সরকারের যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তাব তেমন গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু জাপান 'একুশ দাবি' দ্বারা সাণ্টাং অঞ্চল এবং জার্মানির অপরাপর সুযোগ-সুবিধা আত্মসাৎ করিবার পর চীনদেশও জার্মানির শত্রুদেশে পরিণত হউক ইহাই চাহিল। কারণ চীন ও জার্মানির সদ্ভাব জাপানের সাণ্টাং দখল করিয়া রাখিবার পরিপন্থী হইতে পারে এই ভয় জাপানের ছিল। ইহা ভিন্ন যুদ্ধাবসানে শান্তি সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ-সুবিধাও যথেষ্ট রহিয়াছে এই কথা আমেরিকা চীন সরকারকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিল। ফলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৪ আগস্ট) চীনদেশ জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মিত্রপক্ষ চীনদেশের এই সহায়তার জন্য কোন পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিল না। তবে বক্সার বিদ্রোহের জন্য যে ক্ষতিপূরণ চীন-দেশের দেওয়ার কথা ছিল, সেই ক্ষতিপূরণের বাকি অংশ চীনকে দিতে হইবে না ও যুদ্ধের পর বিদেশী বণিকগণ কত শুল্ক দিবে সেই প্রশ্ন পুনঃ বিবেচনা করা হইবে এইটুকু আশা চীনকে দেওয়া হইল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও চীন

চীনের যুদ্ধ ঘোষণা

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের পূর্বে আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রেসিডেন্ট উইল্‌সনের 'চৌদ্দ দফা শর্ত' (Fourteen Points) ও স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি সম্পর্কে যে সকল বক্তৃতা দেওয়া হইতেছিল তাহাতে চীনবাসীর মনে কতকটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে চীনা প্রতিনিধি সাণ্টাং

চীনদেশকে ফিরাইয়া দেওয়া, বিদেশী প্রাধান্যের অবসান, বিদেশী সৈন্যের অপসারণ, শুল্ক স্থাপনের ব্যাপারে চীনা সরকারের চরম অধিকার, বিদেশীদের 'অতি-রাষ্ট্রীয় অধিকার' (extra-territorial rights)-এর অবসান দাবি করিল। কিন্তু জাপানের প্রতিনিধি সম্মেলন ত্যাগ করিবে বলিয়া হুমকি প্রদর্শন করিলে শেষ পর্যন্ত সাণ্টং-এর অধিকার জাপানকে দেওয়া হইল। চীনদেশের অপরাপর দাবিও সম্মেলনের সম্মুখীন সমস্যার পক্ষে অবান্তর বিবেচনায় অগ্রাহ্য করা হইল। চীনা প্রতিনিধি প্রায় শূন্য হস্তেই প্যারিস সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার ফলে চীনদেশ আন্তর্জাতিক সন্ধি বর্জন করিল।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে চীনের স্বার্থ অবহেলিত

প্যারিস সম্মেলনে চীনদেশের স্বার্থের প্রতি এইরূপ অবহেলা প্রদর্শনের ফল-স্বরূপ চীনা জাতির মধ্যে ইওরোপীয়দের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। জাপানের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন শুরু হইল, জাপানী সামগ্রী চীনদেশে বর্জন করা হইল। এমতাবস্থায় জাপানের বাণিজ্য-স্বার্থ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলে জাপান চীনদেশের সহিত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে চাহিল। চীন সরকার কোন প্রকার মীমাংসার পূর্বে সাণ্টাং ফেরৎ চাহিলেন। এইভাবে উভয় সরকারের মধ্যে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট হার্ডিং ওয়াশিংটনের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের, সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যা এবং নৌশক্তি হ্রাসের প্রশ্ন বিবেচনা করিবার জন্য এক সম্মেলন (Washington Conference) আহ্বান করেন।

চীনে ইওরোপীয় ও জাপান বিরোধী আন্দোলন

জাপানের সহিত

ওয়াশিংটন সম্মেলন (১৯২১-২২)

ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনদেশের 'উন্মুক্ত-দ্বার নীতি' পুনরায় স্বীকার করা হইল। বিদেশী শক্তিবর্গ কর্তৃক চীনদেশের বিভিন্ন অংশকে 'প্রভাবিত অঞ্চল' (Sphere of influence) বলিয়া বিবেচনা করা নিষিদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময় চীনদেশকে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে বিবেচনা করিবার নীতি গৃহীত হইল। জাপানকে একটি ভিন্ন চুক্তি দ্বারা কিয়াও-চাও এবং সাণ্টাং-এর জার্মানির সর্ব প্রকার অধিকার চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল। শুল্ক নির্ধারণ নীতি প্রভৃতি আরও কয়েকটি অধিকারও চীনদেশ ফিরিয়া পাইল। ওয়াশিংটন সম্মেলনে চীনের আন্তর্জাতিক মর্যাদা

চীনের লাভ

চীনদেশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা স্বীকৃত : চীনের স্বাধীনতার ইতিহাসের সূচনা

কতক পরিমাণে স্বীকৃত হইল। ঐ সময় হইতেই চীনদেশে বিদেশী প্রাধান্য অবসানের প্রকৃত ইতিহাসের সূচনা হইল।

সুন্-ইয়াৎ-সেন (Sun-Yat-Sen) : চীনের জাতীয় জীবনে যখন ঘোর দুর্দিন দেখা দিয়াছিল তখন সুন্-ইয়াৎ-সেন নামে জনৈক দেশপ্রেমিক দক্ষিণ-চীনে কুয়োমিং-তাং নামে এক প্রজাতান্ত্রিক দল গঠন করিয়া বিভ্রান্ত চীনাবাসীকে জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সুন-ইয়াৎ-সেন ছিলেন একজন ডাক্তার। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তিনি একজন বিপ্লবী হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী জু-সি (Tzu-Hsi)-এর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে উত্তর ও দক্ষিণ চীনের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ঐ সময় সুন্-ইয়াৎ-সেন কুয়োমিং-তাং নামক এক প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবী দল গঠন করিয়া মাঞ্চুবংশের শাসনের অবসানের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার নেতৃত্বেই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিং-তাং নামক জাতীয়তাবাদী দল সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। তাহারা নানকিং দখল করিয়া সেখানে এক নূতন প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিল। ডাক্তার সুন্-ইয়াৎ-সেনকে এই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হইল। পর বৎসর (১৯১২) মাঞ্চুবংশের সর্বশেষ সম্রাট পদত্যাগ করিলে সমগ্র চীনদেশ প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হইল।

সুন্-ইয়াৎ-সেন ও কুয়োমিং-তাং বা জাতীয়তাবাদী দল : ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব

সুন্-ইয়াৎ-সেন ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক। দেশের মঙ্গলসাধনই ছিল তাঁহার একমাত্র ব্রত। এইজন্য ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেনারেল য়ুয়ান্-শি-কাই-এর স্বপক্ষে প্রেসিডেন্ট-পদ ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, য়ুয়ান-শি-কাই-এর ন্যায় দৃঢ়চেতা সামরিক সংগঠকের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিলে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু য়ুয়ান্ নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হইলে সুন্-ইয়াৎ-সেন পুনরায় এক বিরোধী প্রজাতান্ত্রিক দল গঠন করিলেন। দক্ষিণ-চীনে প্রজাতান্ত্রিক শাসন স্থাপনের জন্য তিনি আন্দোলন শুরু করিলেন। রাজতন্ত্রের সমর্থক ও স্বার্থপর সামন্তগণের বিরুদ্ধে তিনি অক্লান্তভাবে যুঝিয়া চলিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদী দল ক্যান্টনে এক নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিল।

য়ুয়ান্-শি-কাই-এর স্বার্থপরতা : সুন্-ইয়াৎ-সেনের বিরোধিতা

সুন্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক দল তিনটি বিশেষ আদর্শের উপর

নির্ভর করিয়া চীনকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল। এই তিনটি আদর্শের বিশ্লেষণ সুন্‌-ইয়াৎ-সেন নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। "আমাদের দেশের মুক্তি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা চাই শান্তি, সাম্রাজ্যবাদী বিস্তার নহে।" তিনি দক্ষিণ-চীনের সামরিক নেতৃবর্গের সাহায্যে তাঁহার জাতীয়তাবাদী কুয়োমিং-তাং দলকে এক শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করিলেন। তাঁহার এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট হইতে কোন সাহায্য পাইলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে রুশ-বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। রাশিয়া সুন্‌-ইয়াৎ-সেনকে তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সাহায্য দান করিল। সুন্‌-ইয়াৎ-সেন ইওরোপীয় দেশগুলি চীন হইতে যে-সকল অ-ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা. অতি-রাষ্ট্রীয় অধিকার বা extra-territorial rights আদায় করিয়াছিল সেগুলি নাকচ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইওরোপীয় শক্তিবর্গের সহিত তিনি সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদনের নীতি গ্রহণ করিলেন। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় তিনি গণতন্ত্র কার্যকরী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি কৃষি ও শিল্পের উৎসাহ দান করিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিং-তাং দলের এক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইহাতে কুয়োমিং-তাং-এর সভ্যপদ চীনা কমিউনিস্ট্‌দের মধ্যে যাহারা কুয়োমিং-তাং নীতিতে বিশ্বাসী তাহাদের নিকট উন্মুক্ত করা হইল। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পূর্বেই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সুন্‌-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের ভার পড়িল তাঁহারই শিষ্য চিয়াং-কাই-শেক-এর উপর। চিয়াং-এর আমলে রাশিয়ার সাহায্যে হাংকাও, নানকিন্‌, সাংহাই ও পিকিং প্রভৃতি স্থান জাতীয়তাবাদী চীনের অধীনে আনা হইল।

সুন্‌-ইয়াৎ-সেনের নীতি: জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জাতিক শান্তি

জাতীয়তাবাদী চীনের রুশ সাহায্য লাভ

চীনদেশের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে সুন্‌-ইয়াৎ-সেনের অমর দান রহিয়াছে। তাঁহারই নেতৃত্বে চীনের অকর্মণ্য মাঞ্চুশাসনের অবসান ঘটিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পরিকল্পিত তাঁহার কর্মপন্থা চীনাবাসীর মনে এক

সুন্‌-ইয়াৎ-সেনের দান

গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি চীনের জাতীয়তার উৎসস্বরূপ।

১৯২৫-১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীন (China from 1925-1939): সুন্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পূর্বেই কুয়োমিং-তাং দলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেয়। বামপন্থী দল কমিউনিস্ট্ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল, অপর দিকে দক্ষিণপন্থী দল কমিউনিস্ট্ নীতিবিরোধী ছিল এবং রাশিয়ার সহিত মৈত্রী অবসানের পক্ষপাতী ছিল। সুন্-ইয়াৎ-সেনের জীবদ্দশায় দুই দলের বিভেদ প্রকাশ্য বিরোধে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সুন-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং-কাই-শেক রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ত্যাগ করিয়া কুয়োমিং-তাং-এর কমিউনিস্ট্ সদস্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার শুরু করিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই অবশ্য চিয়াং-কাই-শেক সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রায় সমগ্র চীনদেশ কুয়োমিং-তাং-শাসনে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি রাশিয়ার সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই (১৯২৭) তিনি রাশিয়ার সহিত মৈত্রী ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে বল্‌শেভিক প্রচারকগণ কর্তৃক চীনদেশে কমিউনিস্ট্ মতবাদ প্রচার লইয়া চীন ও রাশিয়ার মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্‌দের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে চীনের ঐক্য বিধানের জন্য জাতীয়তা-বাদী দল (কুয়োমিং-তাং) নান্‌কিং দখল করিলে কমিউনিস্ট্‌গণ বিদেশী দূতাবাস ও বিদেশীয়দের সম্পত্তি আক্রমণ ও লুঠ করিল। এই বিষয় লইয়া বিদেশী সরকারগুলির সহিত চীন সরকারের গোলযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা চীন সরকারের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ দাবি করিল। জাপান নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে চীনের অভ্যন্তরে কয়েক হাজার সৈন্য প্রেরণ করিল। এমতাবস্থায় বিদেশীয় বণিকদের সহায়তায় চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্ট্‌দের দমনে কতকটা কৃতকার্য হইলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিকিং দখল করিয়া উত্তরাঞ্চলের পৃথক সরকারের উচ্ছেদসাধন করিলেন। নান্‌কিং ঐক্যবদ্ধ চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের রাজধানী হইল। ঐ বৎসরই কুয়োমিং-তাং কার্যনির্বাহক সমিতি (Kuoming-tang Executive Committee) আইন প্রণয়ন করিয়া এক জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। এই নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী

কুয়োমিং-তাং কার্যনির্বাহক সমিতি-ই চীনের প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সমিতির নির্দেশাধীনে দেশের সর্বোচ্চ শাসনভার দেওয়া হইল স্টেট্‌ কাউন্সিল (State Council)-এর উপর। চিয়াং-কাই-শেক এই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইলেন। চেয়ারম্যানই চীনের প্রেসিডেণ্ট নামে সর্বসাধারণ্যে পরিচয় লাভ করিলেন। এই বৎসরই (১৯২৮) চিয়াং-কাই-শেক নানকিং ঘটনায় (Nanking Affairs) ক্ষতিগ্রস্ত বিদেশী সরকারগুলিকে ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইলে ইওরোপীয় শক্তিবর্গ ও জাপান চিয়াং-কাই-শেকের শাসনব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকার করিয়া লইল।

সমগ্র চীনে জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থা স্থাপন: চিয়াং-কাই-শেক চেয়ারম্যান নির্বাচিত

চিয়াং-কাই-শেক চীনের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নকার্যে মার্কিন ও জার্মান সরকারের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তখনও বামপন্থীদের আন্দোলনের অবসান না হওয়ায় তাঁহাকে প্রায়ই যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইল। ইহা ভিন্ন দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্লাবন প্রভৃতির ফলে জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে চিয়াং-কাই-শেকের শাসনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট্‌দের প্রচারকার্য সহজ হইল। তাহারা চিয়াং-এর জাতীয়তাবাদী শাসনব্যবস্থার অনুরূপ শাসন স্থাপন করিতে চাহিল। কমিউনিস্ট্‌পন্থিগণ ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকার দক্ষিণাংশে সোভিয়েট পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা স্থাপনে সমর্থ হইলে চিয়াং-কাই-শেক তাহাদের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। অপর দিকে এই অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া চীনের কোন কোন সামরিক নেতাও স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতে সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে (১৯২৯) রাশিয়ার সহিত চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের এক তীব্র মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল। অবশেষে খাবারোভ্‌স্ক প্রটোকোল (Khabarovsk Protocol) দ্বারা এই বিবাদের মীমাংসার জন্য একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বান করা স্থির হইল। এই বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্বেই জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল (সেপ্টেম্বর, ১৯৩১)।

আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা: কমিউনিস্ট্‌ আন্দোলনের প্রসার

দক্ষিণ ইয়াং-সিকিয়াং উপত্যকায় কমিউনিস্ট্‌ প্রাধান্য

জাতীয়তাবাদী চীন ও রাশিয়ার বিরোধ

মাঞ্চুরিয়া চীনদেশের একটি অতিশয় বর্ধিষ্ণু ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত

অংশ ছিল। চীনদেশের মোট রপ্তানির এক-তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র মাঞ্চুরিয়া হইতেই প্রেরণ করা হইত। ইহা ভিন্ন জাতীয়তাবাদী সরকার মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলকে চীনদেশের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি হিসাবে বিবেচনা করিতেন। ঐ স্থানের মোট বাসিন্দার শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি ছিল চীনা জাতির লোক। অপর দিকে মাঞ্চুরিয়ায় বিদেশী সরকারগুলির, বিশেষতঃ রাশিয়া ও জাপানের অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। রাশিয়ার সাইবেরিয়া-ভ্লাডিভস্টক রেলপথ মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা ভিন্ন মাঞ্চুরিয়ার পশ্চিম বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর রাশিয়ার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ ছিল জাপানের অধীনে। মাঞ্চুরিয়ার অধিকাংশ রপ্তানি দ্রব্যাদি জাপানী-অধিকৃত দাইরেন (Dairen) বন্দর দিয়া প্রেরণ করা হইত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বৎসর জাপানের এক আশাতীত অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন সাধিত হয়। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমগ্র পৃথিবীতে এক অর্থনৈতিক অবনতি দেখা দিলে জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনও বাধাপ্রাপ্ত হইল। সেই স্থলে দেখা দিল বেকারত্ব ও আর্থিক দুর্দশা।

মাঞ্চুরিয়ার গুরুত্ব

এমতাবস্থায় জাপান মাঞ্চুরিয়ার পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া এই অর্থনৈতিক দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'একুশ দাবি'র যে-সকল দাবি অপূর্ণ রহিয়াছিল সেইগুলি জাপান এখন (১৯৩১) দাবি করিল।

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়ার অর্থনৈতিক শোষণ

এদিকে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জাতীয়তাবাদী সরকার ও কমিউনিস্টদের পরস্পর বিরোধে তখন অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী তখন অনাহারে, অর্ধাহারে দিন যাপন করিতেছে। স্বভাবতই জাপান এইরূপ অবস্থায় চীনের বিরুদ্ধে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অগ্রসর হওয়ার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিল। মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের অজুহাতও পাওয়া গেল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে আভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় (Inner Mongolia) একজন জাপানী ক্যাপ্টেনকে হত্যা করা হইল এবং এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জাপানী সম্পত্তি সাউথ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের একাংশ বিস্ফোরক দ্বারা বিনষ্ট করা হইলে জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিল। চীনদেশ লীগ-অব-ন্যাশন্‌স ও মার্কিন সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করিতে

করিতেই জাপান মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী ব্যবসায়ের নিরাপত্তার দোহাই দিয়া মাঞ্চুরিয়ার উপর অধিকার বিস্তার করিয়া লইল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী প্রাধান্যাধীনে মাঞ্চুরিয়াকে 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে এক স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত করা হইল। এই নবগঠিত রাজ্যের রাজধানী হইল সিং কিং (Hsing King)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ার মুক্‌ডেন ও অপরাপর শহর দখল করিতে আরম্ভ করিলে চীনদেশে এক জাপান-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হইল। চীনবাসীরা জাপানী দ্রব্যাদি বর্জন করিল। জাপানী সামগ্রীর দ্বিতীয় বৃহৎ ক্রেতা-দেশ ছিল চীন। সুতরাং চীনদেশের জাপানী সামগ্রী বর্জনের ফলে জাপানী বাণিজ্য-স্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সাংহাই-এ অবস্থিত জাপানী বণিকগণ জাপান সরকারকে নৌবলের সাহায্যে সাংহাইয়ের চীনাদের জাপান-বিরোধী আন্দোলন দমন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। জাপান সাগ্রহে একটি নৌবাহিনী সাংহাই বন্দরে প্রেরণ করিলে চীনবাসীরা সেই নৌবাহিনীর উপর গোলাবর্ষণ করিল। জাপান ইহাকে চীনদেশের আক্রমণাত্মক আচরণ (!) বলিয়া বর্ণনা করিয়া পৃথিবীর জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে লীগ-অব ন্যাশন্‌স চীন-জাপানী বিরোধের মীমাংসাকল্পে লর্ড লিটনের নেতৃত্বে এক আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করিল। লিটন্ কমিশন মাঞ্চুরিয়ায় চীনের প্রাধান্যাধীনে একটি স্বায়ত্ত-শাসিত রাজ্য স্থাপনের সুপারিশ করিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স লিটন্ কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে অপর একটি কমিশন নিয়োগ করিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স যখন কমিশনের পর কমিশন নিয়োগ করিয়া চীন-জাপানী বিবাদের মীমাংসার উপায় নির্ধারণে কালক্ষেপ করিতেছিল তখন জাপান উত্তর-চীনের বহু স্থান দখল করিয়া লইয়াছিল। ঐ বৎসরই জাপান লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের সদস্যপদ ত্যাগ করে। এদিকে চীন লীগ-অব-ন্যাশন্‌স হইতে কোনপ্রকার সাহায্য না পাইয়া একপ্রকার হতাশ হইয়াই জাপানের সহিত টাংকু (Tangku)-এর সন্ধি স্বাক্ষর করিল। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী জাপানী সৈন্য চীনের প্রাচীরের উত্তরে অপসরণ করিতে রাজী হইল। জাপানী-অধিকৃত স্থানসমূহ ও চীনের অধীন অঞ্চলের সীমার মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলকে

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া সম্পূর্ণভাবে দখল

লর্ড লিটন্ কমিশন

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স-এর বিফলতা

টাংকু-এর সন্ধি

নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসন চীনা কর্মচারীদের হস্তেই থাকিবে বটে, কিন্তু শাসনকার্যে জাপানের ক্ষতি-কারক কোন কিছু করা হইবে না সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। কার্যত অবশ্য জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্যিক ও সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারনীতি পূর্ণোদ্যমেই চালাইল। চিয়াং-কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী সরকার চীনের কমিউনিস্ট্ দমনে প্রবৃত্ত থাকায় জাপানের আক্রমণ প্রতিহত করিবার তেমন চেষ্টা করিলেন না। এইরূপ পরিস্থিতিতে চীনা কমিউনিস্ট্ নেতা মাও-সে-তুং ও অপরাপর নেতৃবর্গ জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতির সম্মিলিত শক্তি নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানাইলেন এবং নিজেরাও জাপানী শক্তি প্রতিহত করিবার কার্যে সরকারকে সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন। চিয়াং-কাই-শেক জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা অপেক্ষা কমিউনিস্ট্দের দমন করিবার কার্যেই অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। এমন সময় চিয়াং-কাই-শেকের নিজ অধীন কর্মচারিগণ তাঁহাকে বন্দী করিয়া দুই সপ্তাহ কাল এক অজ্ঞাত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই আকস্মিক ঘটনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চিয়াং-কাই-শেককে দেশরক্ষার জন্য কমিউনিস্ট্ দলের সহিত বিরোধ মিটাইতে বাধ্য করা। দুই সপ্তাহ পর বন্দিদশা হইতে মুক্তি পাইয়া চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্ট্দের সহিত অন্তর্যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলিলেন।

চিয়াং-কাই-শেকের কমিউনিস্ট্ দমন নীতি

কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ মৈত্রী

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করিলে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ যুগ্মশক্তি জাপানী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশরক্ষার কার্যে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু কুয়োমিং-তাং দল কমিউনিস্ট্দিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। এই সন্দেহ হইতেই ক্রমে দুই দলের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কিয়াংসি ও ফুকিন অঞ্চলে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ দলের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ সৃষ্টি হইলে চিয়াং-কাই-শেকের মধ্যস্থতায় সাময়িকভাবে এই অন্তর্যুদ্ধের অবসান হইল। ঐ বৎসরই পার্ল হারবার (Pearl Harbour) জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হইলে আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায়ই চীনের কমিউনিস্ট্গণ কুয়োমিং-তাং পক্ষকে পরাজিত করিয়া চীনের বিপ্লব সংঘটিত করে, ফলে নূতন চীনের উত্থান ঘটে।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জাপানী আক্রমণ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কুয়োমিং-তাং ও কমিউনিস্ট্ ঐক্য : চীনের বিপ্লব

জাপান (Japan)

জাপানের উত্থান (Rise of Japan) : সুদূর-প্রাচ্যে জাপানের উত্থান আধুনিক ইতিহাসের এক বিচিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বহু শতাব্দীর সুষুপ্তি কাটাইয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের উত্থান পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

জাপানের উত্থান বিচিত্র ঘটনা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপানের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল সামন্ত-তান্ত্রিক। মিকাডো বা সম্রাট ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসক। তিনি নিজ রাজধানী কিয়োটো (Kioto)-তে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বাস করিতেন। শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা ছিল সোগান বা প্রধানমন্ত্রীর হস্তে। মিকাডো ছিলেন কেবল নামেমাত্রই সম্রাট, প্রকৃত শাসক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বা সোগান। সোগানের সরাসরি অধীনে ছিল দাইমিও (Daimios) বা সামন্ত ভূম্যধিকারিগণ। এই সকল ভূম্যধিকারিগণের অধীনে ছিল সামুরাই (Samurai) বা অস্ত্রধারী উপসামন্তগণ। দাইমিও ও সামুরাইগণের সাহায্যে সোগান শাসন পরিচালনা করিতেন। সমাজের সর্বনিম্নে ছিল রাজনৈতিক অধিকারহীন কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সমাজ।

জাপানী শাসন ও সমাজ-ব্যবস্থা : মিকাডো, সোগান, দাইমিও ও সামুরাই

জাপানের কৃষ্টি চীনা সভ্যতার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী ছিল, কিন্তু জাপানী সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে চীনা সভ্যতার অনুকরণ মনে করিলে ভুল হইবে। জাপানীদের চরিত্রের প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য ছিল—দেশাত্ম-বোধ ও যুদ্ধক্ষেত্রে দেশের জন্য প্রাণ দিবার আগ্রহ। জাপানীদের ধর্ম সিণ্টোবাদ (Shintoism) আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধও শিক্ষা দিয়াছিল। অক্লান্ত কর্মক্ষমতা এবং অসাধারণ অনুকরণ-প্রিয়তা জাপানী জাতীয় চরিত্রের অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

জাপানীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য

ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপান বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছিল বটে, কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে জাপান বিদেশীয়দের সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করিত না মনে করা ভুল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপীয় ধর্মযাজকগণকে জাপানে ধর্মপ্রচারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইংরেজ, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ বণিকগণ জাপানী বন্দরে যাতায়াত

বিদেশীদের সহিত জাপানের যোগাযোগ

করিত। ইওরোপীয় বণিক-সম্প্রদায় ও যাজকগণের স্বার্থপরতার ফলেই জাপান নিজ স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখিয়া চলিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিল।* ইওরোপীয় বণিকদের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ও স্বার্থপর প্রতিযোগিতা জাপানীদিগকে বিদেশীয়দের প্রতি অত্যন্ত সন্দিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি রোমান ক্যাথলিক যাজকগণ জাপানী খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণকে পোপের (Pope) প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে প্ররোচিত করিলে জাপানী সরকার যাজকশ্রেণীর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সকল যাজক জাপানের সম্রাটের বিচারের বিরুদ্ধে পোপের নিকট আপীল করিতে শুরু করিলে জাপানী সরকার বিদেশীয় বণিকদের জাপানে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন। তথাপি জাপান যে বিদেশীয়দের সহিত যোগাযোগ একেবারে ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা বলা চলে না। তখনও ওলন্দাজগণের ব্যবহারে জাপানী সরকার সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া কতক কতক বাণিজ্যিক অধিকার দেশিমা (Deshima) নামক উপদ্বীপে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল।

ইওরোপীয়দের নীচ স্বার্থপরতা : জাপানে বিদেশীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ

ওলন্দাজ বণিকদের প্রতি উদারতা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপান এইভাবে বিদেশীয়দের সহিত যোগাযোগ এড়াইয়া চলিল। এই শতাব্দীর প্রথমভাগে জাপানে এক জাগরণের সৃষ্টি হয়। জাপানীরা প্রথমে চীনা প্রাচীন সাহিত্য এবং পরে নিজের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া দুইটি প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া উঠিল : জাতীয়তাবোধ ও মিকাডো বা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য। তাহারা সোগান কর্তৃক মিকাডোর ক্ষমতা অপহরণের বিরোধিতা শুরু করিল। দেশিমায় অবস্থিত ওলন্দাজ বাণিজ্য-কুঠির মাধ্যমে জাপানীরা ইওরোপীয় চিকিৎসা-বিদ্যা ও ইওরোপীয় দেশগুলির অগ্রগতির কতক পরিচয় লাভ করিল। এইভাবে যখন জাপানীদের মধ্যে ইওরোপীয় দেশগুলি সম্পর্কে জানিবার আগ্রহ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন মার্কিন সরকার কমোডোর পেরি (Commodore Perry)-এর অধীনে কতকগুলি

জাপানের জাগরণ

বিদেশী শিক্ষা সম্পর্কে ঔৎসুক্য

* "The conduct of the foreigners themselves and the conditions of the European world, made it seem advisable and necessary for the Japanese narrowly to limit their contacts." Vinacke, p. 79.

যুদ্ধ-জাহাজ জাপানে পাঠাইলেন এবং যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া জাপানী সরকারের নিকট হইতে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে সমর্থ হইলেন।

চীনদেশের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। এই কারণে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়া নৌচালনার জন্য মধ্যপথে কয়লা বোঝাই করা প্রয়োজন হইত। অথচ জাপান নিজ বন্দরগুলি বিদেশীয়দের নিকট বন্ধ রাখায় মার্কিন জাহাজগুলির অসুবিধা হইত। ভীতি প্রদর্শন করিয়া জাপানের নিকট হইতে জাপানীদের বন্দর ব্যবহারের অধিকার আদায় করিবার জন্য ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই কমোডোর পেরি জাপান সরকারের নিষেধ অমান্য করিয়া বলপূর্বক জাপানে উপস্থিত হইলেন। মার্কিন সরকারের আদেশ অনুযায়ী পেরি জাপান সরকারের নিকট জাপানের নিকটবর্তী সমুদ্রে বিপদ্‌গ্রস্ত মার্কিন জাহাজ ও নাবিকদের ব্যবহারের জন্য একাধিক জাপানী বন্দর উন্মুক্ত রাখিবার দাবি করিলেন। ইহা ভিন্ন কোন মালবাহী মার্কিন জাহাজ সমুদ্রে বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে সেই সকল মাল জাপানী বন্দরে বিক্রয় করিবার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার অধিকারও দাবি করা হইল। এই সকল দাবি প্রয়োজনবোধে বলপূর্বক আদায় করা হইবে তাহা কমোডোর পেরি'র সঙ্গে যুদ্ধ-জাহাজ দেখিয়াই জাপানী সরকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জাপানী কর্তৃপক্ষ কমোডোর পেরি'র দাবির অধিকাংশ স্বীকার করিয়া লইলেন এবং জাপান বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ করিবে কিনা সে বিষয় বিবেচনাসাপেক্ষ রাখিলেন। পর বৎসর (১৮৫৪) জাপানী কর্তৃপক্ষ কমোডোর পেরি'র সহিত এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী নাগাসাকি ও আরও দুইটি বন্দর মার্কিন বাণিজ্যপোতের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হইল। শিমোডা (Shimoda) নামক স্থানে একজন মার্কিন কন্‌সাল (Consul) নিযুক্ত করিবার অধিকার স্বীকৃত হইল। জাপান আমেরিকাকে 'most favoured nation' হিসাবে বিবেচনা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

কমোডোর পেরি'র আগমন (১৮৫৩)

কমোডোর পেরি-চুক্তি (১৮৫৪)

কমোডোর পেরি'র এই চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ইওরোপীয় দেশ জাপানের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে অগ্রসর হইল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দেই ইংলণ্ড জাপানের সহিত কমোডোর পেরি'র চুক্তির অনুরূপ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হইল। রাশিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ পর পর জাপানের সহিত অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন

ইংলণ্ড, রাশিয়া ও হল্যাণ্ডের সহিত চুক্তি

কন্সাল হ্যারিস্ (Consul Harris) কমোডোর পেরি'র চুক্তির শর্তগুলির সম্প্রসারণ সাধন করিলেন। এই নূতন চুক্তি দ্বারা জাপান আরও চারিটি বন্দর বিদেশীয়দের ব্যবহারার্থ উন্মুক্ত করিল। ইহা ভিন্ন অন্যান্য জাপানী বন্দরগুলিতে বাণিজ্য করিবার অধিকারও স্বীকৃত হইল। অপর কোন বিদেশীয় শক্তির সহিত জাপানের কোনপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইলে আমেরিকা উহার সমাধানে মধ্যস্থতা করিবার প্রতিশ্রুতিও দান করিল। কন্সাল হ্যারিস্-স্বাক্ষরিত

কন্সাল হ্যারিসের চুক্তি (১৮৫৮)

চুক্তির সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল জাপানের বন্দরগুলিতে মার্কিন সরকারের 'অতি- রাষ্ট্রীয়' বা extra-territorial অধিকার। এই শর্তের বলে জাপানে অবস্থিত মার্কিনদের উপর জাপানী আইন-কানুন প্রয়োগ নিষিদ্ধ ছিল। ইহা ভিন্ন জাপানী মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার অবাধ বিনিময়ও স্বীকৃত হইয়াছিল।

বিদেশীয়দের সহিত যোগাযোগের ফলে জাপানের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইল। পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির সহিত ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে জাপান নিজ দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হইল। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মিকাডো বা সম্রাটকে ক্ষমতাহীন করিয়া রাখিয়া সোগান শাসনক্ষমতা হস্তগত করিয়াছিলেন। সোগানের আধিপত্য হইতে সম্রাটকে মুক্ত করিবার জন্য এক

জাপানের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব

তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। এই আন্দোলনের পশ্চাতে ছিলেন একদল দেশপ্রেমিক, উৎসাহী যুবক। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সোগানের আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া মিকাডোকে ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। জাপানী ইতিহাসে ইহা রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration) নামে পরিচিত। পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপানের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় সমাজের এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হইলে জাপানী জাতি এক নব উদ্যমের সহিত জাতীয় জীবনকে উন্নত করিতে আত্মনিয়োগ করিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের বৈজ্ঞানিক সভ্যতা ও অর্থনৈতিক উন্নতির

জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব : সর্বাঙ্গীণ উন্নতি

প্রভাব জাপানী জাতির মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আনয়ন করিল। জাপানী জাতি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিল যে, বহু শতাব্দীর বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও জাপান অতি অল্পকালের মধ্যেই বহির্জগতের উন্নতির সহিত নিজেকে অতি আশ্চর্যজনকভাবে মানাইয়া লইল। জাপানী জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে পাশ্চাত্ত্য

সভ্যতার প্রভাব প্রতিফলিত হইতে লাগিল। সামন্ত সৈন্যের পরিবর্তে জাতীয় সেনাবাহিনী গঠন করা হইল। সামরিক শিক্ষা ও সামরিক বৃত্তিগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হইল। রেলপথ দ্বারা দেশের বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন করা হইল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি প্রবর্তন করা হইল। কিয়োটো ও টোকিও এই দুই স্থানে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল। বিদেশ হইতে অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতিগণকে এই বিশ্ববিদ্যালয় দুইটিতে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইল। ইওরোপীয় আইন-কানুনের অনুকরণে জাপানে আইন প্রণয়ন করা হইল। ইওরোপীয় বর্ষপঞ্জী জাপানে গৃহীত হইল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধিত হইল। নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দুই-কক্ষযুক্ত একটি পার্লামেণ্ট গঠন করা হইল। এইভাবে সর্বদিক দিয়া জাপানে এক নব জীবনের সূচনা হইল। এই নবলব্ধ জীবনীশক্তির পরিচয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চীনা-জাপানী যুদ্ধ ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে পাওয়া যায়।

জাপানের নব জীবনের সূচনা

চীন-জাপানের যুদ্ধ, ১৮৯৪-–'৯৫ (Sino-Japanese War): কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তার-সংক্রান্ত বিরোধের ফলেই চীন-জাপানের যুদ্ধের উদ্ভব হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে চীন ও জাপানের মধ্যে কোরিয়ার উপর প্রাধান্য লইয়া বিরোধ চলিতেছিল। কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হইতে বিচার করিলে জাপানের নিরাপত্তার জন্য কোরিয়া জাপানের অধীনেই রাখা প্রয়োজন ছিল। জাপানের কোন শত্রুশক্তির হস্তে কোরিয়া চলিয়া গেলে জাপানের বক্ষঃস্থলে ছুরিকাঘাতের ন্যায়ই হইত। মাঞ্চুরিয়ার দিকে রাশিয়ার ক্রমবিস্তৃতিও জাপানের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে চলিয়াছিল। এই কারণেও জাপানের পক্ষে কোরিয়া দখল করা প্রয়োজন ছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দিল। চীনদেশ পূর্ব প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া সেখানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। জাপানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিও যুদ্ধের অনুকূল ছিল। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিভেদ দূর করিবার উপায় হিসাবে জাপানী সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজন ছিল। চীন-জাপানের যুদ্ধের কারণগুলি ছিল: (১) জাপানী জনসাধারণের একাংশ ও জাপান সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজন ও আগ্রহ; (২) দীর্ঘকাল যাবৎ কোরিয়ার সহিত জাপানের স্বার্থ জড়িত

চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ

ছিল, ইহা ভিন্ন চীন মহাদেশে রাজ্যবিস্তৃতি ব্যাপারে কোরিয়া প্রবেশ-পথস্বরূপ ছিল; (৩) কোরিয়া কোন বিদেশী শক্তি কর্তৃক অধিকৃত হইবে ইহা জাপানীরা মোটেই সহ্য করিতে পারিত না, সুতরাং কোরিয়ার উপর সম্পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিবার সুযোগ জাপান সহজে ছাড়িতে চাহিল না; (৪) কোরিয়ায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বাজার জাপানের স্বার্থের পক্ষে উন্মুক্ত রাখাও প্রয়োজন ছিল।

চীনের পরাজয় : শিমনোশেকির চুক্তি (১৮৯৫)

জাপানের সামরিক শক্তির তুলনায় চীনদেশ ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ইহা ভিন্ন জাপানের সেনাবাহিনী ছিল যেমন সুগঠিত তেমনি আধুনিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত, অপর পক্ষে চীনদেশের অফুরন্ত লোকবল থাকিলেও যুদ্ধের ব্যাপারে তাহারা ছিল বহু পশ্চাদ্‌পদ। সুতরাং জল এবং স্থলে চীনদেশ জাপানের নিকট সহজেই পরাজিত হইল। জাপান সৈন্য প্রেরণ করিয়া কোরিয়া দখল করিলে চীনদেশ জাপানের সহিত শিমনোশেকির চুক্তির স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তির শর্তানুসারে চীনদেশ (ক) কোরিয়া সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার মানিয়া লইল; (খ) জাপানকে মাঞ্চুরিয়ার লিয়াওটাং অঞ্চল, ফরমোসা, পেস্কাডোরিস দ্বীপপুঞ্জ সম্পূর্ণ-ভাবে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল; (গ) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে চীনে প্রভূত পরিমাণ অর্থ (২০ কোটি টেয়ল্‌স্) জাপানকে দিতে প্রতিশ্রুত হইল। উপরন্তু ইহাও স্থির হইল যে, যতদিন পর্যন্ত এই ক্ষতিপূরণ আদায় না হইবে ততদিন পর্যন্ত জাপান ওয়ে-হাই-ওয়ে নামক স্থানটি অধিকার করিয়া রাখিবে। (ঘ) সর্ব-শেষে চীনদেশ চুংকিং, সুচাও, হ্যাং-চাও ও শাসি—এই চারিটি বন্দর বিদেশী বণিকদের নিকট উন্মুক্ত রাখিতে বাধ্য থাকিবে।

চুক্তির শর্তাদি

শিমনোশেকি-চুক্তির বিরোধিতা : রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপ

শিমনোশেকির সন্ধির ফলে চীনা সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিই কেবল জাপানের হাতে চলিয়া গেল না, লিয়াওটাং উপদ্বীপে জাপানী প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় মাঞ্চুরিয়ার নিরাপত্তাও ব্যাহত হইল। চীনদেশ ভিন্ন রাশিয়ার পক্ষেও শিমনোশেকির সন্ধি গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ লিয়াওটাং উপদ্বীপে জাপানী প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় চীনদেশে রাশিয়ার বিস্তারনীতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা ছিল। স্বভাবতই রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের সহিত যুগ্মভাবে চীন সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে শিমনোশেকির সন্ধির

বিরোধিতা করিল। রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স জাপানকে লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চল চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ জানাইল। লিয়াওটাং অঞ্চলে জাপানী অধিকার স্থাপিত হইলে চীনদেশের রাজধানী পিকিং-এর নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই রাশিয়া-জার্মানি-ফ্রান্স জাপানের লিয়াওটাং অঞ্চল হইতে অপসরণ দাবি করিল। এইভাবে ইওরোপীয় তিনটি দেশের যুগ্ম-শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া যুক্তি-যুক্ত নহে মনে করিয়া জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চল উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতি-পূরণের বিনিময়ে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

(১) 'তিন শক্তির হস্তক্ষেপ' (Three-power intervention) অর্থাৎ রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের হস্তক্ষেপের ফলে জাপানকে লিয়াওটাং ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল বটে, তথাপি চীন-জাপানের যুদ্ধ এবং শিমনোশেকির সন্ধি চীনের দুর্বলতা প্রমাণিত করিয়াছিল। (২) অপর পক্ষে চীনদেশের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র জাপানের সামরিক বিজয় জগতের চক্ষে জাপানের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিল।

শিমনোশেকির সন্ধির গুরুত্ব

(৩) এই যুদ্ধের ফলে সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতির এক নূতন পর্যায় শুরু হইয়াছিল। জাপানের ফরমোসা ও পেস্কাডোরিস্ দ্বীপপুঞ্জ অধিকার এবং চীন কর্তৃক কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃতি জাপানের শক্তি যেমন বৃদ্ধি করিয়াছিল, তেমনি সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে জাপানের ভবিষ্যৎ প্রতিপত্তিরও সূচনা করিয়াছিল। (৪) অপর পক্ষে, চীনের সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতা, চীনা জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের অভাব প্রভৃতি যাহা কিছু জাপানের হাতে চীনের পরাজয়ের কারণ ছিল তাহা বহির্জগতের চক্ষে চীনদেশের মর্যাদা আরও হ্রাস করিয়াছিল। (৫) চীন-জাপানের যুদ্ধ সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে চীন ও জাপানের পূর্ব-সম্পর্কের ও শক্তি-সাম্যের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া জাপানকে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য দান করিয়াছিল।* এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে জাপানী জাতির মধ্যে এক দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। (৬) জাপানের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে পুনরুজ্জীবিত জাপানের শক্তির প্রথম পরিচয় ছিল চীন-জাপানের যুদ্ধে জাপানের বিজয়লাভ। (৭) এই যুদ্ধে জয়লাভের পরই ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানে যে Extra-territoriality

* "The Sino-Japanese War marked a reversal in the relative positions of China and Japan in the Far East." Vinacke, p. 135.

ভোগ করিয়াছিল তাহা নাকচ করা জাপানের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। (৮) রাশিয়ার নেতৃত্বে শিমনোশেকির সন্ধির সুবিধাভোগে জাপানকে বাধা দানের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবেই রুশ-জাপানী যুদ্ধের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাশিয়াই যে জাপানের প্রধান শত্রু তাহা জাপান উপলব্ধি করিয়াছিল।

রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স চীনদেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার অজুহাতে শিমনোশেকির সন্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে জাপানের বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু এই অখণ্ডতা বজায় রাখিবার নীতি যে কতদূর আন্তরিকতা-বর্জিত ছিল তাহা অল্পকালের মধ্যেই প্রমাণিত হইল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সাণ্টাং নামক স্থানে দুইজন জার্মান ধর্মযাজককে হত্যা করা হইলে জার্মানি এই হত্যাকাণ্ডের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ কিয়াওচাও নামক স্থানটি ৯৯ বৎসরের জন্য অধিকার করিল এবং অপরাপর নানাপ্রকার বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড অনুরূপ শর্তে এক একটি বন্দর দখল করিল। রাশিয়া চীনদেশ হইতে লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চল ও পোর্ট আর্থার পঁচিশ বৎসরের জন্য অধিকার করিয়া লইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে জাপান স্বভাবতই ইওরোপীয় দেশগুলি প্রধানত রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিল।

রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্সের চীনদেশের অখণ্ডতা বজায় রাখিবার নীতির অসারতা

রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স—যে তিনটি শক্তি চীনদেশের অখণ্ডতার দোহাই দিয়া জাপানকে চীন-জাপানের যুদ্ধের ফল ভোগ করিতে দেয় নাই, সেই সকল দেশ চীন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ আত্মসাৎ করিতেছে দেখিয়া জাপান স্বভাবতই অত্যন্ত বিরক্ত হইল। এই সকল পরিস্থিতির জন্য প্রধানত দায়ী ছিল রাশিয়া। সুতরাং জাপানবাসীরা রাশিয়াকেই জাপানের প্রধান শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। এই মনোভাবের মধ্যেই ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-জাপানী যুদ্ধের মূল কারণ পরিলক্ষিত হয়।

জাপানের রুশ-বিদ্বেষ : রুশ-জাপানী যুদ্ধের মূল কারণ

রাশিয়ার ক্রমবিস্তার-নীতি ইংলণ্ডের পূর্বাঞ্চলের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার পক্ষে মোটেই কাম্য ছিল না। সুতরাং ইংলণ্ড রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করিবার জন্য ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সহিত এক মিত্রতা-চুক্তি সম্পাদন করিল। এই চুক্তির ফলে একদিকে যেমন জাপানের শক্তি বৃদ্ধি পাইল, অপর দিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের মর্যাদাও বহুগুণে বর্ধিত হইল।

ইঙ্গ-জাপানী মৈত্রী (১৯০২) : জাপানের মর্যাদা বৃদ্ধি

রুশ-জাপানী যুদ্ধ, ১৯০৪—৫ (Russo-Japanese War)ঃ মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়ার স্বার্থ জড়িত ছিল। উত্তর মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়া ট্রান্স্-সাইবেরিয়ান রেলপথ নির্মাণের অধিকার রাশিয়া চীনদেশ হইতে আদায় করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন রুশ-চীনা ব্যাঙ্ক ছিল সম্পূর্ণ একটি রুশ প্রতিষ্ঠান লিয়াওটাং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার ছিল রাশিয়ার অধিকৃত স্থান। এই সকল সাম্রাজ্যবাদী ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য রাশিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের বক্সার বিদ্রোহের সময় মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিল। ইহার পরও রাশিয়া চীনদেশের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নিজ স্বার্থ বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জাপানী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া নীতির কতক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ঐ বৎসরই (১৯০২) রাশিয়া চীনদেশের অনুরোধে 'মাঞ্চুরিয়া চুক্তি' (Manchurian Convention) স্বাক্ষর করিয়া মোট ১৮ মাসের মধ্যে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল হইতে রুশ সৈন্য অপসারণের প্রতিশ্রুতি দান করিল। কিন্তু প্রথম দফায় কতক সৈন্য অপসারণের পর রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া চুক্তির শর্তানুযায়ী দ্বিতীয় দফা সৈন্য অপসারণের কোন চেষ্টাই করিল না। উপরন্তু রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানী প্রভাব খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে বহুসংখ্যক রুশ সৈন্যকে কোরিয়ায় পাঠাইতে লাগিল। জাপান রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া পরিত্যাগ করিতে ও কোরিয়ায় জাপানী প্রাধান্য স্বীকার করিতে এবং সেজন্য যথাযথ চুক্তি সম্পাদনে আহ্বান করিল। রাশিয়া এই প্রস্তাবের উত্তরে এক পাল্টা প্রস্তাব করিল যে, জাপান যদি রাশিয়াকে চীনদেশ ও মাঞ্চুরিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে কোনপ্রকার বাধা না দেয় তাহা হইলে রাশিয়া জাপানকে কোরিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারে কোন বাধা দান করিবে না। এইভাবে কোন পক্ষই অপর পক্ষের দাবি স্বীকার না করিলে জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল (১৯৪০)।

মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে রুশ স্বার্থ

'মাঞ্চুরিয়া চুক্তি' (১৯০২): চুক্তির শর্ত ভঙ্গ

কোরিয়ায় রাশিয়ার জাপান-বিরোধিতা

মীমাংসার ব্যর্থ চেষ্টা

রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া মুকডেন (Mukden) ও শুশিমা (Tshusima) নামক দুইটি স্থানে পর পর পরাজিত হইল। সুদূর-প্রাচ্য অঞ্চলে আমেরিকার বাণিজ্য-স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধজয়ের দ্বারা জাপান যাহাতে অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হইতে না পারে সেজন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাশিয়া ও জাপানের দ্বন্দ্বে মধ্যস্থতা করিলেন। পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি (Treaty of Portsmouth) দ্বারা রুশ-জাপানী যুদ্ধের অবসান ঘটিল।

মুকডেন্ ও শুশিমার যুদ্ধঃ রাশিয়ার পরাজয়, পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি (১৯০৫)

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির শর্তানুযায়ী (১) কোরিয়ায় জাপানের নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্বীকৃত হইল। (২) লিয়াওটাং উপদ্বীপে রাশিয়ার যাবতীয় অধিকার জাপানের নিকট ত্যাগ করিতে হইল। (৩) মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের দক্ষিণাংশ এবং শাখালিন নামক স্থান দুইটি জাপানকে দিতে হইল। (৪) রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে যাবতীয় রুশ সৈন্য অপসারণে স্বীকৃত হইল। (৫) জাপান বা রাশিয়া চীনদেশের আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবনের কার্যে কোন-প্রকার বাধার সৃষ্টি করিবে না এবং মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ অর্থনৈতিক প্রয়োজন ভিন্ন কোন সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইবে না—এই স্বীকৃতিও দান করিল।

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির শর্তাদি

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধির তথা রুশ-জাপানী যুদ্ধ জাপানের শক্তি ও সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধ জাপানের মর্যাদা, শক্তি ও সাম্রাজ্যবৃদ্ধির দ্বিতীয় পর্যায় বলা যাইতে পারে। চীন-জাপানের যুদ্ধ (১৮৯৪-৫) ছিল প্রথম পর্যায়। রুশ-জাপানী যুদ্ধের ফলে প্রথমত এই কথাই প্রমাণিত হইল যে, ইওরোপীয় দেশগুলির সামরিক শক্তি অপরাজেয় নহে। রাশিয়ার পরাজয় আধুনিক কালে এশিয়াস্থ দেশের নিকট ইওরোপীয় দেশের সর্বপ্রথম পরাজয়। স্বভাবতই এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ইওরোপীয় দেশগুলির নিকট এই কথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইল যে, সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে জাপানের ন্যায় শক্তিশালী দেশের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হইতে হইবে।

পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি তথা রুশ-জাপানী যুদ্ধের গুরুত্ব :

রুশ-জাপানী যুদ্ধে (১) ইওরোপীয় শক্তি অপরাজেয় নহে—এই সত্য প্রমাণিত

দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে কোরিয়ায় জাপানের প্রাধান্য রাশিয়া কর্তৃক স্বীকৃত হইল এবং লিয়াওটাং উপদ্বীপ অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় চীনদেশ অভিমুখে রাশিয়ার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইল। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল হইতে রুশ সৈন্য অপসারণের ফলে ঐ অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য বিস্তারের পথও প্রশস্ত হইল।

(২) চীনের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত

তৃতীয়ত, এই যুদ্ধের ফলে চীনদেশে এক গভীর জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হইয়াছিল। বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় সামরিক শক্তি সংগঠন, এই সত্য চীনবাসী উপলব্ধি করিল। জাপানের সামরিক

সাফল্য চীনবাসীকেও আত্মনির্ভরশীল হইতে অনুপ্রাণিত করিল। চীনবাসীরাও ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতির অনুকরণে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য জাপানী সামরিক কর্মচারীদের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিল। এই নূতন প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল ১৯১১-'১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিলক্ষিত হয়।

(৩) চীনের জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ

চতুর্থত, রুশ-জাপানী যুদ্ধের প্রভাব ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া বলকান অঞ্চলে বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা নামক স্থান দুইটি অস্ট্রিয়া দখল করিয়া লইল। ক্রিমিয়ান্ যুদ্ধের পর রাশিয়া ইওরোপীয় রাজনীতি হইতে সাময়িক-ভাবে অপসরণ করিয়াছিল, কিন্তু অস্ট্রিয়া বোস্‌নিয়া ও হার্‌জেগোভিনা দখল করিলে এই সুত্রে রাশিয়া পুনরায় ইওরোপীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল।

(৪) অস্ট্রিয়া কর্তৃক রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ : ইওরোপীয় রাজনীতিতে রাশিয়ার পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চমত, রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়া হীনবল হইলে ইংলণ্ডের রুশভীতি অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। ফলে, রাশিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে 'এ্যাংলো-রাশিয়ান কন্‌ভেন্‌শন' নামক চুক্তি (Anglo-Russian Convention) স্বাক্ষরিত হইল।

(৫) ইঙ্গ-রুশ মৈত্রীর পথ প্রশস্ত

ষষ্ঠত, রুশ-জাপানী যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় জারতন্ত্রের দুর্বলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণস্বরূপ ছিল। ফলে, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতের কাজ অনেকটা সহজ হইয়াছিল।

(৬) জারতন্ত্রের দুর্বলতার প্রমাণস্বরূপ

সপ্তমত, এই যুদ্ধের ফলে জাপানের অপ্রতিহত ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া আমেরিকা নিজ স্বার্থ রক্ষার্থ রুশ-জাপানী যুদ্ধ অবসানের জন্য মধ্যস্থতা করিয়াছিল। সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করিলে মার্কিন স্বার্থ নষ্ট হইবে এই বিবেচনা করিয়াই আমেরিকা মন্‌রো-নীতি ত্যাগ করিয়া সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল।

(৭) সুদূর-প্রাচ্যের রাজনীতিতে আমেরিকার হস্তক্ষেপ

সর্বশেষ, রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ জাপানের জাতীয় জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনারূপে গৃহীত হইল। জাপানের আত্ম-প্রত্যয় এবং রাজ্য বিস্তার-স্পৃহা এই বিজয়লাভের ফলে অধিকতর বর্ধিত হইল।

(৮) জাপানের আত্মপ্রত্যয়

চীন-জাপানী ও রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানের বিজয়লাভ জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা বৃদ্ধি করিল। সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাপান চীনদেশের বিরুদ্ধে এক অন্যায়মূলক প্রসার-নীতি অবলম্বন করিল।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে জাপান নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীনদেশে জার্মান অধিকৃত সাণ্টাং অঞ্চল, কিয়াও-চাও প্রভৃতি দখল করিয়া লইল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনদেশের নিকট একুশটি বিভিন্ন দাবি উপস্থিত করিল এবং মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই সকল দাবি পূরণের জন্য জানাইল।

'একুশ দাবি' (Twenty-one Demands)

এই 'একুশ দাবি' পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগে ছিল সাণ্টাং অঞ্চলে জাপানী প্রাধান্য স্থাপন-সংক্রান্ত দাবি, দ্বিতীয় ভাগে ছিল বহির্মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া-সংক্রান্ত দাবি, তৃতীয় ভাগে ছিল চীনদেশ হইতে কয়লা ও লৌহ-শিল্প-সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার দাবি, চতুর্থ ভাগে ছিল চীনদেশ নিজ বন্দর, উপকূল বা প্রণালী কোন বিদেশী (ইওরোপীয়) শক্তির নিকট ত্যাগ করিবে না এই দাবি, পঞ্চম ভাগে ফুকিন (Fukein) অঞ্চলে চীনা শাসনকার্য পরিচালনায় জাপানী পরামর্শদাতা নিয়োগ, জাপান হইতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় এবং জাপানকে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান প্রভৃতি দাবি।

চীন কর্তৃক 'একুশ দাবির' অধিকাংশ স্বীকৃত

আমেরিকা ও অপরাপর শক্তিবর্গ জাপানের এই 'একুশ দাবি' তাহাদের নিজ নিজ স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিয়া সমর্থন করিল না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত থাকায় জাপানকে দৃঢ়ভাবে বাধাদান করাও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। বাধ্য হইয়াই চীনদেশ 'একুশ দাবি'র অধিকাংশই স্বীকার করিয়া লইল, কেবলমাত্র যে সকল শর্ত স্বীকার করিলে চীনদেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল সেগুলি অগ্রাহ্য করিল। জাপান দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় কতকগুলি বিশেষ অধিকার এবং রেলপথ প্রস্তুত করিবার, চীন-দেশকে ঋণ দিবার প্রভৃতি নানাপ্রকার অর্থনৈতিক সুযোগও লাভ করিল। ইহা ছাড়া জাপান দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া এবং কিরিণ-চাংচুং রেলপথ প্রভৃতি ৯৯ বৎসর পর্যন্ত দখলে রাখিবার অধিকারও পাইল।

'একুশ দাবি' সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ সন্দেহ নাই। দুর্বল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাপানের স্বার্থপর বিস্তার-নীতি নৈতিকতা-বর্জিত ছিল বটে, কিন্তু এই দাবির মধ্যে এশিয়ায় ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিস্তৃতি প্রতিহত করিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। 'একুশ দাবি'র চতুর্থ ও পঞ্চমভাগের শর্তগুলিতে চীনদেশের বন্দর, প্রণালী, অর্থনৈতিক সুযোগ প্রভৃতি ইওরোপীয় শক্তিবর্গ যাহাতে আত্মসাৎ করিতে না পারে, সেই নীতিও পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে 'একুশ দাবি'কে 'এশিয়ার মন্‌রো-নীতি' (Asiatic Monroe Doctrine) নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

'একুশ দাবি'—
'এশিয়ার মন্‌রো-নীতি'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটজনক মুহূর্তে যখন জাপানী সাহায্য ইওরোপীয় শক্তিবর্গের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমেরিকা ও ইওরোপীয় শক্তিবর্গ চীনদেশের নিরাপত্তা নীতি অগ্রাহ্য করিয়া জাপানের 'একুশ দাবি' সমর্থন করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। যুদ্ধশেষে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে পরাজিত জার্মানির অধীনে চীনের যে সকল স্থান ছিল চীনদেশ সেগুলির প্রত্যর্পণ দাবি করিলে জাপান উহা অগ্রাহ্য করিল। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ জাপানের গ্রাস হইতে চীনকে রক্ষা করিবার কোন কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিলেন না। ফলে, চীনা প্রতিনিধি শূন্যহস্তে প্যারিস সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলনে
চীনের আশাভঙ্গ

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বৃহৎ বৃহৎ দেশগুলির নৌশক্তির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বিভিন্ন শক্তিবর্গের পরস্পর স্বার্থ-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ওয়াশিংটনে এক কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। এই কন্‌ফারেন্সে জাপান ব্রিটেন ও আমেরিকার মিলিত নৌবলের অর্ধেক হইতেও অধিক পরিমাণ নৌ-বহর রাখিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। জাপানের পক্ষে ইহা অতিশয় সুবিধা-জনক হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ইহা ভিন্ন প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে কোন দেশই আর কোন নূতন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিতে পারিবে না স্থির হওয়ায় এই অঞ্চলে জাপান-ই সর্বাধিক শক্তিশালী দেশে পরিণত হইল। মার্কিন সরকার আমেরিকায় জাপানী শ্রমিকদের অবাধ প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলে মার্কিন-জাপানী বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময়ে জাপান ইংলণ্ডের সহিত মিত্রতা চুক্তি

স্বাক্ষর করিলে আমেরিকায় জাপানী শক্তিবৃদ্ধিতে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। এই কারণে আমেরিকার অনুরোধে ইঙ্গ-জাপানী চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে (১৯২১), উহা আর পুনঃ স্বাক্ষরিত হইল না। ইহার পরিবর্তে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জাপানের মধ্যে এক চতুঃশক্তি মৈত্রী স্থাপিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অধিকৃত স্থান আক্রমণ করিবে না এবং এই সকল স্থান-সংক্রান্ত যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদ যুগ্ম কন্‌ফারেন্সে মীমাংসিত হইবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। চীন সম্পর্কে উন্মুক্ত-দ্বার নীতিই স্বীকৃত হয়। চীন-জাপানের মধ্যে সাণ্টাং অঞ্চল লইয়া যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল উহা চীনের স্বপক্ষে মীমাংসিত হয়। জাপান কিয়াও-চাও এবং সাণ্টাং-এর অপরাপর জার্মান অধিকৃত অঞ্চল চীনকে ফিরাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হয়। ইয়াপ (Yap) দ্বীপ লইয়া আমেরিকার সহিত জাপানের বিরোধেরও মীমাংসা ঐ সময়ে করা হয়।

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্স, (১৯২১-২২) : নৌশক্তি নিয়ন্ত্রণ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমস্যার সমাধান

ওয়াশিংটন কন্‌ফারেন্সে একদিকে যেমন জাপানকে সাণ্টাং অঞ্চল চীনদেশকে ফিরাইয়া দিতে হইয়াছিল, অপর দিকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি ইত্যাদি কেহই বৃদ্ধি করিবে না এই স্বীকৃতির ফলে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী দেশে পরিণত হইয়াছিল। অদূর ভবিষ্যতে জাপান এই প্রাধান্য নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিয়োগ করিয়াছিল।

জাপানের প্রাধান্য

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর সর্বত্র যে অর্থনৈতিক অবনতি দেখা দিয়াছিল উহার ফলে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চল দখল করিয়া সেখানের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইয়া জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করিতে মনস্থ করিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কুয়োমিং-ত্যাং ও কমিউনিস্ট্‌দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইলে এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা চরমে পৌঁছিলে জাপান 'একুশ দাবি'র যে-সকল অংশ তখনও চীনদেশ হইতে আদায় করা হয় নাই সেগুলি দাবি করিল এবং সেই সূত্রে মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া 'মাঞ্চুকুয়ো' নামে এক তাঁবেদার রাজ্য গঠন করিল। লীগ-অব-ন্যাশন্‌সের নিকট আবেদন করিয়া একাধিক কমিটির সুপারিশের অপেক্ষা করিয়াও শেষ পর্যন্ত চীনদেশ এই আন্তর্জাতিক সংঘ হইতে কোন সহায়তা লাভে সমর্থ হইল

জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল (১৯৩১) : মাঞ্চুকুয়ো তাঁবেদার রাজ্য গঠন

না। বাধ্য হইয়াই চীনদেশ জাপানের সহিত টাংকু (Tangku) নামক শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী জাপান চীনের প্রাচীরের উত্তরদিকে অপসরণ করিতে স্বীকৃত হইল এবং চীন ঐ প্রাচীরের সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি নিরপেক্ষ অঞ্চলে পরিণত করিতে স্বীকার করিল।

টাংকু-এর শান্তি-চুক্তি

মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্পৃহা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ঐ সময় হইতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এক নূতন পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিল। সমগ্র সুদূর প্রাচ্য হইতে ইওরোপীয় শোষণের অবসান করিয়া জাপান এশিয়ার অভিভাবকত্ব ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইল। চীনদেশকে ইওরোপীয় শোষণমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জাপান চীনদেশের দ্বার পুনরায় ইওরোপীয়দের নিকট রুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইল। এই কারণে জাতীয়তাবাদী নেতা চিয়াং-কাই-শেকের অপসারণ অপরিহার্য ছিল। বৈকাল হ্রদের পূর্বাঞ্চলে যে রুশ প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও বিনাশ করা প্রয়োজন ছিল। এইভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে জাপান তথাকথিত 'নূতন পরিকল্পনা' (New Order) প্রস্তুত করিল। ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারই ছিল জাপানের 'নূতন পরিকল্পনার' মূল উদ্দেশ্য।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদ উৎসাহিত

'নূতন পরিকল্পনা'—জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নূতন বিশ্লেষণ

এদিকে চীনদেশে জাতীয়তাবোধের ক্রমবিস্তার চীনজাতিকে দেশরক্ষা এবং দেশকে বিদেশী শোষণ হইতে মুক্ত করিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতেছিল। বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিতে চীনে কুয়োমিং-তাং ও কমিণ্টার্ণ দল ঐক্যবদ্ধ হইতে পশ্চাদ্‌পদ হইবে না বিবেচনা করিয়া জাপান জার্মানির সহিত কমিণ্টার্ণ-বিরোধী এক চুক্তি স্বাক্ষর করিল। এইভাবে রাশিয়ার সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের আশঙ্কার বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাপান চীনদেশ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল।

চীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

জাপান-জার্মান চুক্তি

এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পিপিং-এর নিকটবর্তী এক গ্রামে 'মার্কো পোলো পুল' (Marco Polo Bridge)-এর নিকটে চীনা ও জাপানী সৈন্যদের কয়েকজনের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ ঘটিলে এই সূত্রে জাপান

চীন আক্রমণ করিল। জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য চীনের কমিউনিস্ট্ দল চিয়াং-কাই-শেকের কুয়োমিং-তাং সরকারের সহিত যুগ্মভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। এই যুদ্ধে জাপান চীনের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল দখল করিয়া লইল। জাপান এই অধিকৃত অঞ্চলে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এক তাঁবেদার সরকার নিয়োগ করিয়া উহাকে চীনের 'জাতীয় সরকার' নামে অভিহিত করিল। অপর দিকে চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল স্বাধীন চীন হিসাবেই রহিল। কিন্তু চিয়াং-কাই-শেক জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত চীনা কমিউনিস্ট্‌গণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলে স্বাধীন চীন কমিউনিস্ট্ অধিকৃত অঞ্চল এবং জাতীয়তাবাদী বা কুয়োমিং-তাং অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া গেল। কুয়োমিং-তাং সরকারের রাজধানী হইল চুংকিং আর কমিউনিস্ট্-শাসিত অঞ্চলের রাজধানী হইল ইনান্।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক চীন আক্রমণ

জাপান অধিকৃত অঞ্চল: স্বাধীন অঞ্চল

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সুদূর-প্রাচ্য অঞ্চলের এক আমূল পরিবর্তন ঘটিতে চলিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩৯-৪৫

(The Second World War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ (Causes of the Second World War): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিতে জার্মানির প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা হইতেই উদ্ভূত। হিট্‌লারের নেতৃত্বে জার্মানির ন্যাশন্যাল সোশিয়েলিস্ট্ দলের অন্যতম উদ্দেশ্যই ছিল ভার্সাই-এর প্রতিশোধ গ্রহণ করা। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র জার্মান ভাষাভাষী লোকঅধ্যুষিত স্থান জার্মানির সহিত সংযুক্ত করা, ইওরোপের উপর একক প্রাধান্য বিস্তার করিয়া ইওরোপকে এবং ক্রমে সমগ্র পৃথিবীকে জার্মানির

এক বিশাল উপনিবেশে পরিণত করা* এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একক প্রাধান্য বিস্তার করা ছিল সোশিয়েলিস্ট্‌ তথা নাৎসি সরকারের উদ্দেশ্য। ভার্সাইয়ের শান্তি-চুক্তিতে জার্মানিকে চিরকালের মত হৃতমর্য্যাদা ও দুর্বল করিয়া রাখিবার যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। পোল্যাণ্ডকে পুনর্গঠিত করিতে গিয়া পূর্ব-প্রাশিয়া ও জার্মানির অপরাপর অংশের সংযোগ নাশ করিয়া মিত্রশক্তিবর্গ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে জার্মানি কর্তৃক অনুসৃত রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের নীতির বিরোধিতা করিয়া জার্মানির ঐতিহাসিক বিবর্তন উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছিল। তদুপরি ষোড়শ শতাব্দী হইতে সামরিক শক্তি হিসাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জার্মান রাষ্ট্রের নৌবল ও সৈন্যবল অত্যধিকভাবে হ্রাস করিয়া জার্মানির জাতীয় মর্যাদায় যে আঘাত হানা হইয়াছিল তাহা জার্মান জাতির পক্ষে দীর্ঘকাল মানিয়া চলা সম্ভব ছিল না। পদানত, পরাজিত জার্মানির উপর মিত্রশক্তিবর্গ ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তি চাপাইয়া দিয়া প্রথম হইতে এই শান্তি-চুক্তি ভঙ্গ করিবার মনোবৃত্তি জার্মান জাতির মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। ইহা ভিন্ন যুদ্ধোত্তর কালে ফরাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক রুহ্‌র অঞ্চল দখল এবং মিত্রপক্ষ কর্তৃক মোতায়েন সৈন্য কর্তৃক জার্মান জনসাধারণের প্রতি রূঢ় আচরণ মিত্র-শক্তিবর্গের প্রতি জার্মান জাতির বিদ্বেষ আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানিতে যে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল উহার প্রতি ইওরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সহানুভূতির অভাব জার্মানির গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়া তুলিবার কোন সুযোগ দান করে নাই। ফলে জার্মানিতে একক প্রাধান্যের উদ্ভব ঘটিয়া জার্মান জাতি ক্রমেই এক অনমনীয়, উদ্ধত এবং সর্বাত্মক প্রাধান্যের নীতি অনুসরণ করিতে উৎসাহিত হইয়াছিল।

জার্মানির প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা

গণতান্ত্রিক শাসনের দুর্বলতার সুযোগে একক অধিনায়কত্বের উদ্ভব ও সর্বাত্মক প্রাধান্য নীতির অনুসরণ

দ্বিতীয়ত, জার্মানি যখন নাৎসি দলের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করিয়া ক্রমেই ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির শর্তাদি লঙ্ঘন করিতে শুরু করিয়াছিল সেই

* ..."He planned to turn the world into a German Colony", *Hitler's Second Book* (Vide a news item from Munich published in the A. B. Patrika, March 18. 1961)

সময়ে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার-দ্বয়ের দুর্বলতা প্রদর্শন নাৎসি নেতার সাহস ও আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি করিয়াছিল। জার্মানির সাম্যবাদ-বিরোধী প্রচারকার্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স কতকটা প্রীতির চক্ষেই দেখিয়াছিল, ইহাও জার্মানির প্রতি ইঙ্গ-ফরাসী সরকার-দ্বয়ের তোষণমূলক নীতি অনুসরণের অন্যতম যুক্তি হিসাবে বিবেচ্য। জার্মানি কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল, মিউনিক চুক্তি দ্বারা ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মানি কর্তৃক দখলের স্বীকৃতি, জার্মানি কর্তৃক চেকো-শ্লোভাকিয়ার অবশিষ্টাংশ অধিকার, মেমেল বন্দর দখল প্রভৃতি স্বীকৃতি জার্মানির প্রতি তোষণ-নীতি অনুসরণেরই ফলস্বরূপ। জার্মানি ভিন্ন জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল, ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) জয় প্রভৃতিও ঐ একই নীতির বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর দুর্বলতা লীগের প্রভাবশালী সদস্য ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জার্মানি, জাপান ও ইতালি তোষণেরই ফল, বলা বাহুল্য। স্পেনীয় অন্তর্যুদ্ধে গণতান্ত্রিক সরকারের সাহায্যে ব্রিটেন বা ফ্রান্স দণ্ডায়মান না হইবার ফলেও হিট্লার মুসোলিনির একক অধিনায়কত্ব-নীতি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল। গণতন্ত্রের এই নৈতিক পরাজয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল।

জার্মানি, ইতালি, জাপান তোষণ: ইঙ্গ-ফরাসী দুর্বলতা

বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষ-শক্তিবর্গ

বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষ-শক্তিবর্গের মৈত্রী একক প্রাধান্য ও সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই বাহ্য প্রকাশ, বলা বাহুল্য। উপরি-উক্ত পরিস্থিতিতে যখন জার্মানি ডানজিগ্ শহর ও পোলিশ কোরিডোর দাবি করিল তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের জনমতের চাপে এবং জার্মানির রাজ্যলিপ্সা সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে বাধা-দানে কৃতসংকল্প হইল। পক্ষান্তরে সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে জার্মানির যুদ্ধ শুরু করিবার পথে শেষ বাধা দূরীভূত হইল এবং জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু হইল।

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি, পোল্যাণ্ড আক্রমণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা

তৃতীয়ত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে অপর গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল একক অধিনায়কত্ব (Dictatorship) ও গণতন্ত্রের পরস্পর আদর্শগত দ্বন্দ্ব। পৃথিবীর প্রধান শক্তিবর্গ তখন এই দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শের ভিত্তিতে দুইটি বিরোধী শিবিরে পরিণত হইয়াছিল। জার্মানি, ইতালি, জাপান অক্ষশক্তিবর্গ একক

ইওরোপ ১৯৩৯
জার্মানি ও জার্মান মিত্রশক্তিবর্গ
মিত্রশক্তিবর্গ (ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি)
মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক সংরক্ষিত অঞ্চল
নরওয়ে
সুইডেন
ফিনল্যাণ্ড
গ্রেট ব্রিটেন
ডেনমার্ক
ল্যাটভিয়া
লিথুয়ানিয়া
রা শি য়া
জার্মানি
পোল্যাণ্ড
চেকোস্লোভাকিয়া
ফ্রান্স
সুইৎজারল্যাণ্ড
হাঙ্গেরী
রুমানিয়া
ইতালি
যুগোস্লাভিয়া
কৃ-ষ্ণ সা-গ-র
পোর্তুগাল
স্পেন
বুলগেরিয়া
গ্রীস
তুরস্ক
মরোক্কো
আলজিরিয়া
টিউনিসিয়া
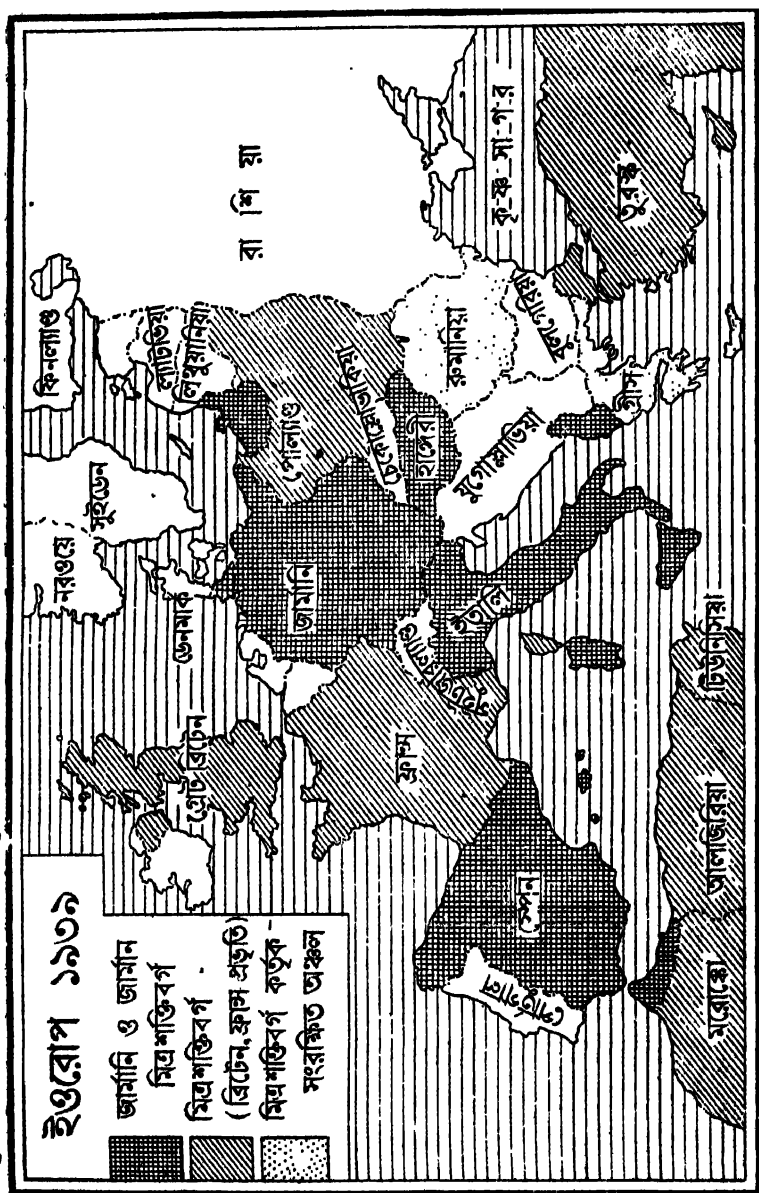
অধিনায়কত্ব, স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদের ধারক ছিল আর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা ছিল গণতন্ত্রের সমর্থক। সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার পরিস্থিতি ছিল অন্যরূপ। গণতন্ত্র ও একক অধিনায়কত্ব উভয়ই ছিল সাম্যবাদের শত্রু। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধের প্রথম দিকে রাশিয়া আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে যে শত্রু হইতে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা আছে উহার সহিত অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া প্রথমে কিছুকাল যুদ্ধ এড়াইয়া চলিয়াছিল। কিন্তু শেষে একক অধিনায়কত্বের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়া গণতন্ত্রের সহিত যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক দেশসমূহের পক্ষেও রুশ সাহায্য তখন প্রয়োজন ছিল। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রধানত গণতন্ত্র ও একক অধি-নায়কত্বের আদর্শগত দ্বন্দ্ব হিসাবে বিবেচ্য। এই আদর্শগত দ্বন্দ্বই ছিল এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ।

একক অধিনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের আদর্শগত দ্বন্দ্ব

চতুর্থত, জাপান ও ইতালির সাম্রাজ্যবাদী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল এবং সেই সূত্রে লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর সদস্যপদ ত্যাগ লীগের দুর্বলতা সর্ব-সমক্ষে প্রকট করিয়া তুলিয়া-ছিল। অনুরূপ ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া দখল এবং তাহা প্রতিহত করিতে লীগের অকর্মণ্যতা তদানীন্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে অপরাপর শক্তিবর্গের দুর্বলতা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়া জার্মানি-ইতালি-জাপানের ঔদ্ধত্য এবং আত্মপ্রত্যয় অত্যধিক পরিমাণে বাড়াইয়া দিয়াছিল। এই সকল দেশের নিজ শক্তি সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা তাহাদিগকে স্বভাবতই যুদ্ধামোদী করিয়া তুলিয়াছিল।

জাপান ও ইতালি কর্তৃক যুদ্ধের পটভূমিকা রচনা

পঞ্চমত, জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল বটে, কিন্তু এই আক্রমণ যদি কেবল পোল্যাণ্ড জয়েই সীমাবদ্ধ থাকিবে এইরূপ নিশ্চয়তা থাকিত তাহা হইলে ব্রিটেন বা ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হইত কিনা তাহা বলা যায় না। কারণ পোল্যাণ্ড ছিল জার্মানির সহিত মিত্রতা-বদ্ধ দেশ। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী। পোল্যাণ্ড লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর শর্তাদি উপেক্ষা করিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত চুক্তি অমান্য করিয়া চলিয়া-ছিল। এই সকল কারণে জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হইলে ব্রিটেন বা ফ্রান্সের অসন্তুষ্টির কারণ হইত না, কিন্তু পোল্যাণ্ড আক্রমণ

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পোল্যাণ্ডের সাহায্যে অগ্রসর হইবার কারণ

হিট্‌লারের অপরিতৃপ্ত রাজ্যগ্রাস-স্পৃহার অন্যতম পদক্ষেপ মাত্র। ক্রমে ব্রিটেন ও ফ্রান্সকে এই রাজ্য-গ্রাস নীতির প্রয়োগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে ভাবিয়াই ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডের সহিত একযোগে জার্মানিকে বাধা দানে অগ্রসর হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসান ও শান্তি-চুক্তিসমূহ (End of the War : Peace treaties) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর চালু ছিল। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জেনারেল ম্যাক আর্থারের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছিল। ইহার পূর্বেই (৭ই মে, ১৯৪৫) জার্মানি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছিল। নাৎসি ফুহ্‌রার হিট্‌লার অবশ্য ইহার কয়েকদিন পূর্বেই (১লা মে, ১৯৫৪) আত্মহত্যা করিয়া মিত্রপক্ষের হস্তে অপমানিত হইবার আশঙ্কা এড়াইয়া গিয়াছিলেন।

যুদ্ধাবসান, ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৪৫)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সর্বাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে যোগদানকারী দেশসমূহের জনসাধারণ দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় নাই। নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেমন দেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ-দান পবিত্রকার্য বলিয়া অনেকেই মনে করিয়াছিল সেইরূপ কোন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে বাস্তবতার প্রভাবই অধিক ছিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে যোগদানই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তথাপি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই যুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশের সকল লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগদানে বাধ্য হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে পৃথিবীর সকল প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিল্পজাত সামগ্রী এই যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে সামরিক ও বেসামরিক জনসাধারণের প্রাণ এবং সম্পত্তিনাশের পরিমাণ স্বভাবতই ছিল অভাবনীয়।

দেশপ্রেম প্রভৃতি উচ্চাদর্শ অপেক্ষা বাস্তবতার অধিকতর প্রভাব

যুদ্ধের পদ্ধতির দিক্ দিয়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তথা অপরাপর

যে-কোন যুদ্ধ অপেক্ষা পৃথক ছিল। উন্নত ধরণের বিমানবহর, ডুবোজাহাজ, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির ব্যবহার ভিন্ন আণবিক বোমার ব্যবহার এই যুদ্ধের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচ্য। প্রচার-কার্য এই যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। রেডিও, প্রচারপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখা এবং শত্রুদেশের জনসাধারণের মনে ভীতির সৃষ্টি করা ছিল এই যুদ্ধকালীন প্রচারকার্যের অন্যতম উদ্দেশ্য। জনাকীর্ণ শহরাঞ্চলে (anti-personnel) বোমা নিক্ষেপ করিয়া জনসাধারণকে শহরাঞ্চল ত্যাগে বাধ্য করা এবং তাহার ফলে শত্রুদেশের সামরিক প্রয়োজনে সেনাবাহিনী ও জিনিসপত্রের দ্রুত চলাচলে বাধার সৃষ্টি করাও ছিল এই যুদ্ধ-পদ্ধতির অন্যতম নীতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধ-পদ্ধতির পার্থক্য

প্রচারকার্যের প্রভাব

শান্তির প্রস্তুতি (Preparation for Peace): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে-সকল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আদর্শ সম্পর্কে যে-সকল ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিলেন সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পরাজিত শক্তিবর্গের সহিত শান্তি-চুক্তি রচিত হইয়াছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্ট্ ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন্ চার্চিলের মধ্যে অতলান্তিক মহাসাগরে এক জাহাজে সাক্ষাৎকারের পর উভয়ে যে ঘোষণাপত্র জারি করিয়াছিলেন তাহা 'আট্‌লাণ্টিক চার্টার' (Atlantic Charter) নামে অভিহিত। এই চার্টার বা সনদে ব্রিটেন ও আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভের সুযোগ গ্রহণ করিয়া পররাষ্ট্রের কোন অংশ গ্রাস করিবে না, পৃথিবীর সকল অংশের লোকের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিবে, নাৎসি শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবে, পৃথিবীর সকল অংশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য-অধিকার স্বীকার করিবে এবং পৃথিবীর শান্তি-রক্ষা ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবে—এই সকল শর্ত মানিয়া লইতে স্বীকৃত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-আফ্রিকার ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা নামক স্থানে রুজ্‌ভেল্ট্ ও চার্চিলের মধ্যে পুনরায় যে সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহাতে সামরিক আলাপ-আলোচনা ভিন্ন ইতালি ও সিসিলি আক্রমণ ও অক্ষশক্তিবর্গকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে

'আটলাণ্টিক চার্টার'

ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা কন্‌ফারেন্স (১৯৪৩)

বাধ্য করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবগণ সম্মিলিত হইয়া শত্রুপক্ষকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং ইতালিকে ফ্যাসিজমের হাত হইতে মুক্ত করিয়া গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে ইতালির শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করেন। মস্কো হইতে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, হিট্লার কর্তৃক দখল (১৯৩৮) মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গ মানিবে না এবং অস্ট্রিয়াকে জার্মানির অধিকার হইতে মুক্ত করিয়া দিবে।

ব্রিটেন-আমেরিকা-সোভিয়েত পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সম্মেলন

মস্কো ঘোষণা

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কাইরোতে রুজ্‌ভেল্ট্‌, চার্চিল ও চিয়াং কাইশেক্‌ মিলিত হইয়া জাপানকে পরাজিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে জাপানকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণে বাধ্য করিবার নীতি গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যবাদী প্রসার হইতে আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীন বিরত থাকিবে বলিয়া রুজ্‌ভেল্ট্‌, চার্চিল ও চিয়াংকাইশেক প্রতিশ্রুত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান যে সকল স্থান বা দেশ অধিকার করিয়াছে এবং চীন হইতে মাঞ্চুরিয়া, পেস্‌কাডোরিস্‌, ফরমোজা প্রভৃতি যে সকল স্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জাপান দখল করিয়া লইয়াছিল সেই সকল স্থান হইতে জাপানকে বিতাড়নের নীতিও এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার, ফরমোজা, মাঞ্চুরিয়া ও পেস্‌কাডোরিস্‌ প্রভৃতি চীনকে ফিরাইয়া দেওয়া প্রভৃতি সিদ্ধান্তও এই সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছিল।

কাইরো সম্মেলন (১৯৪৩)

কাইরো সম্মেলনের অল্পকালের মধ্যেই রুজ্‌ভেল্ট্‌, চার্চিল ও স্টালিন্‌ তেহরাণে এক সম্মেলনে সমবেত হন। এই সম্মেলনে এই তিন দেশের সমর অধিনায়কগণও উপস্থিত ছিলেন। সামরিক দিক্‌ দিয়া এই সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল এই যে, ইহাতেই জার্মানিকে পরাজিত করিবার সামরিক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ইরাণের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, তুরস্ককে মিত্রপক্ষে যোগদান করিতে অনুরোধ জানান, যুগোস্লোভিয়াকে সাহায্য দান এবং নরওয়ের উপকূলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া কর্তৃক নরওয়ে আক্রমণ প্রভৃতি সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনে স্থিরীকৃত হয়।

তেহরাণ সম্মেলন (১৯৪৩)

উপরি-উক্ত সম্মেলনের পর ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে (২১ শে জুলাই) ডাম্বার্টন ওক্‌স্ (Dumbarton Oaks) নামক স্থানে পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি কন্‌ফারেন্সে মোট পঁচিশটি প্রস্তাব করা হয়। এই প্রস্তাবগুলির মূল নীতি ছিল এই যে, পৃথিবীর শান্তিরক্ষার কার্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুগ্ম চেষ্টা, সমবায় ও সহায়তার মাধ্যমে স্থাপিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সম্পন্ন হইবে। শান্তিরক্ষার কার্যে যুগ্ম চেষ্টা, মধ্যস্থতা, এমনকি প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সামরিক বলপ্রয়োগ করিবার কোন বাধা থাকিবে না।

ডাম্বার্টন ওকস্ কন্‌ফারেন্স (১৯৪৪)

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন জার্মানির পরাজয় একপ্রকার নিশ্চিত তখন রুজ্‌ভেল্ট্‌, চার্চিল ও স্টালিন ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা নামক স্থানে সমবেত হইয়া ঐ বৎসরই এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড ন্যাশনস্‌ সম্মেলন (United Nations Conference) আহ্বান করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর শান্তি রক্ষা ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নকল্পে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা। কোন্‌ কোন্‌ রাষ্ট্রকে এই সম্মেলনে আহ্বান করা হইবে এবং সম্মেলনের কার্যপদ্ধতি কিভাবে পরিচালিত হইবে এই সকল বিষয় সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালির চূড়ান্ত পরাজয় এবং সে-সকল দেশের জনসাধারণের ইচ্ছানুক্রমে শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন প্রভৃতির পরিকল্পনাও এই কন্‌ফারেন্সে গৃহীত হয়।

ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্স (১৯৪৫)

ইহা ভিন্ন পৃথিবীর জনসাধারণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, সর্বত্র আইন ও শৃঙ্খলার পুনঃস্থাপন, দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ মাত্রেরই উন্নতিসাধন, স্বাধীনভাবে নির্বাচনের সুযোগ দান, পরাজিত জার্মানির উপর ব্রিটেন, রাশিয়া ও আমেরিকার সর্বাত্মক প্রাধান্য স্থাপন প্রভৃতি নীতি স্থিরীকৃত হয়। ইহা ভিন্ন, জার্মানিতে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রাধান্য যে অংশে স্থাপিত হইবে সেই অংশ হইতে ফ্রান্সের জন্য একটি পৃথক অংশ গঠন করিয়া উহার উপর ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হইবে, যুদ্ধে মিত্রপক্ষের যে ক্ষতি হইয়াছিল জার্মানিকে জাহাজ, যন্ত্রপাতি, বিদেশে জার্মানির বিনিয়োগ করা (invested) অর্থ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশ বা শেয়ার প্রভৃতি দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ দানে বাধ্য করা হইবে স্থির হইল। সোভিয়েত রাজধানী

ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্ত:

জার্মানি সম্পর্কে

মস্কোতে ক্ষতিপূরণ কমিশনের অধিবেশন বসিবে, এই কমিশন কর্তৃক জার্মানি কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে এবং জার্মানির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহৃত হইবে সেজন্য মিত্রপক্ষীয় একটি যুগ্ম সমিতি (Allied Control Council) বার্লিনে স্থাপিত হইবে এই সকল সিদ্ধান্তও ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে গৃহীত হয়।

হিট্‌লার পোল্যাণ্ড অধিকার করিলে তদানীন্তন পোল্যাণ্ড-সরকার লণ্ডনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে স্থির হইল যে, লণ্ডনস্থ পোল্যাণ্ড-সরকার এবং ঐ সময়ে পোল্যাণ্ডে যে সরকার চালু ছিল এই দুইয়ের প্রতিনিধি লইয়া একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করা হইবে। এই অস্থায়ী সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে পোল্যাণ্ডের স্থায়ী সরকার গঠিত হইবে। পোল্যাণ্ডের রাজ্যসীমা পূর্ব দিকে কার্জন লাইন (Curzon Line) পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বে পোল্যাণ্ডের যে পূর্ব-সীমা ছিল তাহা হইতে কার্জন লাইন কতকটা পশ্চিমে ছিল, ফলে পূর্বদিকে পোল্যাণ্ডকে যে পরিমাণ স্থান হারাইতে হইবে উহার ক্ষতিপূরণ হিসাবে উত্তর ও পশ্চিম দিকে পোল্যাণ্ডের রাজ্যসীমা সেই পরিমাণে প্রসার করা হইবে। পোল্যাণ্ডের পশ্চিম দিকের রাজ্যসীমার সহিত জার্মানির রাজ্য হইতে কতকাংশ লইয়া যোগ করিয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য এজন্য জার্মানির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পর্যন্ত পোল্যাণ্ডকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

পোল্যাণ্ড সম্পর্কে

জার্মানির পতনের অল্পকালের মধ্যেই সোভিয়েত রাশিয়াকে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে। ইহার বিনিময়ে জাপান কর্তৃক অধিকৃত শাখালিন ও উহার সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। বহির্মঙ্গোলিয়ার উপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করিতে হইবে, পোর্ট আর্থার নৌঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য রাশিয়াকে বন্দোবস্ত দিতে হইবে এবং চীনের ইস্টার্ণ রেলপথ ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথের পরিচালনার ভার চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার উপর যুগ্মভাবে ন্যস্ত হইবে। ইহা ভিন্ন দাইরেন বন্দরটি (Port Dairen) আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত করা হইবে। কিউরাইল (Kurile) দ্বীপপুঞ্জ রাশিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

জাপান সম্পর্কে

যুদ্ধসৃষ্টির অপরাধে অপরাধীদের সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হইবে সে বিষয়েও রুশ, মার্কিন ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রিবর্গ ভবিষ্যতে একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন, এই সিদ্ধান্তও ইয়াল্টা কনফারেন্সে গৃহীত হয়। পৃথিবীর নিরাপত্তা, শান্তি ও গণতান্ত্রিক শাসন বজায় রাখিবার জন্য রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এই উদ্দেশ্যে কিছু কাল অন্তর একত্রে মিলিত হইবার প্রতিশ্রুতিও ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে দেওয়া হয়।

যুদ্ধাপরাধী সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুতের ব্যবস্থা

রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ প্রতিনিধিবর্গের কিছুকাল অন্তর অন্তর মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জার্মানির পরাজয় ও হিট্‌লারের আত্মহত্যার পর ১৭ই জুলাই বার্লিন কন্‌ফারেন্স বা পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্স (Potsdam Conference)-এ যোসেফ্ স্টালিন, ট্রুম্যান ও ক্লীমেণ্ট এট্‌লী সম্মিলিত হন। ইতিপূর্বে প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্টের মৃত্যুতে মার্কিন ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের স্থলে লেবার দলের নেতা ক্লীমেণ্ট এট্‌লী প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন)। পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্স ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই হইতে ২রা আগস্ট পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই কন্‌ফারেন্সে সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংলণ্ড—এই তিন দেশের নেতৃবর্গ স্থির করিলেন যে, এই তিন দেশ এবং ফ্রান্স ও জাতীয়তাবাদী চীনের (চিয়াং কাইশেকের অধীন চীনের) পররাষ্ট্র মন্ত্রিবর্গ লইয়া একটি কাউন্সিল গঠন করা হইবে। এই কাউন্সিলের কর্মকেন্দ্র হইবে লণ্ডন। তবে অপরাপর দেশের রাজধানীতেও এই কাউন্সিলের অধিবেশন বসিতে পারিবে। এই কাউন্সিলের সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল ইতালি, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত মিত্রপক্ষের শান্তিচুক্তি-পত্র প্রস্তুত করা। জার্মানির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে এই কাউন্সিলের সাহায্যে জার্মানির সহিত মিত্র-পক্ষের শান্তি-চুক্তি রচনা করা হইবে একথাও বলা হইয়াছিল।

পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্স (Potsdam Conference)

সিদ্ধান্ত

পররাষ্ট্র মন্ত্রিবর্গের কাউন্সিল

জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পূর্বে মিত্রপক্ষ জার্মানির উপর যে আধিপত্য ভোগ করিবে উহার নীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে পটস্‌ডাম

কন্‌ফারেন্সে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই নীতি ও পদ্ধতি ছিল নিম্নলিখিত রূপ :

(১) পরাজিত জার্মানির উপর সোভিয়েত, ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী অধিকার স্থাপিত হইল। যে অঞ্চল যে সরকারের অধিকারে ছিল সেই অঞ্চলে সেই সরকারের সেনাপতি সর্বাত্মক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন স্থির হইল। কিন্তু সমগ্র জার্মানির স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়াদি যুগ্মভাবে স্থিরীকৃত হইবে এই নীতি গৃহীত হইল। এই ধরণের কাজের জন্য উপরি-উক্ত পাঁচটি দেশের সেনাপতিদের লইয়া একটি নিয়ন্ত্রণ সমিতি (Control Council) গঠন করা হয়। (২) নাৎসি দল বা গ্রাশন্যাল সোশিয়ালিস্ট্ দলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিতে হইবে এবং নাৎসি আমলের আইন-কানুন, বিচার-ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছুই সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করিতে হইবে। (৩) জার্মানির শাসনব্যবস্থার অ-কেন্দ্রীকরণ এবং প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে। অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প-পরিবহন-সংক্রান্ত বিষয়াদি Control Council বা 'নিয়ন্ত্রণ সমিতির' তত্ত্বাবধানে স্থাপন করা হইল। জার্মানিতে কোন কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা থাকিবে না বটে, কিন্তু অর্থ, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি উপরি-উক্ত বিষয়াদির জন্য কয়েকটি কেন্দ্রীয় বিভাগ (Central General Administrative Departments) স্থাপিত হইল। এগুলি অবশ্য নিয়ন্ত্রণ সমিতির (Control Council) নিয়ন্ত্রণাধীনভাবে কার্য সম্পাদন করিবে স্থির হইল। (৪) নাৎসি যুদ্ধ-অপরাধীদিগকে গ্রেফ্‌তার করা হইবে এবং তাহাদের উপযুক্ত বিচার করা হইবে। (৫) অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া সমগ্র জার্মানিকে একটি সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হইবে। এজন্য শিল্প, খনি, আমদানি, রপ্তানি, বাণিজ্য, মৎস্যচাষ, কৃষি, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, ভোগসামগ্রীর ন্যায্য বণ্টন, মুদ্রা ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয়াদি সম্পর্কে যুগ্মভাবে একই প্রকার নীতি প্রয়োগ করা হইবে। কেবলমাত্র সামরিক অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের দিক্ দিয়া জার্মানি রুশ, ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত হইবে।

সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স অধিকৃত জার্মানির আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্পর্কে যুগ্ম নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত

ক্ষতিপূরণ আদায় ব্যাপারে পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্সে স্থির হইল যে,

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর
মিত্রশক্তি অধিকৃত জার্মানি
জার্মানি কর্তৃক হস্তান্তরিত স্থান
উত্তর-সাগর
পূর্ব প্রাশিয়া
হামবুর্গ
স্টেটিন
ব্রিমেন
বার্লিন
ওয়ারসো
হল্যাণ্ড
ব্রিটিশ অধিকৃত
পোল্যাণ্ড
রুশ অধিকৃত
বেলজিয়াম
জা র্মা নি
প্রাগ
সার
ফরাসী
চেকোস্লোভাকিয়া
মার্কিন অধিকৃত
ফ্রান্স
অধিকৃত
ভিয়েনা
মিউনিক
অস্ট্রিয়া
সুইটজারল্যাণ্ড
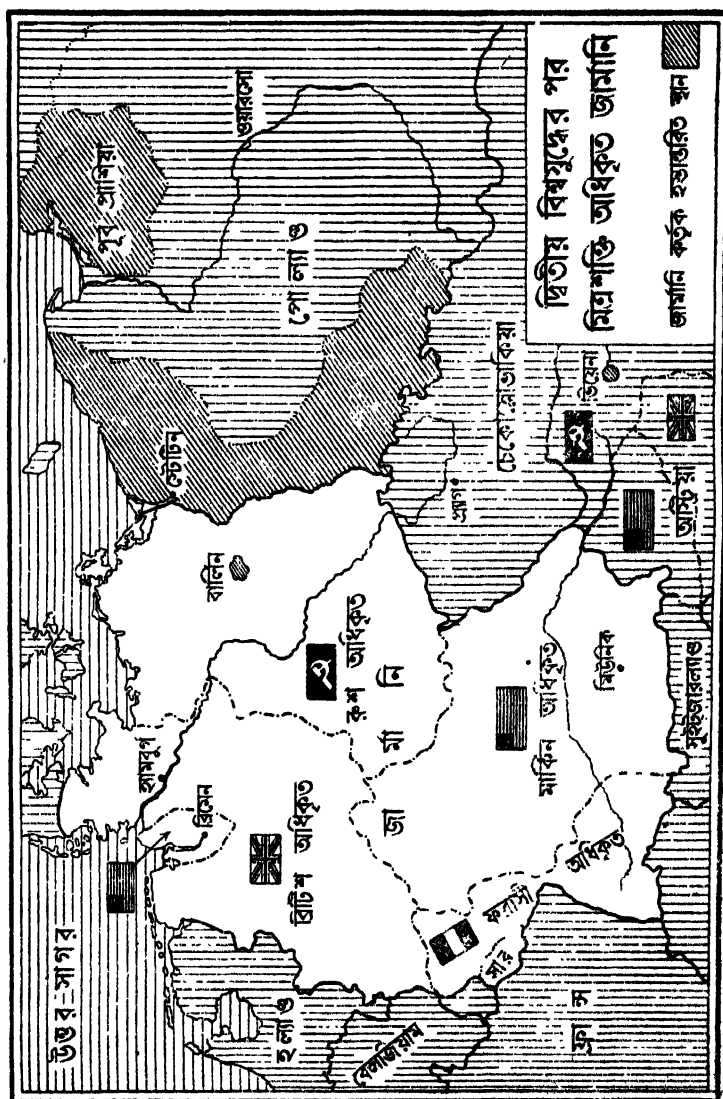
জার্মানির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ক্ষতিপূরণ আদায় করা হইবে। জার্মান জনসাধারণ যাহাতে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে সে দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহা ভিন্ন সোভিয়েত রাশিয়া নিজ অধিকৃত জার্মান অঞ্চল হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবে, অপরাপর শক্তিবর্গও তাহাদের স্ব স্ব অধিকৃত অঞ্চল হইতে উহা আদায় করিবে। কিন্তু যেহেতু রুহ্‌র ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চলে ছিল এবং জার্মানিতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সেই সময়ে রাশিয়ার অত্যধিক প্রয়োজন ছিল সেজন্য জার্মানির নিজস্ব প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন যন্ত্রপাতির ১৫ শতাংশ রাশিয়াকে সরবরাহ করা হইবে স্থির হইল। অবশ্য এজন্য রাশিয়া-অধিকৃত অঞ্চল হইতে সম-মূল্যের খাদ্যশস্য, খনিজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি দিতে হইবে।

ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা

জার্মানির ডুবো জাহাজগুলি সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া স্থির হইল, কেবলমাত্র জার্মান ডুবো জাহাজ-নির্মাণ কৌশল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেন মোট ত্রিশটি ডুবো জাহাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল। জার্মান যুদ্ধজাহাজগুলিও এই তিন দেশের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া হইল।

জার্মান যুদ্ধজাহাজ ও ডুবো জাহাজ রাশিয়া-আমেরিকা-ব্রিটেনের মধ্যে বণ্টন

পোল্যাণ্ড সম্পর্কে ইয়াল্টা কন্‌ফারেন্সে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই অনুসারে পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই অস্থায়ী সরকার সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে কোন স্থায়ী সরকার গঠনের ব্যবস্থা করেন নাই। এই ব্যাপার লইয়া পটস্‌ডাম কন্‌ফারেন্সে তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার পর পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকারকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করিতে জানান হইল। ইহা ভিন্ন পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমা প্রসারের প্রশ্নটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সময় পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হইল।

পোল্যাণ্ড সমস্যা

পট্‌স্‌ডাম কন্‌ফারেন্স-এর অধিবেশন চালু থাকাকালীন জাপানের

হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে আণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের অবসান ঘটিল। কিন্তু আণবিক বোমার ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন মারণাস্ত্র সম্পর্কে আমেরিকা যে গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল তাহার ফলে ইওরোপীয় দেশসমূহ এবং বিশেষভাবে রাশিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে ঐ সময় হইতেই পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষ

এইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে পরাজিত বিভিন্ন শক্তির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের পটভূমিকা রচিত হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল (Effects of the Second World War) ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সম্পর্কের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেমন ইওরোপীয় মহাদেশের একক প্রাধান্য হ্রাস করিয়া এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবর্গকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থান দান করিয়া আন্তর্জাতিকতার ভিত্তি বহুগুণে প্রসারিত করিয়াছিল, তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইওরোপের প্রাধান্য নাশ করিয়া এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান, জার্মানি ও ইতালির শক্তি ও গুরুত্ব হ্রাস করিয়া সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি, মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহকেও স্বাধীন করিয়া তুলিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বৎসর (১৯৪৫) পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৩% শতাংশ ছিল পরাধীন কিন্তু বর্তমানে উহা মাত্র ৬% শতাংশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ ঔপনিবেশিকতার দ্রুত অবসান, ইওরোপীয় শক্তিবর্গের রাজনৈতিক প্রাধান্যের অবসান, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ প্রভৃতি এক নূতন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি রচনা করিয়াছে।

নূতন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—ইওরোপের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস

এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ফল হইল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অবসান। এই যুদ্ধাবসানের পর হইতে ক্রমপর্যায়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ অপসৃত হইতে চলিয়াছে।*

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের অবসান

* Vide, *Contemporary Europe Since 1870*, Hayes, P.748.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী ফল হইল পৃথিবীর শক্তিবর্গের দুইটি পরস্পর-বিরোধী 'ব্লক' বা রাষ্ট্রজোট গঠন। বর্তমানে পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গ পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোট ও পশ্চিমাঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোট—এই দুইটি সংগঠনে বিভক্ত। পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তে এবং পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোটের নেতৃত্ব সোভিয়েত রাশিয়ার হস্তে। পৃথিবীর এইরূপ পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্তি Polarisation of the World নামে অভিহিত। বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল সমস্যা এবং স্বরূপই হইল এই Polarisation বা দুই অংশে বিভক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া অভাবনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল বটে, তথাপি বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সোভিয়েত রাশিয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এস্তোনিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, বেসারাবিয়া, বুকোভিনার উত্তরাংশ, পোল্যাণ্ডের পূর্বাংশ, টুভা, পেস্টামো, প্রাশিয়ার উত্তরাংশ, কিউরাইল, শাখালিন, রুথেনিয়া প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল। ফলে মোট আড়াই লক্ষ বর্গমাইলেরও অধিক স্থান রাশিয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদী রাশিয়ার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হওয়ায় রাশিয়ার মর্যাদা, শক্তি ও প্রভাব সবই অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভ এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাশিয়ার সার্থক নেতৃত্ব সাম্যবাদের জয়েরই পরিচায়ক। ইওরোপে জার্মানি ও ইতালির পতন, সুদূর প্রাচ্যে জাপানের পতন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী কালে এই তিনটি দেশ যে শক্তি ও প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল তাহার সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির নেতৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর বর্তাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কেবল নামে মাত্রই 'বৃহৎ রাষ্ট্র' নামে অভিহিত হইতেছে, বস্তুত, এই দুই দেশের প্রাধান্যের যুগের অবসান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই ঘটিয়াছে। অনুরূপ সুদূর প্রাচ্যের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত চীনও কেবল নামে মাত্র বৃহৎ রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত ছিল।

পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিম অঞ্চলীয় রাষ্ট্রজোট—পৃথিবী পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রজোটে বিভক্ত (Polarisation of the World)

পৃথিবীর শক্তিবর্গ পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হইবার ফলে উদ্ভূত বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনের বিপ্লবের পূর্বাবধি চীনের অবস্থা এইরূপই ছিল। পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্বের ও শক্তির এইরূপ পরিবর্তন এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ বিভক্ত হইবার ফলেই বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে।

গণতন্ত্রের পথে ল্যাটিন আমেরিকার অগ্রগতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে দক্ষিণ আমেরিকার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতির পরিবর্তন এবং প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্ট কর্তৃক Good-Neighbour-Policy অনুসরণের ফলে ল্যাটিন আমেরিকা অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সমতাই কেবল বৃদ্ধি পায় নাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তামূলক মিত্রতা ব্র্যাজিল, গুয়াটেমেলা, এল-স্যালভাডোর প্রভৃতিতে স্বৈরাচারী একক অধিনায়কত্বের স্থলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের উৎসাহ ও প্রেরণা দান করিয়াছিল। পেরু ও ভেনেজুয়েলার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনও এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাগরণ

এশিয়া ও আফ্রিকার জাগরণ এবং একাদিক্রমে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি বিজয়ী শক্তির দুর্বলতা এবং জার্মানি, ইতালি প্রভৃতির পরাজয় ও পতনের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের উপর চরম আঘাত হানিয়া পৃথিবীর রাজনৈতিক রূপ পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে।

আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান কিংবা একাধিক রাষ্ট্রের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার পন্থা হিসাবে যুদ্ধ যে মোটেই সহায়ক নহে, এই শিক্ষা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হইতেও পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে যতটুকু সাহায্য করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বহুগুণে বেশি সংখ্যক নূতন এবং জটিলতর সমস্যা এই যুদ্ধের ফলেই উদ্ভূত হইয়াছে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ

পৃথিবীর নিরাপত্তা ও শান্তি সমস্যা, ঔপনিবেশিক সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সমস্যা, আণবিক শক্তি এবং অনুরূপ মারণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের সমস্যা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

শান্তিচুক্তিসমূহ

(The Peace Treaties)

শান্তি সম্মেলনসমূহ (Peace Conferences) : পট্‌স্‌ডাম কন্‌ফারেন্সে ব্রিটেন, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া, জাতীয়তাবাদী চীন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের লইয়া যে কাউন্সিল (Council of Foreign Ministers) গঠিত হইয়াছিল উহার উপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানির সহিত ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গের শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপরি-উক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রিবর্গ ইতালি, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড—এই পাঁচটি দেশের সহিত শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে সমবেত হইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে ক্রমেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় শক্তিবর্গের সংহতি বিনষ্ট হইল। ইহার প্রমাণ লণ্ডন কন্‌ফারেন্সে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটভ্‌ এবং অপরাপর দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে মতানৈক্য হেতু যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে পাওয়া যায়।

লণ্ডন কন্‌ফারেন্স (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)

রাশিয়া ও পশ্চিমী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মতানৈক্য

যাহা হউক, ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে আমেরিকা, ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক ঘরোয়া বৈঠকে শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় এবং পরবৎসর (১৯৪৬) প্যারিসে পররাষ্ট্রমন্ত্রিবর্গের কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। কিন্তু এই অধিবেশনেও ইতালি-যুগোস্লাভিয়ার রাজ্যসীমা, ট্রিয়েস্ট্‌ প্রভৃতি প্রশ্ন লইয়া রাশিয়া ও অপরাপর দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিল। অবশেষে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদো (Bidault) ট্রিয়েস্ট্‌ সমস্যা সমাধানের এক পরিকল্পনা পেশ করিলেন। এই পরিকল্পনায় ট্রিয়েস্ট্‌ ও উহার সীমান্ত অঞ্চলকে

মস্কো কন্‌ফারেন্স (ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

প্যারিস কন্‌ফারেন্স (এপ্রিল, ১৯৪৬)

দশ বৎসরের জন্য 'স্বাধীন অঞ্চল' বলিয়া ঘোষণা এবং উহার শাসনব্যবস্থা রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা, ইতালি, যুগোস্লাভিয়া ও ফ্রান্সের উপর ন্যস্ত করিবার এবং উহার নিরাপত্তার ভার ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর নিরাপত্তা পরিষদের (Security Council) হস্তে দিবার প্রস্তাব করা হইল। এইভাবে শেষ পর্যন্ত এই সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারিত হইল। ইতালি হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রশ্ন লইয়াও প্রথমে মতানৈক্য দেখা দিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়াকে ইতালি হইতে অন্তত দশ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে স্থির হইলে এই প্রশ্নেরও মীমাংসা হইল। অনুরূপ ইতালীয় উপনিবেশ-সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসাও সম্ভব হইলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই মোট ২১টি দেশের প্রতিনিধিগণ প্যারিস নগরীতে শান্তিচুক্তি রচনার উদ্দেশ্যে সমবেত হইলেন।

ট্রিয়েস্ট্ সমস্যা, ইতালি হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ ও ইতালীয় উপনিবেশ বণ্টনের সমস্যা ও জটিলতা—সমাধান

প্যারিস শান্তি সম্মেলন আহূত

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে প্রথম হইতে পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষভাবের নগ্ন প্রকাশ শুরু হইল। শান্তি সম্মেলনের কার্যপদ্ধতি হইতে শুরু করিয়া সকল প্রশ্নের ব্যাপারেই দীর্ঘ বিতর্ক ও পরস্পর আক্রমণ চলিতে লাগিল। সোভিয়েত রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতালির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে এক দৃঢ় অনমনীয় নীতি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে তাঁহার আপত্তি ও দাবির অনেক কিছুই ত্যাগ করিতে হইল। ইতালি ভিন্ন অপরাপর চারিটি দেশ—রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও ফিন্‌ল্যাণ্ড রাশিয়ার সন্নিকটস্থ এবং রুশ প্রভাবিত ছিল। এগুলির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে অবশ্য শেষ পর্যন্ত রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটভের মতের প্রাধান্য দেওয়া হইল। উপরি-উক্ত পাঁচটি দেশের সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে মোট নয়টি কমিটি নিয়োগ করিতে হইয়াছিল এবং মোট তিনশত সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ বিতর্কের পর মোট ৯৪টি বিষয়ে শান্তিচুক্তিগুলির খস্‌ড়া পরিবর্তিত হইল। অতঃপর ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর অধিবেশনের কালে নিউ ইয়র্কে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গ যখন সমবেত হইলেন তখন সেই সুযোগে শান্তিচুক্তিগুলির শর্তাদি সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি প্যারিসে শান্তি সম্মেলনের পুনরায় অধিবেশন শুরু হইল। এই সম্মেলনে মোট ২১টি দেশের

প্যারিসের শান্তি সম্মেলন (২৯শে জুলাই, ১৯৪৬)

পাঁচটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত (১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭)

প্রতিনিধিবর্গ ও ইতালি, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হইল।

(১) **ইতালির সহিত স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তি (Peace Treaty with Italy) :** ইতালির সহিত স্বাক্ষরিত শান্তিচুক্তির শর্তানুসারে ইতালীয় সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিল। (১) লিবিয়া, ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড ও এরিট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এই ব্যাপারে উপরি-উক্ত 'বৃহৎ চারি' (The Big Four) দেশের মধ্যে কোন প্রকার মতানৈক্য ঘটিলে ইউনাইটেড্ ন্যাশন্‌স্-এর সাধারণ সভা উহার মীমাংসা করিবে স্থির হইল। (২) ইতালি মণ্ট্ টেবর, মণ্ট্ সাইন, টেণ্ডা, বিগ্রা, সেণ্ট্ বার্ণার্ড, চেম্বার্টন প্রভৃতি স্থান ফ্রান্সকে, জারা, পেলাগোসা, ল্যাগোস্টা ও ডালম্যাশিয়ার উপকূল অঞ্চল যুগোস্লাভিয়াকে, ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ ও রোডস্ গ্রীসকে এবং সেসানোর দ্বীপ আল্‌বেনিয়াকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। (৩) ট্রিয়েস্ট্, ইস্ট্রিয়া, ভেনেজিয়ার একাংশ 'স্বাধীন অঞ্চল' (Free Territory) বলিয়া ঘোষিত হইল। (৪) ফ্রান্স ও যুগোস্লাভিয়ার সীমার নিকটবর্তী যাবতীয় ইতালীয় দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। ইতালি ২ লক্ষ ৫০ হাজার সৈনিক, বিমানবাহিনীর জন্য মোট ২৫ হাজার সামরিক কর্মচারী, ২০০ যুদ্ধ-বিমান ও ১৫০টি অপরাপর বিমান, ২টি যুদ্ধজাহাজ এবং ৪টি ক্রুইজারের বেশি সামরিক শক্তি, সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে পারিবে না। (৫) ইথিওপিয়া ও আল্‌বেনিয়ার স্বাধীনতা ইতালিকে স্বীকার করিতে হইবে এবং সাত বৎসরের মধ্যে রাশিয়াকে ১০০ মিলিয়ন ডলার, আল্‌বেনিয়াকে ৫ মিলিয়ন ডলার, ইথিওপিয়াকে ২৫ মিলিয়ন ডলার, যুগোস্লাভিয়াকে ১২৫ মিলিয়ন ডলার, গ্রীসকে ১০৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে। (৬) আফ্রিকাস্থ ইতালীয় উপনিবেশের উপর ইতালিকে অধিকার ত্যাগ করিতে হইবে।

শর্তাদি

(২) **রুমানিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি (Peace Treaty with Rumania) :** রুমানিয়া হাঙ্গেরীর নিকট হইতে ট্রান্সিলভ্যানিয়া ফিরিয়া পাইল, কিন্তু উত্তর বুকোভিনা ও বেসারাবিয়ার উপর রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে এবং বুলগেরিয়াকে দক্ষিণ দব্রুজা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন রুমানিয়া আট বৎসরের মধ্যে ৩০৩ মিলিয়ন ডলার রাশিয়াকে ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত

শর্তাদি

হইল। রুমানিয়ার সৈন্যসংখ্যা, নৌবল, বিমানবাহিনী প্রভৃতির সংখ্যাও হ্রাস করা হইল।

(৩) **বুলগেরিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি** (**Peace Treaty with Bulgaria**): বুলগেরিয়া রুমানিয়ার নিকট হইতে দক্ষিণ দব্রুদ্‌জা লাভ করিল। বুলগেরিয়াকে অবশ্য কোন স্থান হারাইতে হইল না। কিন্তু আট বৎসরের মধ্যে যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসকে মোট ৭০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইল। ইহা ভিন্ন বুলগেরিয়াকে পদাতিক, বিমান ও নৌবাহিনী হ্রাস করিতে হইল। গ্রীসের সীমার সন্নিকটে বুলগেরিয়ার কোন প্রকার সামরিক ঘাঁটি বা দুর্গ রাখা নিষিদ্ধ হইল।

শর্তাদি

(৪) **হাঙ্গেরীর সহিত শান্তিচুক্তি** (**Peace Treaty with Hungary**): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হাঙ্গেরীর যে রাজ্যসীমা ছিল তাহা পুনরায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু রুমানিয়ার নিকট হইতে হাঙ্গেরী ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ট্রান্সিলভ্যানিয়ার যে অংশ জয় করিয়া লইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন আট বৎসরের মধ্যে রাশিয়াকে ২০০ মিলিয়ন ডলার, যুগোস্লাভিয়াকে ৫০ মিলিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়াকে ৫০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দানে স্বীকৃত হইতে হইল।

শর্তাদি

(৫) **ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত শান্তিচুক্তি** (**Peace Treaty with Finland**): ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে ফিন্‌ল্যাণ্ডের যে সীমারেখা ছিল তাহা পুনরায় স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, কিন্তু ফিন্‌ল্যাণ্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালে রাশিয়ার সহিত চুক্তিদ্বারা কেরেলিয়া যোজক, পেস্টামো, স্যালা অঞ্চল এবং পঞ্চাশ বৎসরের জন্য পোরখালার বন্দোবস্ত প্রভৃতি যাহা কিছু স্বীকার করিয়া লইয়াছিল তাহা অনুমোদন করিতে বাধ্য হইল। ইহা ভিন্ন ফিন্‌ল্যাণ্ডে উৎপন্ন সামগ্রীদ্বারা আট বৎসরে তিনশত মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ রাশিয়াকে দিতে এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম হ্রাস করিতে বাধ্য হইল।

শর্তাদি

উপরি-উক্ত পাঁচটি শান্তিচুক্তির আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টই বুঝিতে

পারা যাইবে যে, এই সকল চুক্তির ফলে রাশিয়াই সর্বাধিক লাভবান হইয়াছিল। রাজ্যসীমা বিস্তৃতি, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ এবং বলকান অঞ্চলে প্রাধান্য প্রভৃতির দিক্ দিয়া বিচার করিলে উপরি-উক্ত পাঁচটি শান্তিচুক্তি রাশিয়ার কূটনৈতিক সাফল্যের নিদর্শন, একথা বলা যাইতে পারে।

রাশিয়ার কূটনৈতিক সাফল্য

(৬) **অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি (Peace Treaty with Austria) ঃ** জার্মানির ইওরোপীয় মিত্রশক্তিবর্গ, যথা রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, ইতালি ও ফিন্‌ল্যাণ্ডের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের কালে রাশিয়া ও অপরাপর শক্তিবর্গের পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষপ্রসূত মতানৈক্য তীব্র আকারে দেখা দিল। জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত অস্ট্রিয়া ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক নাৎসি অধিকার-মুক্ত হয়। ঐ বৎসর রাশিয়া কর্তৃক সমাজতন্ত্রবাদী কার্ল রেনার (Karl Renner) নামক জনৈক অস্ট্রীয় নেতার নেতৃত্বাধীনে অস্ট্রিয়ায় একটি সাময়িক সরকার গঠিত হয়। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ রাশিয়া কর্তৃক গঠিত অস্ট্রিয়ার সাময়িক সরকারকে স্বীকৃতি দান করে। ফলে মিত্রশক্তিবর্গ অস্ট্রিয়াকে আর শত্রু দেশ বলিয়া মনে করিত না। সেইজন্য নাৎসি অধিকার হইতে মুক্ত অস্ট্রিয়ার প্রতি আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স উদারতা প্রদর্শনের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু রাশিয়া অস্ট্রিয়া হইতে যুগোস্লাভিয়ার জন্য এক বিরাট রাজ্যাংশ দাবি করিল। ইহা ভিন্ন জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত হইবার পর যে সকল তৈল খনি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প-স্বার্থ অস্ট্রিয়াবাসী জার্মানির নিকট বিক্রয় করিয়া দিয়াছিল সেই সকল প্রতিষ্ঠান তথা অস্ট্রিয়াস্থিত জার্মানির যাবতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থও রাশিয়া দাবি করিয়া বসিল। পশ্চিমী শক্তিবর্গ জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত অস্ট্রিয়ার নিকট হইতে নাৎসি সরকার যে সকল সুযোগ-সুবিধা ও সম্পত্তি আদায় করিয়া লইয়াছিল তাহা অস্ট্রিয়াকে পুনরায় ফিরাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জার্মানি অস্ট্রিয়াস্থ মার্কিন ও ব্রিটিশ তৈল প্রতিষ্ঠানগুলিও অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অস্ট্রিয়াকে যদি জার্মানি কর্তৃক অধিকৃত যাবতীয় সম্পদ ও সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মার্কিন

রাশিয়া কর্তৃক অস্ট্রিয়ার মুক্তিসাধন ও অস্থায়ী সরকার গঠন

অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তির শর্তাদির ব্যাপারে রাশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিন মতানৈক্য

ও ব্রিটিশ স্বার্থ পুনরুদ্ধার সম্ভব হইবে। এজন্যই ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবর্গ অস্ট্রিয়াকে এই সকল সম্পত্তির মালিকানা ফিরাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিল। ফলে রাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল তাহাতে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করা সম্ভব হইল না, অস্ট্রিয়ার রাজ্য-সীমায় রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের সৈন্য মোতায়েন করা হইল।

১৯৪৭—১৯৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত শান্তিচুক্তি প্রস্তুতের চেষ্টার আংশিক সাফল্য

১৯৪৭ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদ (Foreign Ministers' Council) অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তির খসড়ার মাত্র কয়েকটি শর্ত মানিয়া লইয়াছিল। মস্কো (মার্চ ১৯৪৭), লণ্ডন (ডিসেম্বর ১৯৪৭) ও প্যারিসে (মে-জুন ১৯৪৬) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদের অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বিষয়ের সমাধান সম্ভব হইল। যুগোস্লাভিয়ার জন্য রাশিয়া অস্ট্রিয়ার একাংশ দাবি করিয়াছিল তাহা রাশিয়া ত্যাগ করিল। পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ অস্ট্রিয়াস্থ জার্মান সম্পত্তি সম্পর্কে রাশিয়ার দাবির অনেকটাই স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরে অস্ট্রিয়ার পশ্চিম অংশে সামরিক সাজসজ্জা বৃদ্ধি, ট্রিয়েস্ট্ সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক উহার শর্তভঙ্গ প্রভৃতি প্রশ্ন রাশিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত হইলে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রহিল।

রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন পররাষ্ট্র-মন্ত্রিবর্গ অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তি সম্পাদনের জন্য পুনরায় সচেষ্ট হইলেন। এ বিষয়ে তাঁহারা একটি খসড়াও প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু রাশিয়ার সমর্থন তাঁহারা লাভ করিতে পারিলেন না। এইভাবে রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে মতানৈক্য হেতু অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে স্টালিনের মৃত্যু ঘটিলে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ সোভিয়েত রাশিয়ার সহিত পুনরায় এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করিলেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র-মন্ত্রিগণ ওয়াশিংটনে এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া সোভিয়েত রাশিয়াব সহিত বার্লিনে অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি সম্পর্কে আলোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের

রাশিয়ার অনমনীয় নীতির পরিবর্তন—সুপ্রীম সোভিয়েতে মলটভের বক্তৃতায় রুশ নীতির ব্যাখ্যা

জানুয়ারি মাসে বার্লিনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভা বসিল। কিন্তু রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলটভ্-এর অনমনীয় মনোভাবের ফলে এইবারও সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মলটভ্ সোভিয়েত রাশিয়ার জাতীয় আইনসভা 'সুপ্রীম সোভিয়েত' (Supreme Soviet)-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি সম্পর্কে সোভিয়েত নীতি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন। ইহাতে তিনি তিনটি নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন: (১) অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সংযুক্তি নিষিদ্ধকরণ, (২) অস্ট্রিয়ার নিরস্ত্রীকরণ ও নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে স্থাপন ও (৩) রুশ-ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন প্রতিনিধিবর্গের কন্‌ফারেন্সে অস্ট্রিয়া ও জার্মানির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও নীতি নির্ধারণ। ইহার পর অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর জুলিয়াস রা-ব (Julius Raab)-কে মস্কোতে আলাপ-আলোচনার জন্য আহ্বান করা হইল।

সোভিয়েত রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মতৈক্য

অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর ফিগ্‌ল ও চ্যান্সেলর রা-ব মস্কো নগরীতে মার্শাল বুল্‌গানিন ও মলটভের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইলেন। ফলে সোভিয়েত সরকার অস্ট্রিয়া হইতে সৈন্য অপসারণে, পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের সহিত একযোগে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে এবং ১০ মিলিয়ন টন খনিজ তৈল এবং ১৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময়ে অস্ট্রিয়ার শিল্প, বাণিজ্য, তৈলখনি প্রভৃতি অস্ট্রিয়াকে ফিরাইয়া দিতে রাজী হইলেন। পক্ষান্তরে অস্ট্রীয় সরকার কোন শক্তির সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদন বা অস্ট্রিয়ার কোন স্থানে বিদেশী ঘাঁটি স্থাপনের অনুমতি দান করিবেন না—এই প্রতিশ্রুতি দানে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পর অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনে আর কোন বাধা রহিল না। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে ভিয়েনায় রাশিয়া, ব্রিটেন,

অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত (১৫ই মে, ১৯৫৫)

আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতগণ অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে (১) অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হইল। (২) ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে অস্ট্রিয়ার যে রাজ্যসীমা ছিল তাহা পুনরায় নির্ধারিত হইল। (৩) জার্মানির সহিত অস্ট্রিয়ার সংযুক্তি (Auschluss) নিষিদ্ধ হইল। (৪) কোন কোন বিশেষ ধরণের অস্ত্রশস্ত্র

শর্তাদি

অস্ট্রিয়ার পক্ষে রাখা চলিবে না এই শর্তও সন্নিবিষ্ট হইল। (৫) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ, নাৎসি প্রতিষ্ঠান মাত্রেই নিষিদ্ধকরণ এবং

দানিউব নদীতে সকলের অবাধভাবে নৌচালনার অধিকার, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে মিত্রপক্ষীয় সেনাবাহিনীর অপসারণ প্রভৃতি শর্তও সন্নিবিষ্ট হইল। এইভাবে অস্ট্রিয়ার সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল।

(৭) জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনের সমস্যা (Problem of Peace Treaty with Germany) : জার্মানির সহিত মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে মতানৈক্য প্রথম হইতেই দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে অদ্যাপি এ বিষয়ে কোন সমাধানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির পতনের পর রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানি অধিকৃত হয়। এই সকল রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলে তাহারা পৃথক পৃথক শাসনব্যবস্থা স্থাপন করে। জার্মানির রাজধানী বার্লিন শহরও অনুরূপ চারিভাগে বিভক্ত হয়। কিন্তু সমগ্র শহরের শাসনকার্য যাহাতে একইরূপে পরিচালিত হইতে পারে সেজন্য মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির অর্থাৎ রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রতিনিধি লইয়া একটি পরিষদ (Inter-Allied Body) স্থাপিত হয়। ইহা ভিন্ন সমগ্র জার্মানির শাসনকার্যের মধ্যে যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষার উদ্দেশ্যে 'কণ্ট্রোল কাউন্সিল' (Control Council) নামে একটি পরিষদও স্থাপিত হয়। রাশিয়া, আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সমর অধিনায়কগণ নিজ নিজ এলাকার শাসনকার্য কণ্ট্রোল কাউন্সিলের পরামর্শ ও সাহায্য-সহায়তা লইয়া সম্পাদন করিবেন এই ছিল ব্যবস্থা। কিন্তু প্রথম হইতেই উপরি-উক্ত চারিটি দেশের প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে ঘোরতর মতভেদ দেখা দিল। রুশ প্রতিনিধি মলটভ্ জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ এবং উহার কি পরিমাণ রাশিয়া পাইবে সে বিষয় স্থির করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। ইহা ভিন্ন, ব্রিটিশ অধিকৃত রুহ্‌র অঞ্চলের শাসন তথা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়ার অংশও মলটভ্ দাবি করিলেন। ক্রমেই সোভিয়েত রাশিয়া ও অপরাপর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য বাড়িয়া চলিল। জার্মানির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়, জার্মানির সামগ্রিক অর্থনৈতিক ঐক্য বজায় রাখা,

রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য

'কণ্ট্রোল কাউন্সিল' স্থাপন

রাশিয়া ও পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ

জার্মানির নাৎসিবাদের অবসান, জার্মানির সামরিক নিরস্ত্রীকরণ এবং জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের রাজ্যসীমা নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়া ও অপরাপর রাষ্ট্রবর্গ অর্থাৎ পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে মতানৈক্য হেতু বিবাদ শুরু হইল। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনপ্রকার মীমাংসা সম্ভব না হইলে মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব বার্ণেস (Byrnes) পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ অধিকৃত জার্মানির অংশসমূহের ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। জার্মানির ভয়ে ভীত ফ্রান্স এই প্রস্তাবে সম্মত হইল না। এমতাবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন অংশ দুইটি সংযুক্ত হইল। জার্মানির সর্বাধিক শিল্পোন্নত অঞ্চল হইল রুহ্‌র। এই অঞ্চল ব্রিটিশ অধিকারে ছিল। ইঙ্গ-মার্কিন অংশদ্বয়ের সংযুক্তিতে রুহ্‌র অঞ্চলের অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের হস্তে থাকিবে এবং রুশ বা ফরাসী সরকার এই ব্যাপারে কোন অংশ গ্রহণের সুযোগ পাইবে না, এজন্য সোভিয়েত রাশিয়া এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করিল। ফ্রান্স অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিন সরকারের সহিত যোগদান করিলে ব্রিটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের অধিকৃত অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইল (১৯৪৭)। কেবলমাত্র রাশিয়া ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। এই তিন সরকারের অধীন অঞ্চলসমূহ 'পশ্চিম-জার্মানি' এবং রুশ সরকার অধিকৃত অঞ্চল 'পূর্ব-জার্মানি' নামে অভিহিত হইল।

ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী অধিকৃত জার্মানির (পশ্চিম জার্মানির) অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপন

পর বৎসর (১৯৪৮ খ্রীঃ) বার্লিন শহরের যে অংশ রাশিয়ার অধিকারে ছিল সেই অংশ ভিন্ন অপরাপর অংশ এবং পশ্চিম-জার্মানির প্রতিনিধি লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী সরকার একটি সংবিধান সভা (Constituent Assembly) গঠন করিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধাবসানে উইমার সংবিধান সভা যে সংবিধান জার্মানিতে চালু করিয়াছিলেন সেই সংবিধানের ভিত্তিতে রচিত 'বন্ সংবিধান' (Bonn Constitution) ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] পশ্চিম-জার্মানিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হইল। ইতিপূর্বেই পশ্চিম-জার্মানিতে এক নূতন মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করিয়া এবং নানা-প্রকার অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করিয়া পশ্চিম-জার্মানির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হইয়াছিল। রাশিয়াও নিজ অধিকৃত অঞ্চলে একটি নূতন শাসন-ব্যবস্থা চালু করিয়া নানাবিধ ভূমি-সংক্রান্ত সংস্কার সাধন করিল। এইভাবে

পশ্চিম-জার্মানিতে বন্ সংবিধান প্রবর্তন

জার্মানি তুইটি পরস্পর-বিরোধী অংশে বিভক্ত হইয়া গেল। রাশিয়া এবং পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে জার্মানির উপর প্রাধান্য লইয়া যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার মূল কথা হইল এই যে, উভয় পক্ষই জার্মানিকে নিজের দলে টানিয়া অপর পক্ষের বিরুদ্ধে রক্ষা-প্রাচীরের ন্যায় ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী শক্তিবর্গ পশ্চিম-জার্মানিকে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ-কেন্দ্রে পরিণত করিতে চাহিতেছে, পক্ষান্তরে রাশিয়া পূর্ব-জার্মানিকে ইওরোপীয় মহাদেশের অন্তঃস্তলে সাম্যবাদের কেন্দ্রস্বরূপ করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। সুতরাং জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। [জার্মানির বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব-জার্মানিতে নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন

জার্মানিতে সাম্যবাদ ও পশ্চিমী গণতন্ত্রের আদর্শগত দ্বন্দ্ব

(৮) জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি (Peace Treaty with Japan) : ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ১৪ তারিখ জাপান বিনা শর্তে মার্কিন সমর অধিনায়ক ড্যাগলাস্ ম্যাক্ আর্থার (Douglas MacArthur)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে। জাপানের পরাজয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, সুতরাং পরাজিত জাপানের উপর আমেরিকাব একপ্রকার একক প্রাধান্য-ই স্থাপিত হইল। ব্রিটেন, চীন, সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন প্রতিনিধিবর্গ লইয়া মিত্রপক্ষীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হইলেও উহার উপদেশ গ্রহণ বা বর্জন ব্যাপারে জেনারেল ম্যাক্ আর্থারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তিনিই ছিলেন সুদূর প্রাচ্যাঞ্চলের সর্বোচ্চ সমর অধিনায়ক। এমতাবস্থায় জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি ব্যাপারে কিংবা জাপানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই প্রকৃত ক্ষমতা ছিল বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, কোরিয়ার যুদ্ধ, চীনের বিপ্লব প্রভৃতির ফলে জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব ঘটিল। অবশেষে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে জাপানের সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে এক কন্‌ফারেন্স আহুত হইল। আমেরিকা সহ মোট ৫২টি দেশ এই কন্‌ফারেন্সে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হইল। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জাপানের সহিত শান্তি-

জাপানের পরাজয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাধিক অংশ গ্রহণ

চীনের বিপ্লব ও কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বিলম্ব

চুক্তির খস্‌ড়ার কয়েকটি শর্তের বিরোধিতা করিলেন। জাপানের বোনিন ও রিউকু (Bonin and Ryuku) দ্বীপ দুইটি মার্কিন নিয়ন্ত্রণে স্থাপনের এবং জাপানে বিদেশী সৈন্য মোতায়েন রাখিবার শর্তগুলির পরিবর্তনের প্রস্তাবও তিনি করিলেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট্ ট্রুম্যান উহার কোন গুরুত্ব দান না করিলে ভারত সানফ্রান্সিকো কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিল না। অবশিষ্ট ৫১টি দেশ সানফ্রান্সিকো কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিল বটে, কিন্তু সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর সহিত পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে শান্তিচুক্তির শর্তাদি লইয়া মতানৈক্য দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট ৪৮টি রাষ্ট্র ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১ জাপানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রচিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল হইতে এই চুক্তি বলবৎ হইয়াছে।

সানফ্রান্সিস্কো কন্‌ফারেন্স—শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১)

এই শান্তিচুক্তির শর্তানুসারে জাপানকে কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইল। ইহা ভিন্ন কোয়েলপার্ট দ্বীপ, দাগেলেত ও হ্যামিণ্টন বন্দর কোরিয়াকে ছাড়িয়া দিতে হইল। ফরমোজা, কিউরাইল, শাখালিন, পেস্কাডোরিস্ দ্বীপপুঞ্জ, প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি এবং চীনের উপর জাপান সর্বপ্রকার দাবি ত্যাগ করিল। জাপান অনাক্রমণ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল প্রকার আন্তর্জাতিক বিবাদ মিটাইতে এবং এবিষয়ে ইউনাইটেড্ ন্যাশনস্-এর চার্টার মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইল। জাপানকে নিজ নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এককভাবে অপর এক বা একাধিক মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের সহিত সামরিক চুক্তি সম্পাদনের অধিকার দেওয়া হইল। চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে বিদেশী সৈন্য জাপান ত্যাগ করিবে, কিন্তু জাপান স্বেচ্ছায় যে-কোন মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী জাপানে রাখিতে পারিবে। অপর এক শর্ত দ্বারা জাপান শান্তিচুক্তিতে যোগদানকারী রাষ্ট্রবর্গের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিল। শান্তিচুক্তি বলবৎ হইবার সময় হইতে মোট চারি বৎসর জাপান শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানে স্বীকৃত হইল। জাপানের নিকট হইতে দ্বিতীয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ আদায় করিলে জাপান অর্থনৈতিক দিক দিয়া পঙ্গু হইয়া পড়িবে এই কারণে স্থির হইল যে, মিত্রপক্ষীয়

শান্তিচুক্তির শর্তাদি

যে দেশ জাপানের সহিত যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেই দেশ করিলে জাপানের নিকট হইতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষতি-পূরণের পরিবর্তে জাপানী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য-সহায়তা লাভ করিতে পারিবে। যুদ্ধের পূর্বকালীন ঋণের ব্যাপারেও জাপান মহাজন দেশের সহিত সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা করিবে। এই শান্তিচুক্তির শর্তাদি সম্পর্কে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে আন্তর্জাতিক বিচারালয় কর্তৃক উহা মীমাংসিত হইবে, স্থির হইল।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারত সানফ্রান্সিস্কো কনফারেন্সে যোগদান করে নাই। স্বভাবতই এই শান্তিচুক্তিও ভারত স্বাক্ষর করে নাই।

ভারত-জাপান শান্তিচুক্তি (১৯৫২)

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার জাপানের সহিত পৃথক-ভাবে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই চুক্তির শর্তানুসারে জাপান ও ভারত পরস্পর পরস্পরের সম্পত্তি ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ভারত জাপানের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দুই দেশ পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ অধিকার দানে স্বীকৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য জাপানের প্রতি ভারত এক উদার, মিত্রতাপূর্ণ নীতি প্রথম হইতেই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি (Japan-U.S. security pact)

জাপানের সহিত মিত্রপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের (সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৫১) সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে একটি নিরাপত্তা-মূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মোট ২৯টি শর্তসম্বলিত এই জাপান-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির প্রথম শর্তানুসারে জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জাপানের অভ্যন্তরে এবং সীমান্ত দেশে সামরিক, নৌ ও বিমান বাহিনী মোতায়েন রাখিবার অধিকার দানে বাধ্য হয়। সুদূর প্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শর্তটি জাপানের উপর চাপাইয়া দিয়া জাপানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংরক্ষিত দেশে পরিণত করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।* দ্বিতীয় শর্তানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ভিন্ন জাপান অপর কোন রাষ্ট্রকে কোনপ্রকার অধিকার দিতে পারিবে না।

* Vide, Schuman,

শর্তানুসারে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আলোচনাক্রমে জাপানের কোন্ কোন্ স্থানে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে, এই নীতি নির্ধারিত হয়।

শর্তাদি

চতুর্থ শর্তানুসারে স্থির হয় যে, জাপান তথা সুদূর প্রাচ্যের নিরাপত্তা ইউনাইটেড্ ন্যাশন্স্ বা অপর কোন রাষ্ট্রজোটের মাধ্যমে রক্ষা করা সম্ভব হইবে মনে হইলেই জাপান ও মার্কিন সরকার এই নিরাপত্তা চুক্তির অবসান ঘটাইবে। অপরাপর শর্তের দ্বারা জাপানে প্রবেশকারী মার্কিন জাহাজ, বিমান প্রভৃতির কোন শুল্ক দিতে হইবে না এবং মার্কিন সরকারের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জাপানে আনীত কোনপ্রকার সামগ্রীর উপর শুল্ক স্থাপন করা হইবে না, জাপানে অবস্থানকারী মার্কিন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ মার্কিন সামরিক বিচারালয়ের অধীন থাকিবে। এই ধরণের নানাপ্রকার অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

(The United Nations)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর উৎপত্তি (Origin of the United Nations): প্রত্যেক যুদ্ধেরই হত্যালীলা ও বীভৎসতা, ক্লান্তি ও হতাশা মানুষকে অন্তত সাময়িকভাবে শান্তিকামী করিয়া তোলে। কিন্তু যুদ্ধের স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যাইবার পূর্বেই মানুষ আবার রণমদে মত্ত হইয়া উঠে, এই কারণেই মানবজাতির ইতিহাসের শুরু হইতে এযাবৎ মানুষ যুদ্ধ ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। যুদ্ধ হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করাই মানবজাতির সর্বাধিক জটিল সমস্যা। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যুঝিবার পর ইওরোপীয় দেশগুলি যখন শ্রান্ত,

যুদ্ধের বীভৎসতা ও হত্যালীলার ফলে শান্তির স্পৃহা

ক্লান্ত, অর্থ ও লোকবলহীন হইয়া পড়িয়াছিল তখনও আন্তর্জাতিক শান্তির এক ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। উহার ফলেই ইওরোপীয় কন্‌সার্ট (Concert of Europe)-এর উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখাই ছিল এই সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। সেই সময়ের আন্তর্জাতিক শান্তি বলিতে অবশ্য ইওরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্রের শান্তি বুঝাইত। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রায় চল্লিশ বৎসর দমনমূলক নীতির মাধ্যমে ইওরোপকে ব্যাপক যুদ্ধ হইতে রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু যুদ্ধ ত্যাগের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই।

ইওরোপীয় কন্‌সার্ট

রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজাণ্ডার খ্রীষ্টধর্মের মূল-নীতির উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত 'পবিত্র চুক্তি' বা Holy Alliance-এর মাধ্যমে ইওরোপীয় রাজগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সৃষ্টি করিয়া আন্তর্জাতিক বিবাদ-বিসংবাদের অবসান ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি হাস্যাস্পদই হইয়াছিলেন। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র-প্রতিনিধিবর্গ জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মন রক্ষার জন্যই উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নহে।

পবিত্রচুক্তি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা ও হত্যালীলা যেমন পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে শান্তির স্পৃহাও তেমনি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই শান্তির স্পৃহা 'লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিষ্ঠায় রূপলাভ করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-ই সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছিল। আন্তর্জাতিকতা যে ইওরোপ মহাদেশ ছাড়াইয়া সমগ্র পৃথিবীতে প্রসারিত হইয়াছিল তাহা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর গঠন-পদ্ধতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনিতে সমর্থ হইল না। ফলে দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগকে শান্তির যুগ না বলিয়া যুদ্ধ বিরতির যুগ বলিয়া অভিহিত করা অযৌক্তিক হইবে না। প্রথম যুদ্ধের বীভৎসতার স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যাইবার পূর্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হইয়াছিল।

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, মারণাস্ত্রের অভিনবত্ব ও মারণ ক্ষমতা, অভাবনীয় পরিমাণ সম্পত্তি ক্ষয় এবং অগণিত সামরিক ও বেসামরিক লোকের প্রাণনাশ একথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছে যে, শান্তি ও

নিরাপত্তা রক্ষা করিতে না পারিলে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে। নিশ্চিত এবং সর্বাত্মক ধ্বংস অথবা আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য, সমবায় ও শান্তি এই দুই পন্থার একটি মানবজাতিকে বাছিয়া লইতে হইবে। এই কঠোর বাস্তবতা উপলব্ধি করিয়াই ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের চেষ্টা শুরু হইয়াছিল। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই এবিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আটলান্টিক মহাসাগরে একটি জাহাজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর 'আটলান্টিক চার্টার' (Atlantic Charter) নামে একটি সনন্দ প্রচার করেন। পর বৎসর (১৯৪২) জানুয়ারি মাসে এই সনন্দটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই সনন্দের মোট আটটি ধারায় কতকগুলি নীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, যথা: (১) কোন রাষ্ট্র কোনপ্রকার বিস্তারনীতি অনুসরণ করিবে না; (২) পররাষ্ট্রের সীমা নির্ধারণে আটলান্টিক চার্টার-এ স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের মতামত না লইয়া কিছু করিবে না; (৩) পরাধীন জাতিমাত্রেরই স্বাধীনতালাভের অধিকার এবং প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের নিজস্ব ইচ্ছামত শাসনব্যবস্থা গঠন করিবার অধিকার আটলান্টিক চার্টার স্বাক্ষরকারী দেশমাত্রেই স্বীকার করিবে। (৪) ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং অপরাপর অর্থনৈতিক বিষয়ে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিজিত-বিজেতা সকল রাষ্ট্রেরই সমান অধিকার স্বীকৃত হইবে; (৫) সামাজিক নিরাপত্তা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পর সহযোগিতা ও সমবায়-নীতি অনুসরণ করিবে; (৬) নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ের পর প্রত্যেক রাষ্ট্রই যাহাতে বৈদেশিক আক্রমণের ভয়, অভাব-অনটন প্রভৃতি হইতে মুক্ত থাকিয়া উন্নততর জীবনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে সেরূপ পরিস্থিতি গড়িয়া তুলিতে সকলে সচেষ্ট থাকিবে; (৭) সমুদ্রপথ সকল রাষ্ট্রের নিকটই সমভাবে উন্মুক্ত থাকিবে; (৮) সকল রাষ্ট্রই সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র, নৌ, বিমান ও সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা—ব্যাপক শান্তি-স্পৃহা

আটলান্টিক চার্টার

আটলান্টিক চার্টারের শর্তাদি

আটলাণ্টিক চার্টার প্রথমে ২৬টি দেশ এবং পরে আরও ২৯টি দেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই মোট ৫৫টি স্বাক্ষরকারী দেশের অন্যতম ছিল ভারত। এই সকল স্বাক্ষরকারী দেশ লইয়াই ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াংটা নামক স্থানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী স্টালিন এক কন্‌ফারেন্সে সমবেত হইয়া আমেরিকার সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে সম্মিলিত জাতিসমূহ বা ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর এক অধিবেশন আহ্বান করা স্থির করিলেন। এই সিদ্ধান্তানুসারে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল হইতে ২৬শে জুন পর্যন্ত সান্‌ফ্রান্সিস্কো শহরে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর অধিবেশন চলিল। সেই অধিবেশনে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টার পঞ্চান্নটি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। এই সনন্দ বা চার্টার স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ প্রকৃত কার্যকরী রূপলাভ করিল। এই চার্টারের শর্তাদি হইতে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। মোট ১১১টি ধারাসম্বলিত এই চার্টার বা সনন্দে চারিটি মৌলিক উদ্দেশ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা: আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধান করা ও শান্তি বজায় রাখা; প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য স্থাপন করা; পৃথিবীর বিভিন্নাংশের মানবগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃষ্টিমূলক যাবতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে আন্তর্জাতিক সমবায় ও সহযোগিতা স্থাপন করা; এবং মানবজাতির যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা মোচন করিয়া পৃথিবীর মানুষমাত্রকেই প্রকৃত মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা দান করা। এই সকল মৌলিক উদ্দেশ্য কার্যকরী করিবার পন্থা হিসাবে জাতি-ধর্ম-ভাষা-নির্বিশেষে পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতিকেই 'জাতির মর্যাদা, দানের নীতি স্বীকৃত হইল। ইহা ভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি, আইন-কানুন মানিয়া চলা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের অবসান ঘটাইবার নীতি এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর মূল-নীতি ভঙ্গকারী দেশের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড

৫৫টি দেশ কর্তৃক আটলাণ্টিক চার্টার স্বাক্ষরিত

ইয়াণ্টা কন্‌ফারেন্স

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ চার্টার (United Nations Charter)

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর উদ্দেশ্য ও আদর্শ

ন্যাশন্‌স্‌কে সাহায্যদানের কর্তব্য স্বীকৃত হইল। অপর কোন রাষ্ট্রের সীমা লঙ্ঘন না-করা অথবা কোন রাষ্ট্রের উপর বলপ্রয়োগ না-করা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যার সমাধানকল্পে পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করা—প্রভৃতি নীতিও স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ মানিয়া লইল।

উপরে বলা হইয়াছে যে, মোট পঞ্চান্নটি দেশ ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টার স্বাক্ষর করিয়াছিল। এই ৫৫টি 'Charter Members' ভিন্ন অপরাপর রাষ্ট্রকেও সদস্যপদভুক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সিকিউরিটি কাউন্সিলের (Security Council) সুপারিশক্রমে সাধারণ সভার (General Assembly) দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সমর্থিত হইলে যে-কোন নূতন সদস্য গ্রহণ করা চলিবে। কিন্তু ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যপদ প্রার্থী রাষ্ট্রমাত্রকেই 'শান্তিপ্রিয়' (Peace-loving) হইতে হইবে এবং ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টারে সন্নিবিষ্ট নীতি মানিয়া চলিতে এবং সেজন্য যথাযথ দায়িত্বপালনে রাজী হইতে হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যবর্গের প্রধান পাঁচজনের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও কুয়ো-মিং-তাং-এর প্রতিনিধিবর্গ) প্রত্যেকেরই 'ভিটো' (Veto) প্রয়োগের ক্ষমতা রহিয়াছে অর্থাৎ এই পাঁচজনের যে-কোন কেহ 'ভিটো' প্রয়োগ করিয়া কাউন্সিলের বিবেচনাধীন যে-কোন বিষয়কে বাতিল করিয়া দিতে পারেন। ফলে, এই পাঁচজনের মতৈক্য না থাকিলে কোন নূতন সদস্য গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কমিউনিস্ট্‌ চীনের সদস্যপদভুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অসম্মতি বাধার সৃষ্টি করিতেছে।

নূতন সদস্যভুক্তির শর্ত ও পদ্ধতি

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর কর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ছয়টি প্রধান সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। এগুলির অধীনে আবার নানাপ্রকার শাখা, উপশাখা আছে। প্রধান ছয়টি সংস্থা হইল: (১) সাধারণ সভা (General Assembly)। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যমাত্রেই এই সভার সদস্য। প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে মোট পাঁচজন সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রের একাধিক ভোট থাকিবে না। প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ সভার অধিবেশন আহূত হইবে। ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর চার্টার-এ

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সংগঠন

(১) সাধারণ সভা (General Assembly)

সন্নিবিষ্ট যাবতীয় বিষয়-সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণ সভায় করা চলিবে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি-সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে যে-কোন সদস্য বা সদস্য নহে এরূপ রাষ্ট্রের পক্ষে কোন প্রতিনিধিও আলোচনা করিতে পারেন।

অধিকার ও ক্ষমতা

সিকিউরিটি কাউন্সিল (Security Council)-এর অস্থায়ী সদস্য এবং অছি পরিষদ (Trusteeship Council) ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Council)-এর সকল সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। আইনসভার নিম্নকক্ষের ন্যায় ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর সাধারণ সভা একটি পরিদর্শক, সমালোচক ও আলোচনা সভা।* তবে আইনসভার নিম্নকক্ষের মত ক্ষমতা ইহার নাই।

(২) নিরাপত্তা পরিষদ বা সিকিউরিটি কাউন্সিল (Security Council) ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর কার্যনির্বাহক সমিতিস্বরূপ। পাঁচজন স্থায়ী এবং ছয়জন অস্থায়ী সদস্য লইয়া এই পরিষদটি গঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া ও কুয়ো-মিং-তাং চীন হইল পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। অপর ছয়টি

নিরাপত্তা বা স্বস্তি পরিষদ (Security Council)

অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে তিনটি করিয়া প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নির্বাচিত হইয়া থাকে। এই সকল অস্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের কার্যকাল দুই বৎসর মাত্র। স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের কোনটির সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে সেই সম্পর্কে আলোচনায় ভোটদানের অধিকার উহার থাকিবে না। নিরাপত্তা পরি-

'The Big Five

পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্রই 'বড় পাঁচজন' (The Big Five) নামে অভিহিত। এই সকল স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের 'ভিটো' প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। ভিটো প্রয়োগ দ্বারা ইহাদের যে-কোনটি সিকিউরিটি কাউন্সিলের যে-কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষাই হইল সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রাথমিক দায়িত্ব। আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইতে পারে এরূপ যে-কোন

* 'a deliberative organ, an overseeing, reviewing and criticizing organ.' Vide Langsam, p. 701.

† 'To the Security Council was entrusted "Primary responsibility for the maintenance of international peace and security." *Ibid*, p. 701.

বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করিবার ভার এই পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে।

নিরাপত্তা পরিষদের কর্তব্য ও দায়িত্ব

ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর চার্টারে বর্ণিত উপায়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হইবে। এই পরিষদ প্রয়োজনবোধে সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ভিন্ন অপরাপর যে-কোন প্রকার সাহায্য দান করিবে। ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিতে সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন হইলে সিকিউরিটি কাউন্সিল সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে পদাতিক, বিমান ও নৌবাহিনী দিয়া সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতে পারে। এ বিষয়ে সিকিউরিটি কাউন্সিলকে Military Staff Committee-র পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর চার্টার অনুযায়ী যে-কোন সদস্য-রাষ্ট্র নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক সামরিক জোট গঠন করিতে পারিবে।

(৩) সদস্য রাষ্ট্রের কল্যাণ, স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে, পরস্পর সৌহার্দ্য ও সমবায়ের উদ্দেশ্যে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকারত্বের অবসান, শিক্ষার প্রসার এবং 'মানব-অধিকার' (Human Rights) সমূহ কার্যকরী করিবার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic & Social Organisation)

মোট আঠার জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত। খাদ্য ও কৃষি পরিষদ (Food and Agriculture Organization : FAO), আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (International Bank), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (International Monetary Fund : IMF), আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (International Labour Organization : ILO), ইউনাইটেড ন্যাশনস্ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization : UNESCO) প্রভৃতি সংস্থা ও পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) অছি পরিষদ বা Trusteeship Council ম্যাণ্ডেট্ রাজ্যসমূহের এবং যে-সকল অঞ্চল উহার অধীনে স্থাপন করা হইবে সেগুলির শাসন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

উরুণ্ডি, ক্যামেরুন্স্, টোগোল্যাণ্ড, পশ্চিম সেমোয়া প্রভৃতি অঞ্চল অছি পরিষদের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে।

(৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)-এর উপর আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে আইন-সংক্রান্ত বিষয়াদি, আন্তর্জাতিক অধিকার, বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের আইনগত বিবাদ প্রভৃতির বিচারের ভার ন্যস্ত। মোট পনর জন বিচারপতি লইয়া আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত। কোন একটি রাষ্ট্র হইতে একাধিক বিচারপতি নিয়োগ করা যায় না। ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর সদস্য রাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে বাধ্য।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)

(৬) ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর একটি দপ্তর (Secretariat) আছে। এক বিশাল সংখ্যক কর্মচারী এই দপ্তরের কাজে নিযুক্ত আছে। ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর সেক্রেটারী-জেনারেল ইউনাইটেড ন্যাশনসের যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ কার্যকরী করিয়া থাকেন। সিকিউরিটি কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে জেনারেল এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারী-জেনারেল নিযুক্ত করিয়া থাকে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারে এরূপ যে-কোন বিষয় সম্পর্কে সেক্রেটারী-জেনারেল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। বৎসরে একবার করিয়া তিনি বাৎসরিক কার্যবিবরণী সাধারণ সভা বা জেনারেল এ্যাসেম্বলীর নিকট পেশ করিয়া থাকেন।

ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর দপ্তর (U. N. Secretariat)

সেক্রেটারী-জেনারেল (Secretary-General)

ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর কার্যাদি (Functions of the United Nations) : ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে গিয়া স্বভাবতই ইউনাইটেড ন্যাশনসকে কতকগুলি কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। এই সকল কার্যের মধ্যে প্রথমত, অন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং যুদ্ধের ভীতি হইতে পৃথিবীকে মুক্ত রাখিবার জন্য মধ্যস্থতার মাধ্যমে ইউনাইটেড ন্যাশনস্ রাষ্ট্রবর্গের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করিয়া থাকে। বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আলোচনার মাধ্যম হিসাবে ইউনাইটেড ন্যাশনস্ কাজ করে। যুদ্ধরত রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি ঘটানও ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর অন্যতম কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির পরিবর্তন যাহাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে করা যাইতে পারে সেজন্য সাহায্য করাও ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর কর্তব্য। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইন-

ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কর্তব্য কার্যাদি

কানুনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সেগুলিকে বিধিবদ্ধ করা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর চার্টারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যক্তি ও রাষ্ট্রমাত্রেরই অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নসাধন এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষমাত্রকেই মানুষের অধিকারে স্থাপন করিবার চেষ্টা, আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য, সমবায় ও সহায়তার মাধ্যমে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর উন্নতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করাও ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর কর্তব্য-কার্যের অন্যতম। চতুর্থত, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বিভিন্ন আদর্শ ও মতবাদ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহ-অবস্থানের মনোভাব জাগাইয়া তোলা ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর দায়িত্ব।

এই সকল কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে ইউনাইটেড ন্যাশনস্ গত ১৬ বৎসর যাবৎ কি করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার আলোচনা প্রয়োজন। ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর কার্যকলাপ যদিও পূর্ণমাত্রায় সন্তোষজনক বলা যায় না, তথাপি উহার কার্যাদি আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বহু বিপদ দূর করিতে এবং অন্যান্য বহুক্ষেত্রে বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। (১) ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৬ই জানুয়ারি) ইরাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে পরস্পর চুক্তি অনুযায়ী রুশ সৈন্য ইরাণে মোতায়েন করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধাবসানেও সেই সৈন্য অপসারিত না হওয়ায় ইরাণ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে শেষ পর্যন্ত এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে এই বিবাদের অবসান ঘটে। ফলে সোভিয়েত সৈন্যও ইরাণ হইতে অপসরণ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইরাণের অভিযোগ

(২) সিরিয়া ও লেবাননে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মোতায়েন ছিল। সেই সৈন্য অপসারণের জন্য সিরিয়া ও লেবানন ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর নিকট আবেদন করিলে ইউ-নাইটেড ন্যাশনস্ ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য শীঘ্রই অপসারিত হউক সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী সরকারদ্বয় নিজ নিজ সৈন্য অপসারণ করিয়া লইলেন।

সিরিয়া ও লেবানন

(৩) রাশিয়া ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর নিকট অভিযোগ করিয়াছিল যে, গ্রীসে ব্রিটিশ সৈন্যের অবস্থান গ্রীসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপের পরোক্ষ পন্থাস্বরূপ। কিন্তু গ্রীক সরকার কর্তৃক আহূত হইয়া ব্রিটিশ সৈন্য গ্রীসে উপস্থিত হইয়াছে এই

গ্রীস

যুক্তি প্রদর্শন করা হইলে এবিষয়ে আর কোন কিছু করিবার প্রয়োজন বোধ করা হইল না।

(৪) চেকোস্লোভাকিয়ার বিপ্লবের ফলে সরকার পরিবর্তিত হইলে সেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রুশ কমিউনিষ্টগণ নানাপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহার প্রতিকারকল্পে চেকোস্লোভাকিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর নিকট অভিযোগ করে। সিকিউরিটি কাউন্সিল এবিষয়ে তদন্ত করিতে চাহিলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধির বাধাদানের ফলে তাহা আর সম্ভব হইল না।

চেকোস্লোভাকিয়া

(৫) ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে ওলন্দাজ সরকার শেষ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা কার্যত স্বীকার করিয়া লইয়া এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকরী রহিল না। ওলন্দাজ সরকার সামরিক সাহায্য লইয়া ইন্দোনেশীয়দের দমন করিতে চাহিলেন। সিকিউরিটি কাউন্সিল উভয়পক্ষকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার আদেশ দিলেন। কিন্তু এই আদেশ কোন পক্ষই মানিল না। সিকিউরিটি কাউন্সিল তিনজন সদস্যের এক কমিটির উপর ইন্দোনেশিয়ার গোলযোগের শান্তিপূর্ণ সমাধানের ভার অর্পণ করিল। এই কমিটি উভয় পক্ষকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে সম্মত করাইলে কিছু কাল ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু ওলন্দাজবাহিনী আকস্মিকভাবে ইন্দোনেশীয় নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করিল। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণও বাদ পড়িলেন না। এমতাবস্থায় সিকিউরিটি কাউন্সিল ওলন্দাজ সরকারকে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত করাইলেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর সদস্যপদভুক্ত হইল।

ইন্দোনেশিয়া

(৬) কাশ্মীর সমস্যা সমাধান ব্যাপারে ইউনাইটেড ন্যাশনস্ দীর্ঘসূত্রতার পরিচয় দান করিয়া শেষপর্যন্ত পাকিস্তানকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করিল। কাশ্মীরের যে অংশ পাকিস্তান অধিকার করিয়া আছে উহা হইতে সৈন্য অপসারণের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে নাই। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ন্যায্য-নীতি অনুসরণ করিয়াছে একথা বলা যায় না।

কাশ্মীর

ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় ও তাহাদের কুক্ষিগত দেশসমূহ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে

ন্যায্য-নীতি অপেক্ষা পাকিস্তান তোষণ-নীতি দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া ইঙ্গ-মার্কিন তথা পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গের বাস্তবতাবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সামরিক জোটে আবদ্ধ পাকিস্তান-তোষণ নিরপেক্ষ ও বাস্তববাদী দেশ মাত্রেরই ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছে। একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়ার বিরোধিতার ফলে পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ এযাবৎ কাশ্মীর ব্যাপারে পূর্ণমাত্রায় পাকিস্তান তোষণ-নীতি কার্যকরী করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৬২ অর্থাৎ বর্তমান বৎসরের মে ও জুন মাসে পর পর দুইটি অধিবেশনে নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ ভারত তথা সকল নিরপেক্ষ দেশ মাত্রেরই ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছে।

কাশ্মীর ব্যাপারে পাকিস্তান তোষণ নীতি

(৭) **কোরিয়ার যুদ্ধ ও ইউনাইটেড ন্যাশনস্ (Korean War & the U. N.)ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক দশক পূর্ব হইতে কোরিয়া জাপানের অধীন ছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কায়রো কন্ফারেন্সে আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীন স্থির করে যে, কোরিয়াকে জাপানের অধিকারমুক্ত করিয়া স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সোভিয়েত রাশিয়া যখন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন কায়রো কন্ফারেন্স-এর সিদ্ধান্ত সোভিয়েত সরকারও মানিয়া লইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই আগস্ট মাসে জাপান আত্মসমর্পণ করিলে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে স্থির হইল যে, কোরিয়ার উত্তরাংশ অর্থাৎ ৩৮° দ্রাঘিমা রেখার উত্তরের অংশ রাশিয়ার নিকট এবং উহার দক্ষিণাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। ফলে, যুদ্ধাবসানেই কোরিয়া দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক এই দুই অংশের ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা চলিল। কিন্তু সেই বিষয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কোনপ্রকার মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারার ফলে বিষয়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর নিকট পেশ করিল। ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর জেনারেল এ্যাসেম্বলী একটি কমিশনের তত্ত্বাবধানে সমগ্র কোরিয়ার এক নির্বাচনের মাধ্যমে কোরিয়ার সরকার গঠন করিবার এবং সকল বিদেশী সৈন্যের অপসারণ প্রস্তাব করিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন

কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোরিয়ার উত্তরাংশের রাশিয়ার এবং দক্ষিণাংশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আত্মসমর্পণ

কোরিয়ার ঐক্য সমস্যা

কোরিয়ার যুদ্ধ
সোভিয়েত
ইউনিয়ন
ভ্লাডিভস্টক
মুকডেন
উঃ কোরিয়া
সিনুইজু
হ্যাংনাম
সিনানজু
জাপান সাগর
পাইয়োংগ্যাং
৩৮°
পানমুনজম্
ইনচন
সিওল
দঃ কোরিয়া
তেইজন
পোহাং
কুসান
তেইগু
মাসান
চিনজু
পুসান
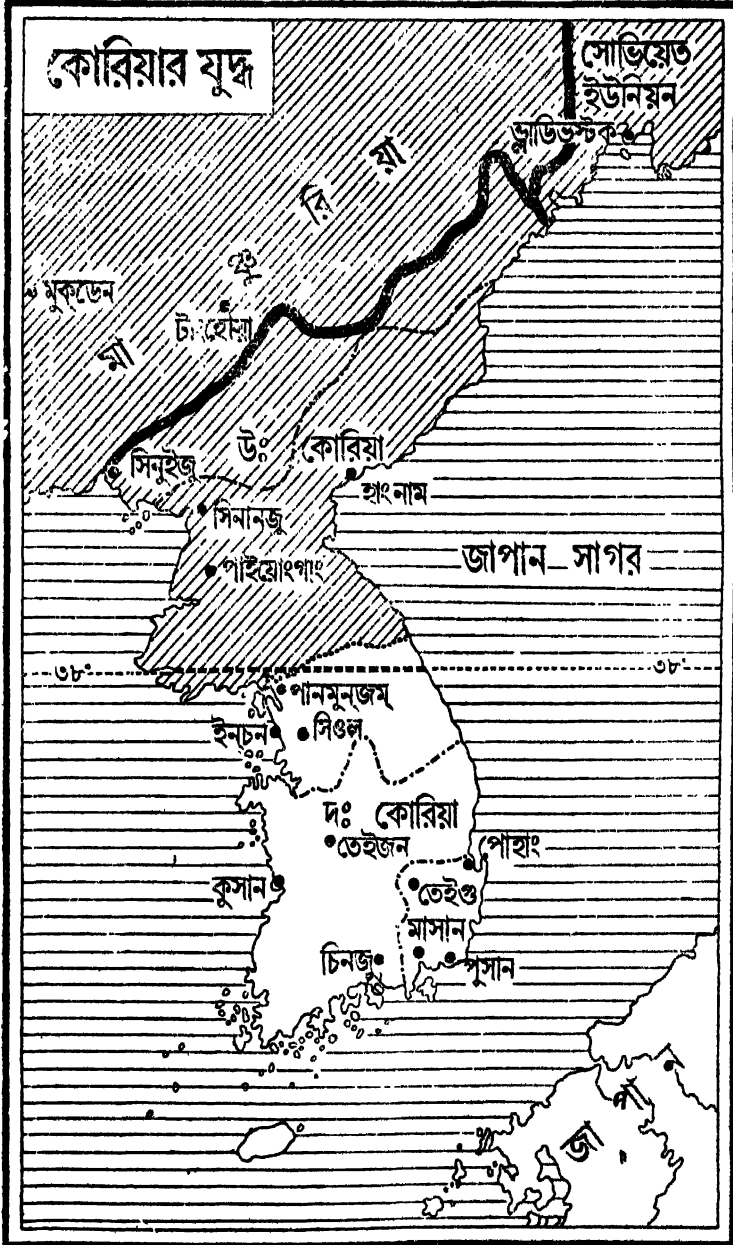
এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস্ কর্তৃক নিযুক্ত কোন কমিশনের উত্তর-কোরিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করিল। এমতাবস্থায় ইউনাইটেড ন্যাশনস্ কর্তৃক নিযুক্ত এক কমিশন কেবলমাত্র দক্ষিণ-কোরিয়ায় নির্বাচন সম্পন্ন করিল এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-কোরিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। দক্ষিণ-কোরিয়াকে ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর সদস্যপদভুক্ত করা হইল। নবগঠিত দক্ষিণ-কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হইলেন সিঙ্গম্যান রী। উহার রাজধানী হইল সিওল। ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর-কোরিয়ার 'গণতান্ত্রিক জনসাধারণের প্রজাতন্ত্র' (Democratic People's Republic) নামে এক শাসনব্যবস্থা চালু করিল। এইভাবে কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। দক্ষিণ এবং উত্তর কোরিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি যুদ্ধের হুমকি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন উত্তর-কোরিয়া দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণ করিয়া বসিল। ইউনাইটেড ন্যাশনস্ উত্তর-কোরিয়াকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার নির্দেশসম্বলিত এক প্রস্তাব পাস করিল এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রকে এই প্রস্তাব কার্যকরী করিবার জন্য সাহায্য দানের অনুরোধ জানাইল। কিন্তু উত্তর-কোরিয়ার সেনাবাহিনী সহজেই দক্ষিণ-কোরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-কোরিয়ার সাহায্যার্থে মার্কিন সৈন্য প্রেরণ করিল। ইউনাইটেড ন্যাশনস্‌ও সদস্য রাষ্ট্রবর্গকে দক্ষিণ-কোরিয়ার সাহায্যার্থে এবং শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে সাহায্য প্রেরণের নির্দেশ দিলে মোট ষোলটি দেশ কোন-না-কোন প্রকার সামরিক সাহায্য প্রেরণ করিল। ইউনাইটেড ন্যাশনস্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মিলিত সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে দক্ষিণ-কোরিয়ার সাহায্যার্থে আগত বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু কমিউনিস্ট্ চীন উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে যোগদান করিলে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। জেনারেল এ্যাসেম্বলী চীন দেশকে

ইউনাইটেড ন্যাশনস্ কর্তৃক উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার ঐক্যের প্রস্তাব—রাশিয়া কর্তৃক অগ্রাহ্য

উত্তর-ও দক্ষিণ কোরিয়ার পৃথক শাসনব্যবস্থা

উত্তর-কোরিয়া কর্তৃক দক্ষিণ-কোরিয়া আক্রমণ

ইউনাইটেড ন্যাশনস্ কর্তৃক দক্ষিণ-কোরিয়াকে সাহায্য দান

'আক্রমণকারী' দেশ বলিয়া ঘোষণা করিল এবং চীন দেশে কোনপ্রকার যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রেরণ নিষিদ্ধ করিল। রাশিয়া অবশ্য উত্তর-কোরিয়াকে সকল প্রকার সামগ্রী সরবরাহ করিতে দ্বিধা করিল না। যাহা হউক, দুই বৎসর যুদ্ধের পর বহু সংখ্যক লোকক্ষয় ও নানাপ্রকার দুঃখ-দুর্দশা ঘটিলে যুদ্ধ-বিরতির আলোচনা চলিল। দক্ষিণ-কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সিঙ্গ্ম্যান রী সমগ্র কোরিয়ার ঐক্য এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী সরকার গঠনসম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হইয়া অস্ত্রত্যাগে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এবং কমিউনিস্ট আক্রমণ হইতে নিরাপত্তার দায়িত্ব ও দক্ষিণ-কোরিয়ার পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে সিঙ্গ্ম্যান রী যুদ্ধত্যাগে রাজী হইলেন। উত্তর-কোরিয়া কমিউনিস্ট চীন ও ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর মধ্যে ৫৭৫টি বৈঠকের পর পানমুনজন নামক স্থানে যুদ্ধ বিরতির চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ৩৮° দ্রাঘিমা রেখার লাইন ধরিয়া উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার রাজ্যসীমা বিভক্ত হইল। উভয় পক্ষ যুদ্ধ-বন্দীদের ফিরাইয়া দিতে স্বীকৃত হইল এবং মোট ৬০ দিনের মধ্যে যুদ্ধ-বন্দীদিগকে নিজ নিজ দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে স্থির হইল। ভারতের সভাপতিত্বে একটি নিরপেক্ষ কমিশনের উপর বন্দীবিনিময়ের ভার ন্যস্ত হইল। এই কমিশনের সদস্য ছিল পোল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইট্জারল্যাণ্ড ও চেকোস্লোভাকিয়া। এই কমিশনের কার্যাদি উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার পরস্পর বিবাদের ফলে অত্যধিক জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় এবং অপরাপর প্রতিনিধিবর্গের ধৈর্য এবং উদারতার ফলে শেষ পর্যন্ত বন্দী-বিনিময়ের কঠিন দায়িত্ব পালন সম্ভব হইয়াছিল।

উত্তর-কোরিয়ার পক্ষে চীন দেশের যুদ্ধে যোগদান

যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি

বন্দীবিনিময় সমস্যা

কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের কন্ফারেন্সে কোরিয়ার সমস্যা সমাধান এবং বিদেশী সৈন্যের অপসারণের প্রশ্নের মীমাংসা হইবে স্থির হইয়াছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই কন্ফারেন্স জেনিভা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই কন্ফারেন্সে কোরিয়ার ঐক্যের প্রশ্নের কোন সমাধান করা সম্ভব হইল না।

জেনিভা কনফারেন্স — কোরিয়ার সমস্যা সমাধানে অকৃতকার্যতা

ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর কার্যকারিতা (Usefulness of the U. N.): আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর প্রয়োজনীয়তা বর্তমান জগতে যে খুব বেশি তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবী যখন সর্বাত্মক ধ্বংস অথবা শান্তি ও নিরাপত্তা—এই দুই বিকল্প পন্থার সম্মুখীন তখন ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর ন্যায় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নাই। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের হস্তে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ক্ষমতা দান করিয়া এবং অপরাপর রাষ্ট্রবর্গকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে স্থাপন করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রমাত্রেরই সমতার নীতির বিরোধিতা করিয়াছে। ইহা ভিন্ন পাঁচটি রাষ্ট্রের আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও কুয়ো-মিং-তাং চীন-হস্তে 'ভিটো' ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়া এই কয়েকটি রাষ্ট্রের কোন একটির অমতে কোন সুযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ভিন্ন, ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর সদস্যমাত্রেই সার্বভৌম এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন—এই নীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর কোন সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ কোন দেশের পক্ষে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হইতে পারে না। তদুপরি ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ ত্যাগ করিয়া যাইবার পক্ষেও কোন বাধা নাই। এই সকল কারণে এবং সর্বোপরি এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও রাজনৈতিক স্বার্থ, দ্বন্দ্ব ও আদর্শগত বিভেদ ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর দুর্বলতার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ইহাকে দৃঢ়তর করিবার মধ্যেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় নিহিত রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর কার্যকলাপে ত্রুটি থাকিলেও মোট সাফল্যের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার কৃতিত্ব যথেষ্ট ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রাধান্য

ভিটো ক্ষমতা

সমালোচনা

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌ (The League of Nations & the U. N.): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্‌ ও ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্‌-এর মধ্যে কতক পার্থক্য থাকিলেও এই দুই-ই একই ধরণের পরিস্থিতি হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। উভয়েরই সংগঠন, দোষ-ত্রুটি প্রভৃতির

সামঞ্জস্য ও পার্থক্য দুই-ই বিদ্যমান

মধ্যে কতক কতক সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এজন্য ইহা বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, ইউনাইটেড ন্যাশনস্ লীগ-অব-ন্যাশনস্‌এরই অনুকরণ মাত্র।

সামঞ্জস্য : উৎপত্তি

সামঞ্জস্যের দিক দিয়া বিচার করিলে লীগ-অব-ন্যাশনস্-এ যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রাধান্য ছিল, তেমনি ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রাধান্য রহিয়াছে। বস্তুত, লীগ-অব-ন্যাশনস্ ও ইউনাইটেড ন্যাশনস্ উভয়ই বিজয়ী শক্তিবর্গের সমিতিস্বরূপ।

সংগঠন

সংগঠনের দিক দিয়াও লীগ-অব-ন্যাশনস্ ও ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। সাধারণ সভা, কাউন্সিল, দপ্তর, আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রভৃতি মোটামুটি এক ধরণের।

আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায়

আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান ব্যাপারে অনুরোধ-উপরোধ, আলাপ-আলোচনা ও মধ্যস্থতার গুরুত্ব লীগ-অব-ন্যাশনস্ ও ইউনাইটেড ন্যাশনস্ উভয়ই স্বীকার করিয়াছে।

Trusteeship System and Mandate System

ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর Trusteeship System লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর ম্যাণ্ডেট্ পদ্ধতিরই অনুরূপ।

মূল আদর্শ

মূল আদর্শ—অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা-বজায় রাখা লীগ এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস্ উভয়েরই সমান।

পার্থক্য

উপরি-উক্ত সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও লীগ-অব-ন্যাশনস্ ও ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর মধ্যে নানাবিষয়ে পার্থক্য আছে। এইসকল পার্থক্যের কতকগুলি লীগ-অব-ন্যাশনস্ অপেক্ষা ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে, আবার কতক ক্ষেত্রে লীগ-অব-ন্যাশনস্ হইতে ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর অপকর্ষতা সুস্পষ্ট করিয়া তোলে।

(.) লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর চুক্তিপত্র (Covenant) ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তির অংশ হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। ফলে, ভার্সাই-এর শান্তি-চুক্তিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর চুক্তিপত্রের আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও পবিত্রতা স্বভাবতই বিনষ্ট হইবার পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর

চার্টার কোন শান্তি-চুক্তির অংশ নহে। ইহা পৃথকভাবে রচিত ও গৃহীত ফলে, শান্তি-চুক্তিসমূহের সহিত ইহার স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব নির্ভরশীল নহে। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই ধরণের আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনের স্বীকৃতি হিসাবেই ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ গঠিত। (২) ইহা ভিন্ন ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর কার্যাদি বিভিন্ন সংস্থার উপর ন্যস্ত থাকায় উহার কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইবার সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর ক্ষেত্রে ক্ষমতার এরূপ অকেন্দ্রীকরণ পরিলক্ষিত হয় নাই। (৩) লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্ আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসাবে গঠিত হইলেও কোন একই সময়ে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গ উহার সদস্যপদভুক্ত ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে যোগদান করে নাই। রাশিয়াকে উহাতে দীর্ঘকাল স্থান দেওয়া হয় নাই। এদিক দিয়া বিচার করিলে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ একমাত্র কমিউনিস্ট্ চীন ভিন্ন পৃথিবীর সকল বৃহৎ রাষ্ট্র লইয়া গঠিত হইয়াছে। পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তি রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হইতেই ইহার সদস্যপদভুক্তি ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করিয়াছে। (৪) ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর চার্টারে পৃথিবীর 'মানবগোষ্ঠী'র উন্নতিসাধনকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া উহা অধিকতর গণতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করিয়াছে। জনসাধারণের সরাসরিভাবে অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ না থাকিলেও লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এর চুক্তিপত্রে যেমন বিভিন্ন 'সরকারের' উন্নতিসাধনের কথা উল্লিখিত আছে, সেরূপ কোন উল্লেখ ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর চার্টারে না থাকায় উহার প্রতি পৃথিবীর জনসাধারণের শ্রদ্ধা স্বভাবতই জাগিবার সুযোগ রহিয়াছে। (৫) ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর সাধারণ সভা ও অপরাপর সভা-সমিতিতে সংখ্যা-গরিষ্ঠের মতামতের প্রাধান্য দান করিয়া দ্রুত কর্তব্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। লীগ-অব-ন্যাশন্‌স্-এ সর্ববাদিসম্মতিক্রমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার নীতি লীগের কর্তব্য সম্পাদনের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়াছিল। (৬) লীগ অপেক্ষা ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর যুদ্ধ-নিরোধ-সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং সদস্য রাষ্ট্রবর্গের এবিষয়ে দায়িত্ব বহুগুণে বেশি। (৭) সর্বশেষে ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর চার্টারে যুগ্ম নিরাপত্তা নীতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের ভীতির সৃষ্টি হইলেই ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্ হস্তক্ষেপ করিবার

লীগ-অব-ন্যাশন্‌স অপেক্ষা ইউনাইটেড ন্যাশন্‌স্-এর উৎকর্ষতা

দায়িত্বপ্রাপ্ত, কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্স্ কেবলমাত্র আক্রমণের ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপের অধিকার-প্রাপ্ত ছিল। ইহা ভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সহযোগিতার উপরও ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এ অধিকতর জোর দেওয়া হইয়াছে।

লীগের তুলনায় ইউনাইটেড ন্যাশন্স-এর অপকর্ষতা

কোন কোন বিষয়ে লীগ অপেক্ষা ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর অপকর্ষতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। (১) লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্রবর্গের দায়িত্ব যেরূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত সেরূপ সুস্পষ্ট উল্লেখ ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর চার্টারে নাই। (২) আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে সিকিউরিটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যন্ত ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ তথা উহার সদস্য রাষ্ট্রের কোন কিছু করিবার নাই। কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর চুক্তিপত্র অনুসারে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে অপর কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক বা না হউক, অর্থনৈতিক অবরোধ সঙ্গে সঙ্গে চালু করিবার দায়িত্ব লীগের তথা সদস্য রাষ্ট্রবর্গের ছিল।

নীতিগত পার্থক্য

নীতির দিক দিয়াও লীগ ও ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর কতক পার্থক্য আছে। লীগ চুক্তিপত্রে নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর রচয়িতাগণ নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক দুর্বলতার কারণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। শান্তি-রক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণের অপরিহার্যতা ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এ স্বীকৃত নহে।

মানুষকে মানুষের অধিকারে স্থাপনের প্রয়াসও ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এ যেরূপ পরিলক্ষিত হয় সেরূপ লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এ ছিল না। ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ স্বীকৃত 'মানব-অধিকার' (Human Rights) এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরি-উক্ত পার্থক্য সত্ত্বেও লীগ-অব-ন্যাশন্স ও ইউনাইটেড ন্যাশন্স্ মূলত এই ধরণের প্রতিষ্ঠান। ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর কার্য, ক্ষমতা, আদর্শ, গঠনতন্ত্রের অনেক কিছুতেই লীগ-অব-ন্যাশন্স্-এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা (Problem of Disarmament) : বিজ্ঞানের

অবদানকে যুদ্ধের কাজে খাটাইতে গিয়া আজ সমগ্র পৃথিবী এ্যাটম্ ও হাইড্রোজেন বোমার তেজস্ক্রিয়তার কুফলে, নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। পৃথিবীর রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব, পরস্পর অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ ও সন্দেহ আজ সমগ্র পৃথিবীকেই যেন এক বিরাট যুদ্ধ শিবিরে পরিণত করিয়াছে। যে-কোন কারণে যুদ্ধের চাপের (War tension) সৃষ্টি হইতেছে। পৃথিবী আজ পূর্ব ও পশ্চিমী ব্লকে বিভক্ত। এই অবাঞ্ছিত ও ভয়াবহ পরিস্থিতি হইতে বৃহত্তর মানব-গোষ্ঠীকে রক্ষা করিতে হইলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন। ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর প্রয়োজনীয়তা এই কারণেই সর্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু লীগ-অব-ন্যাশনস্-এর চুক্তিপত্রে যেমন নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার অপরিহার্য উপায়রূপে গৃহীত হইয়াছিল সেরূপ কোন নীতি ইউনাইটেড ন্যাশনস্-এর চার্টারে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বরঞ্চ প্রত্যেক রাষ্ট্রই সামরিক শক্তিতে প্রাধান্য অর্জন করিয়া আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রতিপত্তি অর্জনে মনোনিবেশ করিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের পরস্পর সন্দেহ, বিবাদ-বিসংবাদ সামরিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়াছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীকে সম্ভাব্য আণবিক যুদ্ধের ফলে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্বীকার করিতেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও মানবধর্মিগণ আণবিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধকরণ-ই পৃথিবীর নিরাপত্তার একমাত্র পন্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা

ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ও আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে Atomic Energy Commission নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়া আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিকভাবে আণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। এবিষয়ে রাশিয়া ও আমেরিকার মতানৈক্যের ফলে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে Atomic Energy Commission উহার কার্যাদি বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। ইতিমধ্যে রাশিয়া কর্তৃক আণবিক বোমা প্রস্তুতে পরিস্থিতির জটিলতা আরও বৃদ্ধি হয়। ফলে, আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আরও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক আণবিক শক্তি ব্যবহার

Atomic Energy Commission

নিয়ন্ত্রণের একটি প্রস্তাব করে (Acheson Formula)। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ইউনাইটেড ন্যাশনস্ পৃথিবীর যাবতীয় আণবিক শক্তির এবং মোট সংখ্যক আণবিক বোমার হিসাব প্রস্তুত করিবে ; ইউনাইটেড ন্যাশনস্ প্রত্যেক দেশের সামরিক শক্তির পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি না করা হয় এবং প্রত্যেক দেশের সামরিক শক্তি কতদূর তাহা নির্ধারণের জন্য ইন্‌স্‌পেক্টর নিয়োগ করিবে ; বিভিন্ন দেশের সামরিক শক্তির আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অতিরিক্ত সামরিক সাজ-সরঞ্জাম হ্রাসের ব্যবস্থা করিবে এবং প্রত্যেক দেশের সামরিক শক্তি অপরিবর্তিত আছে কিনা দেখিবার জন্য পরিদর্শনকার্য সর্বদা চালু রাখিবে। সোভিয়েত রাশিয়া এই প্রস্তাবকে হাস্যকর, অবাস্তব প্রস্তাব বলিয়া অভিহিত করিলে স্বভাবতই উহা গৃহীত হইল না। ফলে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতের প্রতিযোগিতা অপ্রতিহতভাবেই চলিতে লাগিল। যাহা হউক ইউনাইটেড ন্যাশনস্ Disarmament Commission নামে একটি নিরস্ত্রীকরণ কমিশন নিয়োগ করিল।

মার্কিন প্রস্তাব —Acheson Formula

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা (Atom for peace) আণবিক শক্তিহ্রাসের কোন নূতন পন্থা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইল না, কারণ আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের প্রয়োজন এই পরিকল্পনায় স্বীকৃত হয় নাই। আণবিক বোমা প্রস্তুত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা অসম্ভব এবং নিছক প্রচারকার্য বলিয়াই রাশিয়া ধরিয়া লইল। এইভাবে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ বা আণবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে কোন সমাধান সম্ভব হইল না। যাহা হউক এবিষয়ে উভয়পক্ষ অর্থাৎ রাশিয়া ও আমেরিকা নানাপ্রকার প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব উপস্থাপন করিতে থাকিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ-নীতি মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইল। এমন কি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তি হ্রাসের প্রস্তাবও উত্থাপন করিল। কিন্তু রাশিয়া ও পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গের পরস্পর সন্দেহ ও বিদ্বেষের ফলে এবিষয়ে কার্যকরী কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এইভাবে কোন পক্ষের প্রস্তাবই যখন অপর পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না, তখন রাশিয়া

আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের পরিকল্পনা

সর্বপ্রকার পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ (nuclear test) বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিল। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমী-রাষ্ট্রবর্গ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু আণবিক বোমা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনও নিষিদ্ধ করা হউক সেই প্রস্তাব করিল। রাশিয়া এই পাল্টা প্রস্তাবে স্বীকৃত না হইলে এবিষয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হইল না। এমতাবস্থায় রাশিয়া একক-ভাবে পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করিতে স্বীকৃত হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুরূপ কোন নীতি অবলম্বন করিতে রাজী হইল না (১৯৫৮)। ফলে রাশিয়া অল্পকালের মধ্যেই পুনরায় পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ শুরু করিল। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাময়িকভাবে পরীক্ষামূলক আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিলে সোভিয়েত ইউনিয়নও অনুরূপ ঘোষণা করিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে এই দুই দেশ স্বেচ্ছায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণ বন্ধ করিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতকটা আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু বার্লিন সমস্যা লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চাপ বৃদ্ধি পাইলে রাশিয়া পুনরায় আণবিক বিস্ফোরণ শুরু করিয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাশিয়া মেগাটোন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ শুরু করিয়াছে। এই বোমার তেজস্ক্রিয়ার কুফল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং মানুষের স্বাস্থ্যহানি হইবে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু বলিয়াছেন যে, এই ধরণের বোমার তেজস্ক্রিয়ার কুফল মানুষের মন এবং দেহ উভয়ই বিষাইয়া তুলিবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার মেগাটোন বোমা বিস্ফোরণের একমাত্র জবাব হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অনুরূপ বিস্ফোরণ শুরু করা।

আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব

রাশিয়া ও আমেরিকা কর্তৃক স্বেচ্ছায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণে সাময়িক বিরতি

রাশিয়া কর্তৃক মেগাটোন বোমা বিস্ফোরণ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা এক অত্যধিক জটিল সমস্যা। বিবদমান রাষ্ট্রবর্গের মানসিক পরিবর্তন না ঘটিলে এবং জগতের জনসাধারণের জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ না জন্মিলে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রী-করণ তথা শান্তি সুদূর-পরাহত